

বসুন্ধরা

ষট্টিংশ বর্ষ • ১৩৩১-আষাঢ়

উদ্যান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে
বিশেষ সংখ্যা



প্রচ্ছদপট পরিচিতি :

উপরের ছবি : প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের পুরস্কার দিচ্ছেন কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ।

নীচের ছবি : রাজ্য ফল প্রদর্শনীতে আমের পসরা।

56
১৭

22

756
002/3

শ্রী

P9112

সম্পাদকীয়

৩—৪

পশ্চিমবঙ্গে ফল এবং সবজি চাষের উন্নয়ন/

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ৫—১১

অমৃতের কাছাকাছি/

চিদানন্দ গোস্বামী ১২—১৬

দার্জিলিং-এর কমলালেবুর হাল

ইকিকৎ/ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি ১৭—২১

অমৃত বাংলা/চিদানন্দ গোস্বামী ২৩

চিত্র-বিচিত্রা

২৪—২৬

উত্তর কমল

২৭—২৮

সংবাদ

২৯—৩১

রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী

৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ

বিক্রপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(সাধারণ)

ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা

(গবেষণা)

ধূর্জটা মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)

বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন) কৃষি বিভাগ

অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ

আধিকারিক, কৃষি অধিকার

অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক
(সদর)

হুজুখা ঘোষ, সম্পাদিকা

চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক

বিক্রপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

756

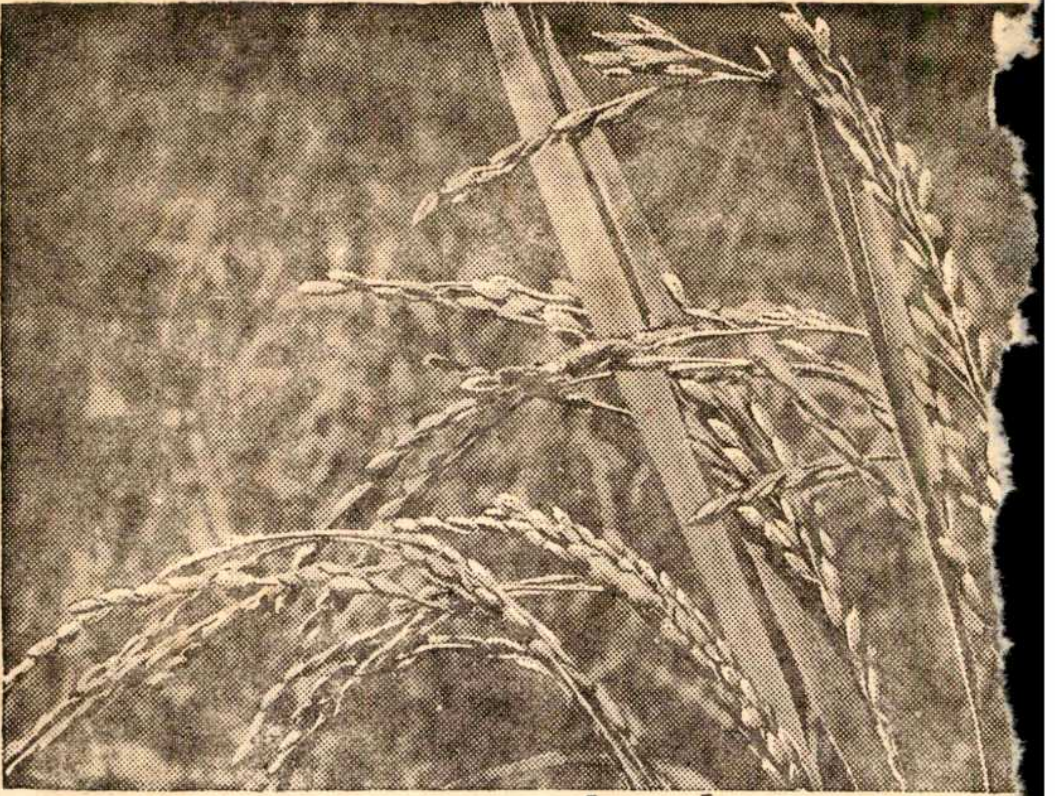
002/3

বহুসংস্করণ

আষাঢ়-১৩৯১

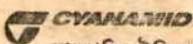
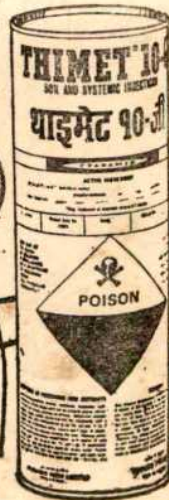
কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা

কর্তৃক প্রকাশিত



শক্তিশালী কীটনাশক থাইমেট ১০-জি আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে

দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অদ্বিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না এমন পোকামাকড় বিনাশ করে। এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের প্রতিহত করার আভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে।
তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১০-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের অপেক্ষা থাইমেট ১০-জি একবার প্রয়োগ করলেই সফল পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তাঁরা এই ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিতরূপে বেশী সকল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন।



সায়নামিড ইন্ডিয়া লিমিটেড
কৃষি বিভাগ
পো: বাক: ১১০১, কোচাই ৪০০ ০১০

সায়নামিড এজিট চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায়

* Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, U.S.A.

স্বাধীনতা



স্বকর্যা

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি বলতে সাধারণভাবে আমরা তুগুল শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই বুঝি। তুগুল জাতীয় শস্যের প্রয়োজন বেশী হলেও খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের যে জীবনীশক্তি পাবার কথা তা শুধু তুগুল জাতীয় খাদ্য দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। শরীরের সুস্থ পুষ্টির জন্য ফল ও সবজিরও প্রয়োজন। সবুজ বিপ্লবকে তাই সার্থক করে তুলতে রঙ্গীন বিপ্লবেরও দরকার।

কৃষি বিভাগে উত্থান বিষয়ে উন্নয়ন সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের আনুকূল্যে কৃষ্ণনগরে প্রথম ফল চাষ সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি খামার তৈরী হয়। সে হিসাবে উত্থান শাখার এ বছর সুবর্ণ জয়ন্তী বংসর।

তারপর উত্থান গবেষণার কাজ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উত্থান উন্নয়ন কাজের জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। যেমন চুঁচুড়ায় কলা গবেষণা উপকেন্দ্র, মালদহে আম, শিলিগুড়িতে আনারস ইত্যাদি। এইসব শাখায় প্রথম দিকে প্রধানতঃ গবেষণা কাজের উপর গুরুত্ব ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ফল ও সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি উন্নয়নমূলক প্রকল্পও নেওয়া হয়। যেমন ফল ও সবজির গবেষণা খামারগুলিতে উন্নত জাতের চারা তৈরি, সবজি বীজ উৎপাদন ও বিতরণের কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়।

ফল ও সবজির ফলন বাড়তে গেলে ভাল বীজ ও চারার প্রয়োজন। সেজন্য নার্সারীর উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফল ও সবজির ফলন বাড়তে পারলে তা যেমন মোট খাদ্য চাহিদার পরিপূরক হবে তেমনি উৎপাদকদের কাছেও এটি যথেষ্ট অর্থকরী ব্যবসা হবে।

বর্তমানে রাজ্যের সাতটি গবেষণা উপকেন্দ্রে ফল ও সবজির বিভিন্ন ধরনের উপযোগী গবেষণা চালানো হচ্ছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মালদায় আমের উন্নয়নমূলক কাজ,

শিলিগুড়িতে আনারস এবং দার্জিলিং জেলায় কমলালেবু, পীচ, প্লাম ইত্যাদির গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ। তাছাড়া কলা ও সবজির উন্নতির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই বছরটি কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার একটি বিশেষ বছর। কারণ এ বছরই উদ্যান শাখার ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হচ্ছে। এই উৎসবের কার্যসূচী কেবলমাত্র একটি উৎসবের আয়োজন করেই শেষ হচ্ছে না। সারা বছর ধরে উৎসব পালন করার জন্য সাতটি কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গ্রীষ্মকালীন ফল ও শীতকালীন সবজি প্রদর্শনী ছাড়া, আলোচনা সভা ও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে। এই উপলক্ষে বিশেষ পুস্তিকাও প্রকাশিত হচ্ছে।

সারা বছর ধরে অনুষ্ঠান পালন করার মধ্যে দিয়ে উদ্যান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। “বসুন্ধরার” আষাঢ় সংখ্যাটি উদ্যান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যায় এ রাজ্যের উদ্যান উন্নয়ন কার্যসূচী, তার প্রসার ও শিলিগুড়িতে এই উপলক্ষে যে গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তার কিছু প্রতিবেদন সংযোজিত হলো।

এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে দিয়েই যেন শেষ না হয়ে যায়। আমাদের চেষ্টা হবে ফল ও সবজির উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন সৃজন ও বন রক্ষা করা। তাতে দেশের সম্পদ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি পরিবেশ-দূষণ থেকেও দেশকে বাঁচানো যাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগে উদ্যানবিষয়ক ভাবনা শুরু আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। কৃষ্ণনগরে ফল চাষ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য একটি খামার তৈরি হয় ১৯৩৪ সালে। সে হিসাবে উদ্যান শাখার এবছর সুবর্ণজয়ন্তী বৎসর। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি শাখা খোলা হয়। যেমন চুঁচুড়ায় কলা গবেষণার উপকেন্দ্র, মালদহে আম, শিলিগুড়িতে আনারস (বর্তমানে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত) ইত্যাদি। মূলতঃ গবেষণার কাজে লিপ্ত থাকলেও এই শাখা ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণের কাজও শুরু করে। সেই সঙ্গে চারা তৈরী, সবজি-বীজ উৎপাদন এবং বিতরণের কাজও চলতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ফল ও সবজি চাষের মোট এলাকা এবং উৎপাদনের সঠিক তথ্যটি অস্পষ্ট। আনুমানিক হিসাব ১নং সারণীতে দেওয়া হলো। প্রয়োজনের তুলনায় এলাকা এবং উৎপাদন খুবই কম। তাই অস্থান্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে সারা বছর বহু টাকার নানারকম ফল ও সবজি এ রাজ্যে আমদানি হয়। উত্তরে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকায় কমলালেবু, পীচ, প্লাম, ছাসপাতি থেকে শুরু করে দক্ষিণে উপকূল এলাকায় তরমুজ, কাজুবাদাম প্রভৃতি নানারকমের ফল ও সবজি ফলাবার মত উপযুক্ত নানা ধরনের মাটি ও জলবায়ু রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়। অন্ততপক্ষে পাঁচটি কারণে এই সব ফসলের চাষ সম্প্রসারণ এ রাজ্যে বিশেষ ভাবে অর্থপূর্ণ।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার

পশ্চিমবঙ্গে ফল এবং সবজি চাষের উন্নয়ন

বসুন্ধরা : আষাঢ় ১৩৯১

সারণী ১

পশ্চিমবঙ্গে ফল ও সবজি চাষের এলাকা ও উৎপাদন
(আনুমানিক)

ফলের নাম	এলাকা (হাজার হেক্টর)	উৎপাদন (হাজার মে. টন)	গড় ফলন (হেক্টর প্রতি মে. টন)	প্রধান প্রধান এলাকা
১। আম	৫৫'৬	২৮৯'২	৭'০	মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া।
২। কলা	১৩'২	১৪৪'০	১০'৯	হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ
৩। কমলালেবু	১'৫	১৫'০	১০'০	দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা
৪। অমৃত লেবু জাতীয় ফল	১'৯	৯'৫	৫'০	পার্বত্য এলাকা বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ।
৫। আনারস	৯'০	২২৫'০	২৫'০	দার্জিলিং (শিলিগুড়ি এলাকা), জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর।
৬। পেঁপে	১'৩	৩২'৫	২৫'০	পার্বত্য এলাকা বাদে অত্র সর্বত্র।
৭। লিচু	২'১	১০'৫	৫'০	মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হুগলী।
৮। পেয়ারা	১'৬	১১'৫	৭'২	২৪ পরগণা।
৯। কাঁঠাল	২'২	২২'২	১০'০	কুচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ সর্বত্র।
১০। নারকেল	৩'৩	২৪৪ লক্ষ ফল		উপকূল এলাকা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ (পার্বত্য অঞ্চল বাদে)।
১১। অমৃত ফল (কাজুবাদাম, সফেদা, আতা, পীচ, প্লাম ইত্যাদি)	৬'৭	১৫'৫	৪'২	
১২। তরমুজ	৪'২	৭৯'৮	১৯'০	২৪ পরগণা, মেদিনীপুর
১৩। সবজি (আলু বাদ)	২০০	২০০০	১০'০	

অধিকতর উৎপাদনী শক্তি তত্ত্বল অর্থাৎ লোক অনুপাতে জমি খুব কম।
শস্যের চাহিদার চাপ কমাতে এই অবস্থায় প্রতি একক জমিতে খাত্ত
এ রাজ্যে মাথা পিছু কর্ষিত জমির উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজন। তত্ত্বল
পরিমাণ এক হেক্টরের এক দশমাংশ। জাতীয় শস্য অপেক্ষা ফল ও শাকসবজির

ফলন ৩—৪ গুণ। কোন কোন ক্ষেত্রে ৮—১০ গুণ। খাড়াভ্যাস কিছুটা পাণ্টে ফল ও শাকসবজি বেশী খেলে তগুল জাতীয় শস্যের চাহিদার চাপও কিছুটা কমান যাবে।

অধিক আয় : ফল ও শাকসবজি ঠিকমত বাজার পেলে খুবই লাভজনক। প্রতি হেক্টর জায়ান্ট গভর্ণর কলা বা পেঁপে থেকে ১৫—২০ হাজার টাকা বছরে অনেক চাষী আয় করে থাকেন।

ভূমিক্ষয় রোধ করবে : দার্জিলিঙে পার্বত্য এলাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে অসমতল এলাকার জমিতে অনবরত ভূমিক্ষয় হয়ে চলেছে। এই অঞ্চলে মাটি বার বার উন্মুক্ত করে চাষ দেওয়া হলে ভূমিক্ষয় রূদ্ধি পাবে। বরং বাগিচা ফসলের চাষ করলে অবিরাম ক্ষয়ের হাত থেকে এখানকার জমিগুলি রক্ষা করা যাবে।

গ্রামীণ কর্মসংস্থান : চাষের নির্দিষ্ট মরসুম বাদে অল্প সময় কৃষিশ্রমিকদের এক বিরাট অংশ বেকার থাকে। বাগিচা থাকলে এবং নানারকম ফল ও শাকসবজি চাষের কার্যসূচী চললে এই রকম সময়ে (lean season) শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হবে।

অধিক পুষ্টি : ফল ও শাকসবজিতে ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পুষ্টির জন্ম প্রয়োজনীয় অগ্ন্যাত্ত পদার্থ থাকে। পুষ্টি-বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি প্রাপ্তবয়স্কের দৈনিক ৬০ গ্রাম ফল ও ২৮০ গ্রাম সবজি খাওয়া উচিত। একারণেও শাকসবজি ও ফল উৎপাদন রূদ্ধি পাওয়া উচিত।

ফল চাষের হালফিল অবস্থা

এ রাজ্যে যে এক লক্ষ হেক্টর জমিতে ফল চাষ হয় তার মধ্যে আমই আছে ৫৫৬ হাজার হেক্টরে। বিভিন্ন আকৃতি, রঙ এবং নানা স্বাদের একশ'র বেশী রকমের আম হয় এ রাজ্যে। মালদহ এবং মুর্শিদাবাদেই আছে শতকরা ৬০ ভাগ বাগান। কিন্তু নিয়মিত যত্ন পরিচর্যা বা সার প্রয়োগ না করে বছরের পর বছর শুধু ফল পেড়ে নেবার ফলে পুরনো বাগানগুলির ফলন অনিয়মিত এবং কম। সুপারিশ অনুযায়ী পরিচর্যা, চাষ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ এবং 'প্রুনিং' করলে হেক্টর প্রতি অন্ততঃ দুই টন ফলন বাড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে আমের সর্বভারতীয় গড় ফলন ৮.৭ টন প্রতি হেক্টরে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৭.০ টন। অনেক মালিকই ফল বিক্রির পর আর বাগানের গাছপালার খোঁজ রাখেন না। বর্তমানে সরকারের আত্ম উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর যেসব প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপিত হয় তার ফলাফল দেখে মালদহ জেলার অনেক চাষীই বাগানের যত্ন পরিচর্যা করতে উৎসাহ বোধ করছেন। বর্তমানে আমের চাষীপোকার হাত থেকে মুকুল রক্ষা করার জন্ম শতকরা ৭০ ভাগ আম গাছে কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। আম চাষের সুযোগ রয়েছে সমগ্র গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলে। আগামী ৫ বছরে অন্ততঃ ৫০০০ হেক্টর জমিতে আমের চাষ সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

আমের পরই পশ্চিমবঙ্গে কলার স্থান। অন্ততঃপক্ষে ১৩০০০ হেক্টরের বেশী জমিতে কলার চাষ হয়। এর বেশীর ভাগই হ'ল দেশী চাঁপা ও কাঁঠালি জাত। চুঁচুড়ার কলা গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে 'জায়ান্ট গভর্ণর' জাতের কলা উপযুক্ত সার ও সেচ প্রয়োগ করে চাষ করলে এ রাজ্যের চাষীরা অনেক বেশী ফলন পাবেন। 'জায়ান্ট গভর্ণর' ও 'রোবাষ্টা' জাতের চাষ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ৩০-৩৫টি করে প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এগুলির চাষ জনপ্রিয় হয়েছে। সারা রাজ্যে কমপক্ষে ১৫০০ হেক্টর জমিতে এই দুটি জাতের কলা চাষ হয়। সমগ্র গাঙ্গেয় পলিমাটি অঞ্চলে আগামী ৫ বছরে অন্ততঃ ২০০০ হেক্টর জমিতে এই জাতগুলির চাষ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। তাছাড়া দেশী জাতের কলার বাগানগুলিতে উন্নত প্রথায় চাষ পদ্ধতি চালু করলে ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ২৫ টন বাড়ানো যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চলের অল্প মাটিতে প্রায় ৯০০০ হেক্টর জুড়ে রয়েছে 'জায়ান্ট কিউ' জাতের আনারসের চাষ। ষাটের দশকের শুরুতে আনারস চাষ হত ৫০০ হেক্টরের কম জমিতে। সত্তরের দশকে দ্রুত আনারস চাষ ছড়িয়ে পড়ে দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায়, জলপাইগুড়ি জেলায় এবং পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমায়। অপেক্ষাকৃত হালকা মাটিতে

এবং উঁচু জমিতে ধানের ফলন কম হলেও আনারস খুব ভাল জন্মায়। আনারসের উৎপাদন বেড়ে গেলে দেখা দিল পরিবহন ও বিপণন সমস্যা। স্তূর্ষ ব্যবস্থার অভাবে এবং ফল সংরক্ষণের কোন বড় কারখানা না থাকায় স্থানীয় বাজারে ছোট চাষী প্রায়ই অল্প দাম পান। কৃষকের জমিতে প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করে ঘন করে চারা লাগানো এবং অসময়ে ফুল আনার প্রক্রিয়া কয়েক বৎসর যাবৎ প্রচার করা হচ্ছে। এর ফলে এখন আনারস চাষ আগের চাইতে লাভজনক হচ্ছে।

দার্জিলিং জেলার কালিম্পাং, কাশিয়াং এবং সদর মহকুমায় ১৫০০ হেক্টর জমিতে অত্যন্ত উন্নত মানের কমলালেবু জন্মায়। কিন্তু নিয়মিত যত্ন পরিচর্যা ও উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ না করায় বাগানগুলিতে ফলন কম হয়। নানারকম রোগপোকার আক্রমণে গাছগুলিও নিস্তেজ। বিভিন্ন অনুখাওয়ার অভাবজনিত রোগে পাতা ঝরে যায়, কোথাও কচি ডাল শুকিয়ে যায়, ফল ছোট হয়। এই সব সমস্যা সম্পর্কে কমলাবাগানের মালিকগণকে অবহিত করার জন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভাল চারা, সার, কীটনাশক এবং অনুখাওয়া বিলি করা হয়। অনেক এলাকায় খুব ভাল কাজ হওয়ায় কৃষক সচেতন হয়েছেন কিন্তু সমস্যা রয়েছে পরিবহন ও স্তূর্ষ বিপণনের। হালে মিরিক এলাকায় একটি সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়েছে। জানা গেছে কমলালেবু বাগানের মালিকগণ এতে উপকৃত।

পার্বত্য এলাকায় শীতমণ্ডলীয় ফল চাষের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। কালিম্পাঙের কাছে দলপট্টাদের গবেষণা ক্ষেত্রে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে বিশেষ কয়েকটি জাতের পীচ, প্লাম ও গ্রাসপাতির উন্নতমানের ফল এ অঞ্চলে উৎপাদন করা সম্ভব। প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য

এলাকার কৃষকদের মধ্যে এই সব জাতের ফলের চারা প্রতি বছর বিতরণ করা হয়। সুসংহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় আগামী ৫ বছরে অন্ততঃ আরও ৫০০০ হেক্টর জমিতে ফলের চাষ বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া উপকূল এলাকায় তরমুজ, নারকেল ও কাজু-বাদামের চাষও বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব।

কয়েকটি ফলের উৎপাদনের হার ২ নং সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী-২

ভারতে কয়েকটি প্রধান ফলের উৎপাদন (১৯৭৮-৭৯)

ফলের নাম	এলাকা (হাজার হেক্টর)	উৎপাদন (হাজার মে. টন)	গড় ফলন (হেক্টর প্রতি মে. টন)	প্রধান প্রধান রাজ্য
আম	২৪২'৫৬	৮,২১৬'৫১	৮'৭২	উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র।
আনারস	৪৩'২৫	৫০০'৩০	১১'৪০	আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক।
পেয়ারা	১৩৩'৪৪	১,১৭৭'৬১	৮'৮২	উত্তর প্রদেশ বিহার।
কলা	২৮১'৫৬	৪,২২৪'৬১	১৭'৪২	তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র।
লেবু জাতীয় ফল	১২৫'৮১	১,৬৩৮'৩২	৮'৩৬	পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু।

(তথ্য : ভারত সরকারের কৃষিবিভাগের পত্র নং ১৫-৪১/৭৯ তাং ১৫/২/৮০)

ফল চাষ সম্প্রসারণের আর একটি সম্ভাবনাপূর্ণ এলাকা হলো পশ্চিমাঞ্চল। এই অঞ্চলে চাষযোগ্য ফল হলো কুল, লেবু, পেয়ারা, ডালিম, কাঁঠাল ও আতা। বাঁকুড়া জেলার তালডাংড়ার গবেষণাক্ষেত্রে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট

মানের মোসাম্বী লেবু চাষ সম্ভব। একটি ৭-৮ বৎসরের গাছে ২০০ ফল পাওয়া গেছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে ফল পাড়ার উপযুক্ত হয়। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১২০ গ্রাম, রসের মাত্রা শতকরা ৩৮ ভাগ এবং রসে টি. এস. এস. শতকরা ৯'৫ ভাগ।

পশ্চিম অঞ্চলে কিছু কিছু অনাবাদী এলাকায় টক কুলের গাছ লাগিয়ে পরের বছর নারকেল কুলের কলম করে (Insitu budding) বাগান করা যায়। এই অঞ্চলে গাছ অপেক্ষাকৃত ঘন করে বসাতে হবে। লাগাবার গর্তগুলি বড় আকারের করা উচিত এবং সার মেশানো ভাল মাটি দিয়ে ভরাট করা দরকার। গর্তের নীচে শাবল ঢুকিয়ে ৩-৪টি জায়গায় বড় বড় ছিদ্র করে দেওয়া দরকার, যাতে পরে মূল সহজে শক্ত মাটির স্তর ভেদ করে নীচে চলে যেতে পারে। এতে গাছ অনেক নীচ থেকে জল শোষণ করতে পারবে। বাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে জলদি বেড়ে ওঠে এমন গাছের সারি (যেমন

আকাশমনি, ইউক্যালিপটাস) তৈরী করা দরকার। উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে যাতে ফল-গাছের মুকুল বা কচি ফল প্রচণ্ড গরম বাতাসে শুকিয়ে বারে না যায়। এই অঞ্চলে বাগানের মাটিতে বিশেষভাবে তৈরী কলসী পুঁতে অল্প জলে সেচের ব্যবস্থা করা চলে।

মাটি ও জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ৮টি উদ্যান বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র থেকে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফল ও শাক সবজির জাত নির্বাচন এবং চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সুপারিশ জানানো হয়। এ ছাড়া যে সব উন্নয়নমূলক কার্যসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে তার কয়েকটির বিবরণ তৎসারগীতে দেওয়া হলো।

সারগী-৩

গত চার বছরের কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজ

কার্যসূচী	১৯৮০-৮১	৮১-৮২	৮২-৮৩	৮৩-৮৪	মোট
১। আম, কলা ও আনারসের উন্নত জাত/চাষ পদ্ধতির প্রদর্শনী ক্ষেত্র (সংখ্যা)	১৩৭	৫০	১৩৩	১১৫	৪৩৫
২। আমের মুকুল রক্ষার জন্তু কীটনাশক প্রয়োগ প্রদর্শনী (হেক্টর)	২০	১৮.৫	১৩.৬	২০	৭২.১
৩। কমলালেবু এবং শীত-মণ্ডলীয় ফলবাগানের জন্তু সার ও কীটনাশক বিতরণ (হেক্টর)	১০৬০	১০৬০	১০৬০	—	৩১৮০
৪। আম, কমলালেবু এবং অন্যান্য ফলের চারা বিতরণ (নারিকেল ও কাজুবাদাম বাদে) (সংখ্যা)	৩৬,৫০০	২৪,৪০০	৪১,৩০০	৪৭,২০০	১,৪৯,৪০০

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে সবজি চাষের এলাকা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু বাদে অন্যান্য সবজি চাষ হয় ২ লক্ষ হেক্টরের বেশী জমিতে। সবজি চাষের ক্ষেত্রে চাষী অত্যন্ত যত্নশীল। এলাকা ও উৎপাদন দুইই বেড়েছে। কিন্তু তবু বিভিন্ন ঋতুতে সবজির চাহিদা বেশী থাকায় জলদি ফুলকপি, নাবি টমেটো, জলদি টেঁড়স, লাউ, ক্যাপসিকাম (বড় লঙ্কা), ওল এবং আরও কয়েকটি সবজি অন্যান্য রাজ্য থেকে কলকাতা বাজারে আমদানি হয়। সবজিতে স্বয়ংস্বত্ব হতে হলে সবজির চাষ এমনভাবে সুসংহত করা প্রয়োজন যাতে বহুদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের সবজি বাজারে আসতে পারে। মূল কথা হল জলদি এবং নাবি জাতের চাষ বাড়ানো এবং নুতন রকমের চাষ প্রবর্তন।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকায় লাভজনক সবজি চাষের যে বিরাট সুযোগ আছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই ধরা যাক দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকা। কয়েকটি এলাকায় অসময়ে শীতকালীন সবজি চাষের সুযোগ রয়েছে। এই অঞ্চলে টমেটো, বীন, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতির চাষ করে অসময়ে সমতুল অঞ্চলে পাঠানো চলে। রিস্টিক এলাকায় অসময়ে প্রচুর মটরশুঁটির চাষ হয়। বলাবাহুল্য এই সব সবজির চাষে খুব ভাল দাম পাওয়া যায়। এ ছাড়া দার্জিলিং জেলায় কালিম্পং এলাকায় ভাল জাতের ফুলকপির বীজও উৎপাদন করা যায়।

অনুরূপে পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড় এলাকায় জলদি জাতের ফুলকপি ও টমেটোর চাষও সম্প্রসারণ করা সম্ভব। সঠিক জাত এবং তার উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রচার করা প্রয়োজন। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় সেচকুয়া (Dug well) প্রকল্পে সবজি চাষ ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

দক্ষিণবঙ্গে জালুয়ারী মাসের শেষদিকে শীতের বিদায় নেবার পালা। সমগ্র উত্তর ভারত কিন্তু তখনো শীতে জর্জর। সেখানে শীত চলে প্রায় মার্চ মাস পর্যন্ত। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে জলদি জাতের ঐক্যকালীন সবজি চাষ করে উত্তর ভারতে পাঠানো চলে। মার্চ-এপ্রিল মাসে ওই সব অঞ্চলে শশা, উচ্ছে, করলা, পটল, কুমড়া ইত্যাদি সবজির দাম থাকে অস্বাভাবিক বেশী। একটু জলদি লাগিয়ে কচি অবস্থায় তুলে বাজারে পাঠালে ভাল লাভ পাওয়া যাবে। কিন্তু পরিবহণ, বিপণন এবং সংরক্ষণের সুব্যবস্থা ফল এবং শাকসবজি চাষ উন্নয়ন পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন জেলায় 'রেগুলেটেড মার্কেট' বা নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রকল্প ঠিকমত চালু হলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। সম্ভবতঃ সবচাইতে ভাল পদ্ধতি হলো বিক্রেতাদের সমবায় সমিতি স্থাপন। শেষ কথা এই যে, বিপুল সম্পদ সৃষ্টির চাবিকাঠিটি আমাদের হাতে এলেও রত্নভাণ্ডার খোলার কাজই প্রধান।



প্রদর্শনীর আমার
গ্যালারীটি দেখছেন
কৃষি মন্ত্রী শ্রীকমল
গুহ। পাশে কৃষি
অধিকর্তা শ্রীবিষ্ণু
মণ্ডল এবং উদ্যান-
বিদ শ্রীহেমেন
সমাদ্দার

অমৃত দেখিনি কোনোদিন—শুনেছি,
শব্দটি উচ্চারণও করেছি। শাস্ত্রজ্ঞ তাত্ত্বিক-
দের কাছে শুনেছি, তাবৎ মনুষ্যকুলই অমৃতের
সন্ধান। ‘অমৃত’ কথাটি শুনতে ভালো
লাগত। ভাবতে ভালো লাগত। একটি
শুচি-সুন্দর অনুভূতি তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়ত
চেতনায়। পৌরাণিক কথা খানিকটা
আলো ফেলতেই মনে পড়ত দেবদৈত্যের
প্রচণ্ড সংগ্রামে সমুদ্র মন্থনের কথা—অমৃত-
কুন্ডের কথা। অমৃত বলতেই ভাবতাম
পবিত্র আকর্ষণীয় তৃপ্তিদায়ক সঞ্জীবনী এমন
কিছু কল্পিত সুধার কথা। এই ভাবনারই
বিবর্তনে ক্রমে ক্রমে জনমানসে স্বাদে গন্ধে
রসনার পরিতৃপ্তিতে আকর্ষণীয় কোনো
উদ্দীপক খাও বা পানীয়ের কথা এসে
প্রতিষ্ঠা পায়। কাশীরাম দাস যখন
শোনালেন, ‘মহাভারতের কথা অমৃত সমান’
তখনো ভাবনাটা খাও বিষয়ক ছিল না।

অমৃতের কাছাকাছি

চিদানন্দ গোস্বামী

ভাবনাটা ছিল মহাভারতের গৌরবময় এবং গভীরতম হৃদয় আবেদনের আকর্ষণীয় দিক সম্পর্কেই।

অমৃত-চর্চা এই আলোচনার বিষয় না হলেও, সম্প্রতি শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনীটি অমৃত-ভাবনা না ভাবিয়ে ছাড়ে নি। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে অমৃত-মখিত গন্ধের পরিমণ্ডলে—রূপ-রস-মাধুর্যের পরিমণ্ডলে কিছুক্ষণ বিস্ময়াহত না হয়ে পারি নি।

ভাবছিলাম, ফুলের রানী গোলাপ, ফলের রাজা আম, পাখির রাজা ময়ূর ইত্যাদি কথা। কেন? না, প্রদর্শনী-গ্যালারীতে আমের বিচিত্র সমারোহ দেখে। দৃশ্যটি আমার দৃষ্টি এবং মন কেড়ে নিয়েছিল। আম দিয়েই যেন ফল প্রদর্শনীর শুরু। চলতি জাত, সঙ্কর জাত, দুর্লভ ঐতিহ্যের বহুমূল্য জাত মিলিয়ে প্রায় ৭০ রকমের আমের বাহারী আম-দরবার যেন আলো করে আছে। ল্যাংড়া, হিমসাগর, বোম্বাই, ফজলী ছাড়া রত্নসভায় ছিল কোহিতুর, রানী পসন্দ, বেগম পসন্দ, সুলতান পসন্দ, দিল পসন্দ, সফদার পসন্দ, এনায়েত পসন্দ, নবাব পসন্দ ইত্যাদি। ছিল কালো পাহাড়, আনানসী, চম্পা, মল্লিকা, আলফানশো, চোসা, পৈরী, লখনা, মধু গুলগুলি, আত্মপালী এবং বাতাসা নামের ছোট্ট আম। ছিল, লিচু, কলা, আনারস, শীত মণ্ডলীয় ফল নাসপাতি, প্লাম, পীচ ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে মনে আবৃত্তি করলাম, ‘বাংলার

মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।’

এ রাজ্যের আম উৎপাদনকারী জেলা ২৪ পরগনা, হুগলী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা আমের বিচিত্র পশরা নিয়ে সাজিয়েছে গ্যালারী।

প্রদর্শনীটিকে তিনটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রাজ্যের উৎপন্ন ফল। গ্রুপ বি-তে ঠাই পেয়েছে মেয়েদের তৈরী ফলজাত উৎপন্ন সামগ্রী। অর্থাৎ জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ, স্লাইস, জুস, মোরব্বা, চাটনী, আচার, কাসুন্দী প্রভৃতি। আর গ্রুপ সি-তে রয়েছে কমার্সিয়াল ফ্রুট প্রোডাক্টস।

শিলিগুড়ির বাঘাঘাটীন ক্লাব ভবনে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ দ্বারোদঘাটন করলেন ফিতে কেটে। দর্শনার্থীদের কোতূহল এবং অনুরাগে যেন বান ডাকল। বলতে শুনলাম জর্নৈক সাধারণ দর্শককে—ফলের এতো সমাবেশ, সমারোহ, রাজ্যের উৎপাদনের এতো গৌরব, কিন্তু নাগালের বাইরের এই ফলকে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না আনলে এই ফলে কি ফল! এই কথাটিই বোধ হয় জনমানস।

ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ মন্ত্রিজনোচিত কর্তব্য কর্ম সম্পাদনেই পরিতৃপ্ত ছিলেন না। তিনি জনমানস উপলব্ধি করতে পারেন। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে তিনি গভীরতায়,



বসুন্ধরা : আষাঢ় ১৩৯১

অভিজ্ঞতায় এবং দূরদর্শিতায় দেখতে জানেন।
তাই উদ্বোধনী সভায় তাঁর বক্তৃতা ছিল বড়
আন্তরিক, একান্তই প্রাসঙ্গিক এবং অত্যন্ত
বাস্তব।

উদ্বোধন সভায় একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত
সভার কিছুক্ষণ আগে রচনা ও সুর
সংযোজন করে গেয়েছিলাম। ‘সুজলা সুফলা
শস্যশ্যামলা/রূপসী সোনার বাংলা—ডেকেছি
তোমাকে/অথচ অমৃত বাংলা, এ নামে
ডাকিনি/মধুরা এ নামে ডাকবো বাংলা
মাকে।’ গানটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে
মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক

কৃষিমন্ত্রী উদ্বোধনী সঙ্গীতটির প্রসঙ্গ
উল্লেখ করলেন তাঁর মূল্যবান ভাষণে। বললেন,
গানটির কথা এবং সুর এখনো যেন কানে
ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু এই বাণীটিকে আমাদের
বাস্তব কাজে রূপায়িত করতে হবে। প্রসঙ্গ-
ক্রমে তিনি বললেন, রাজ্য কৃষি বিভাগের
উদ্যান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান আজ।
কিন্তু অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়েই যেন
আমাদের অনুষ্ঠান শেষ না হয়ে যায়।

উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে
কৃষিমন্ত্রী শ্রীগুহ যা বললেন, তার কয়েকটি
দিক লক্ষ্য করা যায়। এবং প্রতিটি দিকই



বিচিত্র আমের
পশরা কৌতুহলে
দেখছেন দর্শনার্থীরা

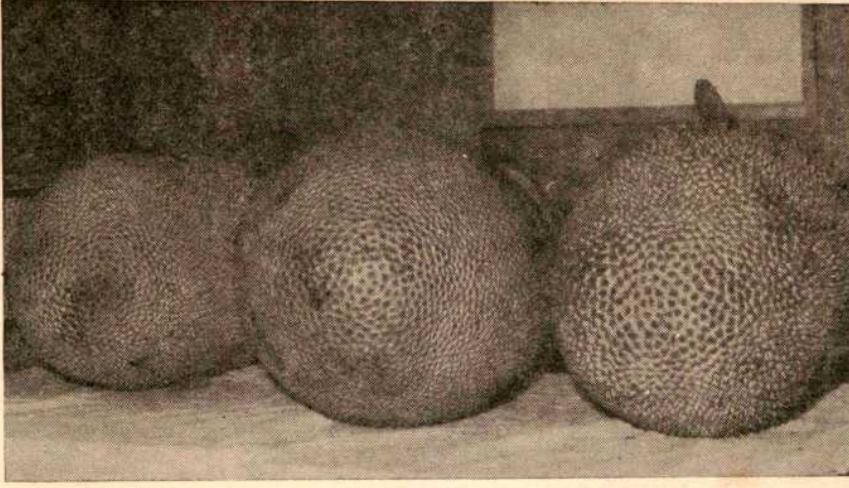
অমলেন্দু সরকার বলেছিলেন, বাংলাকে
সুজলা,.....শস্য শ্যামলা, রূপসী ইত্যাদি
বিশেষণে ডাকা হয়, কিন্তু অমৃত বাংলা
নামেই এখানে বাংলাকে সম্বোধন করা
হচ্ছে। অমৃতফল প্রদর্শনী উপলক্ষে এটি
তাৎপর্যপূর্ণ।

বলিষ্ঠ, প্রাসঙ্গিক, অর্থসমৃদ্ধ, বাস্তব অভিজ্ঞতা
প্রসূত এবং কল্যাণকর। একটি সরকারী
অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ বাহার বহরকে তিনি
একটুও প্রাধাণ্য দেন নি। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে
বললেন, রাজ্য কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার
সুবর্ণ জয়ন্তী আজ। কিন্তু অনুষ্ঠান পালনেই

যেন তা শেষ না হয়ে যায়। উপসংহারেও এই একই মেজাজে তিনি বললেন, প্রদর্শনীর পুরস্কার বিজয়ীদের কিছু উপহার দিয়েই সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান ফুরিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহলে কি উচিত? শ্রীগুহর ভাষণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আগন্তু ভাষণটি যুক্তির ঘন গাঁথুনীতে দৃঢ়। শ্রীগুহ বলেছেন, আমাদের অনেক সমস্যা আছে, সেগুলোর সমাধান করতে হবে। আর তার জন্যে চাই সবার সহযোগিতা। কিন্তু সমস্যা কি? তাও তিনি স্বচ্ছ করে শোনালেন। আজকের দিনে ফলের চালচিত্রটি যে জনসাধারণের কাছে খুব একটা উদ্দীপক নয়—জনগণ যে ফলের একান্ত সান্নিধ্যে আসতে অক্ষম, কিম্বা রাজ্যে ফল উৎপাদনে এবং বাজার দরের সামো যে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বান ডেকে তুলতে পারছেন না, তা বাস্তব সত্য। কিন্তু এই অবাস্তব এবং বেদনাদায়ক সত্যটিকে প্রশ্রয় দেয়াটাও তো আমাদের কাজ নয়। অবস্থার তিনটি পর্যায়—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্তমানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজ করতে গেলে অতীতের অবস্থাটিকে একটু মনে রাখতে হয় বৈকি। ফলের বর্তমান হাল নিয়ে কথা বলতে গেলে অতীত চিত্রটি জানা দরকার কিঞ্চিৎ। অতীতের দশকের পর দশক রাজ্যের উত্থান শাখা বা ফলউৎপাদন খুব একটা গুরুত্ব পেয়েছিল কি? তাই বোধ হয় শ্রীগুহ বললেন, কৃষি বিভাগের শস্য শাখার

পাশাপাশি উত্থান শাখা যেন সুয়োরানী-ছুয়োরানী সম্পর্কের হয়ে আছে। এই অবস্থাটি অচিরে দূর করতে হবে। আমাদের দেশ ফলের বাগিচা রক্ষা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এ সমস্যাকে দূর করতে হবে। আর বললেন, যেসব অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফলের তেমন জনপ্রিয়তা নেই, সে অঞ্চলে সে ফলের জনপ্রিয়তা গড়ে তুলতে হবে। কৃষি অধিকর্তা সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি আশা করছেন, জানালেন। এককালে ফল বিষয়ে উদাসীনতা কিংবা যথোচিত উৎসাহের অভাবের ফলে যে সমস্যা বর্তমান, তার সঙ্গে বর্তমানের একটি ভয়ঙ্কর সমস্যার উল্লেখ মাননীয় মন্ত্রী বিশেষভাবে করলেন। বললেন, আমরা একদিকে চেষ্টা করছি বন সৃজনের জন্যে। রুষ্টিপাত ও আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা করতে বন সৃষ্টি করতে। অতীতের নির্বিচারে বন ধ্বংস হয়ে চলেছে। একটি বাস্তব চিত্র গভীর অভিজ্ঞতা থেকে দিলেন তিনি। বললেন, ব্যাঙের ছাতার মতো হাজার হাজার শ' মিল গজিয়ে উঠছে। আর এই শ' মিলের কাছে হাজার হাজার আম কাঁঠালের গাছ বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। সুদূর দিনহাটাতেও দেখলাম শ' মিল জাঁকিয়ে বসেছে। এইভাবে বন ধ্বংস—ফল গাছ নষ্ট হয়ে চলেছে। খুব বাস্তব সমস্যাটির উল্লেখ করলেন। আর এ বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন থাকতে তিনি আহ্বান জানালেন।



রূপে আয়তনে
বর্ণে গন্ধে মানে
আকর্ষণীয়
কাঠাল প্রদর্শণীর
আরেক কৌতু-
হলের বিষয়।

সমস্তার উল্লেখই নয় মূল্যবান নির্দেশও রাখলেন মন্ত্রীমহোদয়। কি সেটা? বললেন, শুধু এ রকম প্রদর্শনীই নয়, যেসব ব্লকে সরকারী খামার আছে, সেখানে কম করে এক একর জমিতে প্রদর্শনী করা দরকার। সেখানে হাতে-কলমে ফল গাছের কলম তৈরি শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এ ভাবেই গৃহস্থ ও কৃষকরা উৎসাহী হয়ে উঠবেন। গৃহস্থ ও উৎপাদকদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, গৃহস্থরা ও ফল উৎপাদকরা যেন এই প্রদর্শনীটির মূল ফলটি গ্রহণ করতে পারেন।

সমস্তা বিশ্লেষণ এবং নির্দেশ ইত্যাদির পর মন্ত্রীমহোদয়ের কণ্ঠ যেন আরো আন্তরিকতায় ভরে উঠল। বললেন, পশ্চিম-

বঙ্গের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের উন্নয়ন সম্পূর্ণ করতে হলে গঙ্গার এ পারের উত্তর-বঙ্গের দু' কোটি মানুষের উন্নতি অবশ্যই করতে হবে। মন্ত্রী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে কৃষি বিভাগের কাছে, উত্তরবঙ্গের কৃষক ও জনসাধারণের কাছে এবং পশ্চিমবঙ্গ বাসীর কাছে এ আমার বিশেষ আবেদন।

প্রধান অতিথির ভাষণ শেষ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু একটি গভীর অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা যেন সমগ্র পরিমণ্ডলকে সতেজ করে রেখেছিল। প্রদর্শনী দর্শক সেই ভঙ্গলোকটির স্বগত কথাটিও মনে পড়ল। এবং একটি গভীর আশাবাদ যেন বলিষ্ঠ উত্তর ঘোষণা করল, ফলে ফলে এই বাংলা একদিন অমৃতময় হয়ে উঠবে।

দার্জিলিং-এর

কমলালেবুর

হাল হকিকৎ

ডক্টর রাধাগোবিন্দ মাইতি

ক্লপে-রসে, স্বাদে-গন্ধে দার্জিলিং-এর কমলালেবু এককালে ছিল তুলনাহীন। কয়েক দশক আগেও এই লেবুর সমাদর ছিল সারা ভারতবর্ষে। তখন দার্জিলিং-এর পাহাড়ী এলাকায় প্রায় ছ' হাজার হেক্টর জুড়ে ছিল কমলালেবুর বাগান। হেমন্তের হিমেল হাওয়ার সাথে রাশি রাশি পাকা লেবু পাহাড় থেকে নেমে আসত কলকাতার বাজারে; তারপর ছড়িয়ে পড়ত মফঃসলের শহরে ও গাঁ-গঞ্জের হাটে-বাটে।

ছুংখের বিষয় আজ এ লেবুর দেখা মেলা ভার। দেখা মিললেও তার আকাশ-ছোঁয়া দামের জন্তু সে ছা-পোষা সাধারণ আয়ের মানুষের কাছে লেবু নয়, আশমানী চাঁদ! কারণ, গত কয়েক দশকে কালিম্পং, কাশ্মির, তাগদা, মিরিক প্রভৃতি অঞ্চলের কমলালেবুর বাগানগুলি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফলন গেছে খুবই কমে। তাই কমলালেবু ফসলের আর সে রমরমা নাই।

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

কেন এমন হোল? এর জবাবে বলা যায়, প্রাক-স্বাধীন আমলে অধিকাংশ কমলালেবুর বাগান ছিল প্রধানতঃ ইংরেজদের মালিকানায়। তখন বাগান পরিচর্যায় অবহেলা ছিল না। গাছগুলি ছিল স্বাস্থ্যবান; ফলনও ছিল প্রচুর। এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তাঁরা জলের দামে এইসব বাগান বিক্রী করে দেন এ দেশীয় মালিকদের হাতে।

কথায় বলে—বিনা পয়সায় পেলে বিষ খেতেও রাজি। সুতরাং কমলালেবুর পরিচর্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকেরাও যে সস্তায় পেয়ে এইসব লোভনীয় বাগান কিনে নেবেন—তাতে আর আশ্চর্য কি? নতুন মালিকদের একমাত্র কাজ ছিল পাকার সময় ফল বিক্রী করে পয়সা উঠিয়ে নেওয়া।

ক্রমে উপযুক্ত যত্নের অভাবে গাছ দুর্বল হতে থাকল; গাছে রোগ লাগল; বাগান আগাছায় ভরে গেল; শেষে ছ-একটা করে

গাছ মরতে লাগল। ফলন অনেক কমে যাওয়ায় বাগান থেকে তেমন লাভ হোল না। তাই আয় বাড়াতে কমলালেবুর ফাঁকে ফাঁকে চাষ করা হল ভুট্টা। ভুট্টার আবার রাগুসে খিদে। প্রকৃতিজাত যেটুকু খাবার কমলালেবু পাচ্ছিল, ভুট্টার ফসল সেটুকু শুধে নিল। ভারত বিখ্যাত দার্জিলিং লেবু প্রায় শেষ হয়ে এল এইভাবে।

এই সুযোগ নিল প্রধানতঃ নাগপুরের কমলালেবু—যাকে কেউ কেউ বলেন ‘সান্তুরা’। যদিও রূপে-গুণের স্থান কমলাকৌলিণ্যের দ্বিতীয় সারিতে, তবু দার্জিলিং লেবুর অনুপস্থিতির সুযোগে বাজার দখল করে নিল নাগপুরের লেবু। এতদিনে আমরা দার্জিলিং লেবুর স্বাদ ভুলেই যেতাম, যদি না এই ছদ্মবেশে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ এবং ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ মিলিতভাবে এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতেন।

এই তিন সংস্থার মিলিত প্রচেষ্টায় দার্জিলিং-এর কমলালেবুর উপর গবেষণা শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগে। গবেষণার ভার নিয়েছেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান-বিজ্ঞান বিভাগ; আর্থিক সংস্থান করছেন অষ্ট ছটি সংস্থা। গবেষণা প্রবাহকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ দুটি ধারায়—

- (১) পুরনো বাগানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে আবার ফলবান করে তোলা এবং
- (২) প্রথম থেকে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ

করে নতুন বাগান গড়ে তোলা।

প্রথম ধারার গবেষণা চলছে কালিমপং, কাশিয়াং, আমবুটিয়া, মিরিক প্রভৃতি জায়গার লেবু চাষীদের বাগানে; আর দ্বিতীয় ধারার গবেষণা চলছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পেদোং খামারে। কালিমপং শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত এই খামারটি রাজ্য সরকার থেকে হস্তান্তরসূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওয়া।

প্রথম ধারার গবেষণা মাত্র কয়েক বছরের চেষ্টায় কমলালেবু চাষীদের সামনে সাফল্যের সোনালী দিগন্তের যে ইশারা বয়ে এনেছে, তা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই কাজে নিবেদিতপ্রাণ একদল গবেষক গবেষণার প্রয়োজনে ছাড়িয়ে রয়েছেন বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে, যেখানে জীবনযাত্রার সুখ সুবিধা নেই বললেই চলে। এই গবেষকরা উচ্চ শিক্ষিত। বিরূপ প্রাকৃতিক আবহাওয়া এবং অনভ্যস্ত সামাজিক পরিবেশ থেকেও অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন এঁরা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যান-বিজ্ঞান বিভাগের তত্ত্বাবধানে।

দার্জিলিং এলাকার অধিকাংশ কমলালেবুর বাগান অবস্থিত ৮০০ থেকে ১৩০০ মিটার উচ্চতায়। গড় বৃষ্টিপাত বছরে ২২৫ থেকে ২৭৫ সেন্টিমিটার। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৮০ থেকে ৯৫ শতাংশ। অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ঢালু জমির হালকা মাটি

থেকে সহজে ক্ষারজাতীয় মৌলধাতু ধুয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলের মাটি অম্ল। তাছাড়া ধুয়ে যাওয়ার জন্য মাটিতে জৈবসার, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, ম্যাগনে-শিয়াম, দস্তা, তামা প্রভৃতি উদ্ভিদ-খাত্তেরও অভাব। ফলে এখানকার জমির প্রকৃতিগত উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে।

এদিকে কমলালেবুর বাগানে সার ব্যবহারে মালিকদের কুপণতা, গাছের ক্ষতিকারক পোকের প্রতিকার ও রোগ নিরাময়ে অনীহা, সেচ ও আগাছা দমনের প্রতি অমনোযোগিতা এবং সর্বোপরি বাগানে রাফুসে ফসল ভুট্টার চাষ করে সহজ লাভের প্রবণতা এই অঞ্চলের বাগানগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এইসব বাগানের অধিকাংশ গাছ রোগাক্রান্ত। প্রধান রোগ ‘পাউডারী মিল্ডিউ’। আক্রান্ত গাছ দেখলে মনে হবে কেউ যেন পাতা, নরম ডাল ও ফলের উপর শাদা শাদা গুঁড়ো এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। পাউডারী মিল্ডিউ লাগলে আক্রান্ত অংশ তাড়াতাড়ি মরে যায়; ফল ঝরে পড়ে, গাছ দুর্বল হয়ে যায়।

কীট শত্রুর মধ্যে প্রধান হোল ‘কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা’। এই পোকা গাছের কাণ্ড ও মোটা ডালের ভিতর ঢুকে কুরে কুরে খায়; বাইরে বেরিয়ে থাকে মল মেশান পাতলা জালের নালী। রাতে এই পোকা বেরিয়ে এসে গাছের ছালও খেয়ে ফেলে।

এছাড়া গাছে ফল ধরার পর দফায়

দফায় সেগুলি ঝরে পড়ে। যে কয়েকটি টিকে থাকে তারও বেশীর ভাগ ফলের মাছির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পচে যায় বা ঝরে যায়। এই মাছি ফলের ছালে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে সত্ত-বের-হওয়া কীড়া ছাল ফুটো করে ফলের ভিতরে ঢুকে যায়।

এইসব ক্ষয়িষ্ণু বাগানে গবেষণা করে গবেষকরা দেখলেন যে গাছের গোড়ায় পরিমাণমত সার দিলে ফলন ৫২ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা ও তামার উপযুক্ত দ্রবণ রুগ্ন গাছের পাতায় স্প্রে করলে শুধু যে ফলন বাড়ে তাই নয়, ফলের গুণগত মান অনেক উন্নত হয় এবং গাছ সুস্থ ও সতেজ হয়।

ফলের আকার মটর দানার মত হলে গাছে হরমোন স্প্রে করে পাকা পর্যন্ত শতকরা ছেচলিশটি ফল টিকিয়ে রাখা সম্ভব। মার্বেলের মত অবস্থায় আর একবার স্প্রে করলে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় বিরামিতে।

তাই দার্জিলিং-এর পাহাড়ী এলাকার মৃতপ্রায় কমলালেবুর বাগানগুলিকে স্বাস্থ্য-বান ও লাভজনক করার জন্য এই সব গবেষকদের সুপারিশ হোল :

১। বর্ষার ঠিক আগেই গাছের শুকনো ও রোগাক্রান্ত ডালগুলি ছেঁটে দিন। তারপর প্রাতি লিটার জলে ১০০ গ্রাম হারে ব্লাইটক্স মিশিয়ে কাটা জায়গাগুলিতে প্রলেপ দিন।

২। উপযুক্ত সময়ে নিড়ানী দিয়ে বাগানকে আগাছামুক্ত রাখুন।

৩। বিশ বছর বা তার বেশী বয়সী প্রতিটি গাছে বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ৩০ থেকে ৪০ কিলোগ্রাম গৃহপালিত পশুর মলমূত্র থেকে তৈরী সার দিন। এ ছাড়াও রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রয়োগ করুন ২০০ গ্রাম নাইট্রো-জেন, ১০০ গ্রাম ফসফেট এবং ২০০ গ্রাম পটাশ। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে রাসায়নিক সারগুলি আর একবার দিন। জমিতে সার দিতে হবে বৃন্তের আকারে গাছের গোড়া থেকে দু-তিন ফুট ছেড়ে দিয়ে যতদূর পর্যন্ত ডালপালা ছড়িয়ে আছে ততদূর পর্যন্ত। গাছের বয়স বা চেহারা কম হলে আনু-পাতিক হারে সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হবে।

৪। জমিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পর সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিন। নইলে শিকড় জ্বলে গিয়ে গাছ মরে যাবে।

৫। প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম জিংক সালফেট, ৪ গ্রাম কপার সালফেট, আড়াই গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ১০ গ্রাম কলিচুন ভালভাবে মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে ছেকে একবার বৈশাখে এবং আর একবার আশ্বিনে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে সারা গাছে ছিটিয়ে দিন। এর ফলে গাছের অনুখাতের ঘাটতি পূরণ হবে; গাছ সবল ও রোগমুক্ত হবে।

৬। বৈশাখের শুরু থেকে ১৫ দিন অন্তর প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম ব্যাভিষ্টিন ও এক গ্রাম কেলথেন একসঙ্গে মিশিয়ে চার-

পাঁচ বার গাছে স্প্রে করুন। এর ফলে পাউডারী মিলডিউ, ক্যাংকার (ডালে ও পাতায় দাদের মত চিহ্ন) ও জাবপোকার আক্রমণ প্রতিহত হবে।

গাছের ছাল ফেটে আঠা বের হলে আক্রান্ত জায়গা থেকে পচা অংশ সম্পূর্ণভাবে চোঁছে ফেলে দিয়ে জলে ঘন করে ব্রাইটক্স মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লেপে দিন। বৈশাখ মাসে মাটি থেকে দু-তিন ফুট উঁচু পর্যন্ত গাছের কাণ্ডে এই ব্রাইটক্স গোলা জলের সাহায্যে চুনকামের মত করে মাখিয়ে দিন।

৭। গাছ প্রতি ১০ গ্রাম থাইমেট ১০ জি দানা প্রথম বার জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং দ্বিতীয় বার ভাদ্র মাসে গোড়ার জমিতে মিশিয়ে দিন। এর ফলে কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ কমে যাবে। সারের সঙ্গে এই ওষুধ প্রয়োগ করলে পরিশ্রম ও খরচ দুইই বাঁচে। ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বেশী হলে এবং সেগুলি গাছের কাণ্ড ও ডালে গভীর গর্ত করে বাসা বাঁধলে গর্তের মুখ পরিষ্কার করে সেখানে পেট্রল ভেজান তুলা ঢুকিয়ে কাদা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিন। পেট্রলের গন্ধে শ্বাসরোধ হয়ে পোকাগুলি মারা যাবে।

৮। প্রতি লিটার জলে আধ মিলি-লিটার ডিমেক্রন-১০০ ই.সি, অথবা তিন মিলিলিটার রোগর-৩০ ই.সি. অথবা দু মিলিলিটার থায়োডেন-৩৫ শতাংশ মিশিয়ে ফলের উপর স্প্রে করে ফলের মাছি দমন

করুন। তবে বিষক্রিয়ার জন্তু ওষুধ দেওয়ার তিন সপ্তাহের ভিতর ফল পাড়া নিষেধ।

৯। প্রতি লিটার জলে ৫ মিলিলিটার হিসাবে ২, ৪-ডি বা ২৫ মিলিগ্রাম হিসাবে জিবেক্লোরিক এসিড মিশিয়ে ফলের আকার মটর দানার মত হলে একবার এবং মার্বেলের মত হলে আর একবার গাছে স্প্রে করুন। এতে ফল-ঝরা কমে গিয়ে অনেক বেশী ফল পাকা পর্যন্ত গাছে থাকবে এবং ফলের আকার ও গুণগত মান বাড়বে।

১০। জমিতে জলের অভাব মনে হলে শীতকালে ও গরমের দিনে ২০ দিন অন্তর সেচ দিন। বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় বলে সাধারণতঃ সেচের দরকার পরে না।

১১। কমলালেবুর বাগানে কখুনো ভুট্টার চাষ করবেন না। যদি জায়গা খালি থাকে গাছের ডালপালা যে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তার বাইরে উপযুক্ত সার ও পরিচর্যা-সহ আলু, কপি, মটরশুঁটি, বীন বা সোয়াবীনের চাষ করুন।

এইভাবে বাগানের পরিচর্যা করলে দু-তিন বছরের মধ্যেই পুরনো বাগানগুলিতে ফসলের পরিমাণ শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত বেড়ে যাবে। বাগান-মালিকদের অমুরোধে এই সব সুপারিশ বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে কমলালেবু চাষীদের

জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বহু চাষী এই সব সুপারিশ ইতিমধ্যে কাজে লাগিয়ে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন। বহু বছর পরে আবার বাজারে যে কিছু কিছু দার্জিলিং-এর কমলালেবু দেখা দিয়েছে, তা প্রধানতঃ এই গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর ফলে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে—প্রথম যখন পুরাতন বাগানের মৃতপ্রায় গাছগুলিতে গবেষণার প্রয়োজনে কয়েক হাজার টাকা খরচ করে সার ও ওষুধ দেওয়া হল, তখন প্রতিবেশী বাগান-মালিকেরা বলেছিলেন, “এভাবে অনর্থক টাকা খরচ করা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, তাঁদের হল সরকারী টাকা। আমাদের পক্ষে এ ধরনের বাগানে টাকা খরচ করা আর টাকাকে জলে ফেলে দেওয়া একই কথা।”

বছর দুয়েক পরে গবেষণার ফলাফল দেখে তাঁরাই ছুটে এসেছেন গবেষকদের কাছে। বলেছেন, “আমাদের বাগান দেখে বলুন, সেখানে কি কি সার ও ওষুধ দিতে হবে; আর কিভাবে গাছের যত্ন-আত্তি করতে হবে। টাকায় টাকা লাভ পাব যখন, তখন আর খরচের জন্তু ভাবনা কি! দরকার হলে সোনাদানা, জমি-জমা বন্ধক দিয়েও টাকা যোগাড় করব।”

আমন ধানের চারা সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মত সার দিয়ে রোয়া করুন

আমন ধানের বাড়তি ফলনের জন্য নিম্নলিখিত উপায়ে চাষবাস করুন—

- আষাঢ় থেকে শ্রাবণের মধ্যে চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন।
- চারার বয়স—জলদি জাত ৩ সপ্তাহ, মাঝারি জাত ৪ সপ্তাহ, নাবি ৫ সপ্তাহ।
- চারা ৫ সে.মি. (২ ইঞ্চি) বেশি গভীরে রুইবেন না।
- জলদি ও মাঝারি জাতের চারা ২০ সে.মি. $\times$ ১০-১৫ সে.মি. (৮ $\times$ ৪ ইঞ্চি) এবং নাবি জাতের চারা ২৩ সে.মি. $\times$ ২৩ সে.মি. (৯ $\times$ ৯ ইঞ্চি) দূরত্বে লাগান।
- সাধারণতঃ প্রতি গুছিতে ৩-৪টি চারা থাকা দরকার, তবে জলের চাপ বেশি বা জমি নোনা হ'লে প্রতি গুছিতে ৭-৮টি চারা থাকা দরকার। প্রতি হাতে ৪টি গুছি রোয়া দরকার।
- রোয়ার শেষে জমির কোণে কিছু বাড়তি চারা রেখে দিন। কোন জায়গায় চারা মরে গেলে ঐ বাড়তি চারা দিয়ে ফাঁক পূরণ করবেন।
- মাটি পরীক্ষা করা না থাকলে শেষ চাষের আগে নীচের তালিকা অনুযায়ী সার দিন।

ধানের জাত	একর প্রতি কেজিতে সারের পরিমাণ		
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
১। অধিক ফলনশীল			
ক) জলদি (১০০—১২০ দিন)	৫	১০	১০
খ) মাঝারি (১২০—১৩০ দিন)	৬	১২	১২
গ) মাঝারি নাবি ও নাবি	১২	১২	১২
২। দেশী উন্নত	৮	৮	৮

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ
কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭১

অমৃত বাংলা

চিকানন্দ গোস্বামী

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা
রূপসী সোনার বাংলা, ডেকেছি তোমাকে,
অথচ অমৃত বাংলা তোমারে ডাকিনি,
মধুরা এ নামে ডাকব বাংলা মাকে।
বাংলা তোমার রূপের মধুরী দেখেছি,
রূপে রসে মধু গন্ধে তোমারে জেনেছি,
রূপের আড়ালে অরূপ-আত্মা তুমি,
ডাকব বাংলা, আজকে সেই ডাকে।
ফুলে ফলে প্রাণ-সুধাময়ী, মনে রাখব,
তুমি যে অমৃত বাংলা সে-নামে ডাকব,
রূপসী বাংলা, সোনার বাংলা,
অমৃত বাংলা মাগো,
তোমার হৃদয়ে জন্ম দিও গো আমাকে।

[রাজ্য উদ্ধার শাখার শিলিগুড়িতে অচলিত স্বর্ণ
জয়ন্তী উৎসবে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে রচিত
এ গানটি গাওয়া হয়।]

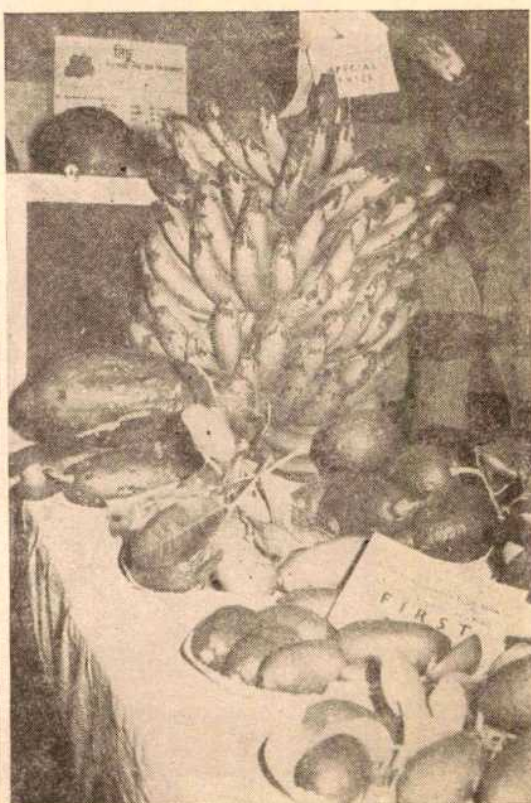
চিত্র-বিচিত্র।



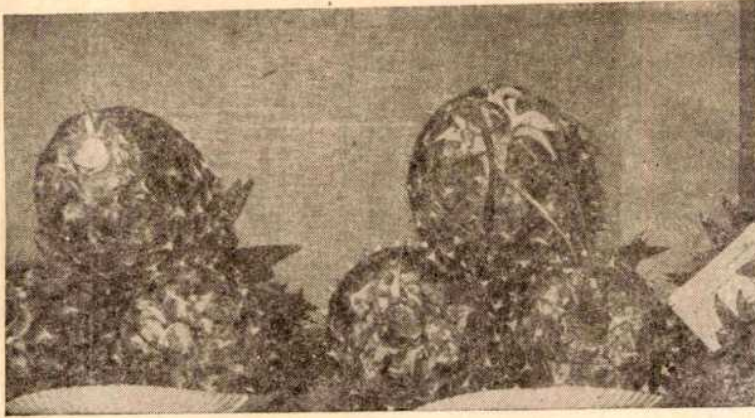
ওপরে : প্রদর্শনীতে বিজয়ীদের পুরস্কার দিচ্ছেন
কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ

ডান পাশে : পুরস্কার বিজয়ী কলা, পেঁপে এবং
বিচিত্র লেবু

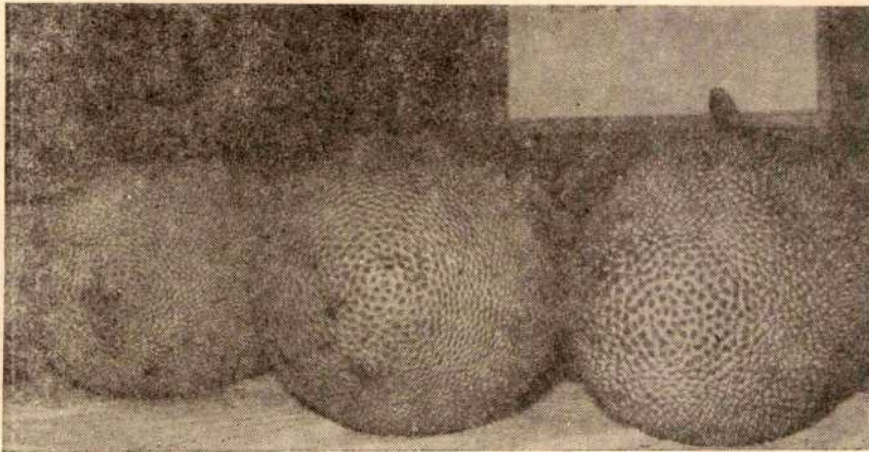
নীচে : রকমারী আমের চমৎকার সমাবেশ



বসুন্ধরা : আষাঢ় ১৩৯১



প্রদর্শনীতে জলপাইগুড়ি
গৌরবোজল, আনারসের
দৌলতে



আরেকটি ফল কাঁঠাল : বিস্তৃত করেছে প্রদর্শনীর দর্শকদের



আর ছিল ঘরগীদে
এবং বাগিচ্যাসংস্থার
তৈরী জ্যাম জেলী
স্কোয়াশ চাটনী
ইত্যাদি



কার্শিয়াঙের বি,
পাণ্ডে পাঁচ গ্রাম
ইত্যাদি ফলে প্রথম
পুরস্কার বিজয়ী।
পশরা দেখাচ্ছেন
বজ্রঙ্করার সহ-
সম্পাদককে

প্রদর্শনীতে আরেকটি
কৌতুহল রচনা
করেছে ফলের কলম
তৈরীর নানা কৌশল
শেখানো



শিলিগুড়ির এই
প্রদর্শনীটির ভেত-
রের প্রবেশ পথের
একটি দৃশ্য

উত্তর কলম

প্রঃ—চন্দ্রমল্লিকার পাতা পচে যায় কেন? প্রতিকারই বা কি?

উঃ—ফাঙ্গাস বা ছত্রাকের আক্রমণে পাতা পচে যেতে পারে। কারণ বর্ষাকালে বাতাসে আর্দ্রতা (হিউমিডিটি) বেশি হয়। তারই ফলে ছত্রাকের আক্রমণ। কপার ফুঙ্গিসাইড দিলে আক্রমণ রোধ হয়।

প্রঃ—লিচুর কাটিং কি পদ্ধতিতে করা যায়?

উঃ—মিস্ট প্রপাগেশন করে হরমোন দিয়ে লিচুর কাটিং থেকে শিকড় করা যায়।

প্রঃ—গাছের নীচে গ্রীণ হাউস করা যায় কি?

উঃ—উচিত না। গাছের টোপা জল নীচের গাছে পড়ে পড়ে ক্ষতি করে।

প্রঃ—চন্দ্রমল্লিকার গোড়া থেকে পাতা রাখতে হলে কি পদ্ধতি নেয়া যায়?

উঃ—টব ভরার আগে তলার ফুটোতে দেড় ইঞ্চি পুরু করে খোয়া বিছিয়ে দিন।

মাটির মিশ্রণ তৈরি করুন ১ ভাগ মাটি, ১ ভাগ বালি, ১ ভাগ পাতাপচা সার, ১ ভাগ গোবর সার ও প্রতি টব মিশ্রণের সঙ্গে ২০ গ্রাম সুপার ফসফেট মিশিয়ে। ২০ দিন অন্তর প্রতি লিটার জলে আধ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে গাছে স্প্রে করুন।

উত্তর কলম

উত্তর কলম

উত্তর কলম

উত্তর কলম

উত্তর কলম



প্রঃ—ডালিয়ার বাষ বেশি দিন কি ভাবে রাখা যায় ?

উঃ—দেৱীতে চারা লাগান। গাছে ফুল ফুটতে দেবেন না। শেষের দিকে কম করে জল দিন। প্রতি কেজি গুঁড়ো মাটির সঙ্গে ৫ গ্রাম ব্লাইটকস মিশিয়ে দই-এর মত কাদা করে তাতে ডালিয়ার মূল ডুবিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে পলিথিনের থলেতে ভরে ঘরে ঠাণ্ডা জায়গায় রাখুন।

প্রঃ—বড় পাতিলেবু গাছ লাল হয়ে গেছে পাতা ঝরে যাচ্ছে। কি করব ? গাছ রোদে আছে, জল জমে না, দাগ মরচে পড়া।

উঃ—কপার ফান্টিসাইড দিয়ে দেখুন। জলের জন্তেও হতে পারে। কিংবা মাটিতে কোনো ঘাটতি আছে কিনা না পরীক্ষা করে বলা যাবে না।

প্রঃ—কৈঁচো দমন করব কি করে ?

উঃ—গ্যামাগ্লিন দিতে পারেন।

প্রঃ—গাছের নীচে গাছ লাগাব কি ?

উঃ—কৃষ্ণচূড়া, গুলমোহর, ঝাউ প্রভৃতি যেসব গাছের ছায়া কম, সে ক্ষেত্রে লাগাতে পারেন। ছায়া বেশি গাছের নীচে অর্থাৎ

আম কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের নীচে লাগাবেন না।

প্রঃ—সব থেকে উচ্চ মানের গোলাপ কোথায় পাওয়া যায় ?

উঃ—৮ হাজার গোলাপের জাত পৃথিবীতে আছে। বিদেশ থেকে আনার মত পশ্চিম বাংলায় কোনো সংস্থা নেই। জয়পুরের একটা সংস্থা বিদেশ থেকে এসব আনায়। বাঙ্গালোরের ছ' একটা নার্সারীও আনে।

প্রঃ—গ্রাফটিঙের সময় জল ঢুকলে ক্ষতি হয় কি ?

উঃ—হ্যাঁ, বাঁধবার সময় জল ঢুকলে ফান্টিসের আক্রমণ হয়।

প্রঃ—একই আমগাছে প্রতি বছর মুকুল আসেনা কেন ?

উঃ—গাছের ভেতরে একটা জেনেটিক ক্যারেকটার বা সহজাত স্বভাব থাকে। এ বছর হয়ত ৫-৬ হাজার ফলন দিল। আম পেড়ে নেবার পরে সেই ডালে পাতা বেরোল না। ফলে পরের বছর সে ডালে মুকুল এল না।

উদ্যান বিষয়ক বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনাচক্র

—বস্তুজ্ঞার প্রতিবেদক

বিগত ১৮ই জুন বিষ্ণুপুর ব্লকের (১) বিজ্ঞানগর কলেজ হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্যোগে উদ্যান বিষয়ক একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, প্রধান অতিথি এবং সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীঅমল দত্ত, এম. পি, রাজ্য কৃষি সচিব ডঃ পি. ভি. শেনয় এবং রাজ্য যোজনা পর্যদের সহঃ সভাপতি ডঃ অরুণ ঘোষ।

কৃষি প্রযুক্তিবিদ, কৃষিবিদ, কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কৃষক এবং উদ্যান অনুরাগীদের সমাবেশে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন রাজ্য কৃষি অধিকর্তা শ্রীবিষ্ণুপদ মণ্ডল। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীদত্ত এ রাজ্যে নার্সারীর উজ্জ্বল সুর্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই সুর্যোগকে বাড়াতে পারলে, কাজে লাগাতে পারলে এবং কৃষকদের ও রাজ্যের আর্থিক আয় বাড়াতে পারলে বহুদিক দিয়ে উপকার হবে। এর ফলে বছরের বেশির ভাগ সময়ে বেকার হয়ে থাকা কৃষি মজুররা সারা বছর কাজ পাবে। বর্তমানে যে সব প্রযুক্তি চালু হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তা কাজে লাগালে, উদ্যান চর্চায় বা নার্সারীতে আশাব্যঞ্জক লাভ হতে পারে। যারা নার্সারীর ব্যবসায়ে রয়েছেন, শিক্ষা বা ট্রেনিং দিয়ে ওঁদের এবিষয়ে সচেতন ও দক্ষ করে তুলতে পারলে নার্সারীর সম্ভাবনা উজ্জ্বল। পঞ্চায়েতকে এ ব্যাপারে কাজে লাগাতে পারলে সুর্যফল পাওয়া যাবে বলে শ্রীদত্ত আশা করেন।

নার্শারীর উন্নতি প্রসঙ্গে মোদা বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দিয়ে শ্রীদত্ত বলেন, এগুলো না হলে নিছক বক্তৃতা এবং ছবি বোর্ড শিশি-বোতল সাজানোতে কিছু ফল হবে না। সমবায় বা পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে নার্শারীর উন্নতি ঘটানো সম্ভব বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হার্টিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পশ্চিমবঙ্গের জঞ্চে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু পঃ বাংলার জঞ্চে তাঁরা কি করেছেন, এটা শ্রীদত্তর একটি জিজ্ঞাসা। সারা রাজ্যের জঞ্চে আপাততঃ না হলেও অন্ততঃ কয়েকটি রাজ্যের জঞ্চে যদি তাঁরা কিছু করেন, তবে এখানে নার্শারীর এক বিপ্লব আসতে পারে। এ বিষয়ে উদ্যোগী চাষীদের বোঝানো, শেখানো ও সহযোগিতা করার জঞ্চে রাজ্য সরকারকে তিনি কার্যসূচী নিতে অনুরোধ করেন। শ্রীদত্ত নার্শারীর উৎপাদকদের বিপণন সমস্যা তুলে ধরে বলেন, ৬ সপ্তাহের মধ্যে একটি চারা বিক্রী না করতে পারলে যে ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে, তা এড়াতে ওঁরা অসহায়ভাবে অল্প দরে চারা বিক্রী করতে বাধ্য হন। একটা সংগঠিত বাজার যদি সরকার ও নার্শারী এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠে, তাহলে সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নার্শারীর উৎপাদকদের ঋণ পাবার সঙ্কটের কথা উল্লেখ করে শ্রীদত্ত রাজ্য কৃষি সচিব ও কৃষি অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে রাজ্য কৃষি সচিব ডঃ পি. ভি. শেনয় কৃষিতে ধান চাষের মত উদ্যান বিষয়েও গবেষণা, সম্প্রসারণ, পরিচর্যা, বিপণন ইত্যাদি করার যথেষ্ট দরকারের কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘জনসংখ্যা বাড়ার ফলে খাটের চাহিদা এখন প্রায় ১০০ মে: টন। লোককে খাওয়াতে হবে। তারপর ফল ফুলের কথা এলো। আমি জানি, লোককে কাজ দেয়া যাচ্ছে না। কৃষিমজুর সারা বছর কাজ পায় না। কিন্তু নার্শারীর উন্নতি হলে মজুরদের কাজ দেয়া যাবে, আয়ও বাড়ানো যাবে।’

‘আমাদের এ রাজ্যে হার্টিকালচারের ৯টি গবেষণা কেন্দ্র আছে। বাঙ্গালোরের গবেষণা করা বীজ আমরা এখানে পরীক্ষা করি। ভাল মন্দ ছইই আছে। তবু আমরা যোগাযোগ রাখি এবং ট্রেনিংও পাঠাই। তবে আমি বলব, বাঙ্গালোরের মাটিতে যা ভাল, তাকেই ভাল বলে গ্রহণ করতে আমি বিশ্বাসী নই। আমাদের মাটি আবহাওয়া অনুযায়ী দেখতে হবে। রোগ পোকের পরিবেশ দেখে বিচার করতে হবে। ভারতের সব গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের গবেষণার ফল এখানের জঞ্চে উপযোগী বুঝলে চাষীদের কাছে পেশ করি।’ তিনি পরিশেষে বলেন, এখানে কয়েকটি ব্লক নিয়ে একজন উদ্যানবিদ নিযুক্ত করার কথা ভাবব, যাতে উদ্যান চাষীরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে উপদেশ নিয়ে নার্শারীর উন্নতি করতে পারেন।

রাজ্যের নার্সারী এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীহাজরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রস্তাব রাখেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ অরুণ ঘোষ বলেন, এখানের মাটি এবং আবহাওয়া উত্তান চর্চার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। বিষ্ণুপুরের গড়ে এক একরী মালিকানার বেশির ভাগ চাষীর আয় বাড়তে উত্তান বিষয়ে সরকারী উত্থোগকে তিনি অভিনন্দিত করে বলেন, এই প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং প্রসার ঘটানো উচিত। সমবায় সমিতি বাড়িয়ে তোলা, প্রতি গ্রামে হার্টিকালচার বাড়িয়ে তোলা এবং ভালো গুণমান জাতের চারা তৈরির ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) শ্রীদেবব্রত মুখার্জী। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণ বোস ভারতের ৩টি প্রসিদ্ধ ও উন্নত নার্সারী কেন্দ্রের মধ্যে ২৪ পরগণার আমতলাকে অগ্রতম বলে উল্লেখ করে আমতলা নার্সারীর পশ্চাদপট সম্বন্ধে ক্লিঞ্চিং বলেন। পূর্বের চেয়ে মানুষের উত্তান চর্চার, ঘর সাজাবার ও সবজি করার শখ বর্তমানে অনেক বেড়েছে এবং অনেকের জীবিকা অর্জনের পথও বর্তমানে নার্সারী-নির্ভর হয়েছে বলে তিনি জানান। নার্সারী চর্চায় উৎপাদকদের সততা, ক্রেতার সঙ্গে বিশ্বাস স্থাপন, ভাল জাত থেকে কলম করার

প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বীজের গুণ সম্পর্কে সরকারের সার্টিফিকেট দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা শ্রীবসু বলেন। এলোমেলো পদ্ধতিতে গাছের বংশবিস্তার না করে বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসরণ করতে তিনি বলেন। ঘর সাজাবার মুশাণ্ডার চারা বর্তমানে বাজারে অনেক কমে পাওয়া যায়। কিন্তু লাল মুশাণ্ডার দাম অনেক। তার কারণ বৈজ্ঞানিক প্রথায় এর বংশবিস্তার হচ্ছে না। বাজার তৈরি, পরিবহন, প্যাকিং প্রভৃতি সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন।

অত্যন্ত সাবলীল ও সরস ভঙ্গিতে বিধান-চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রাধা-গোবিন্দ মাইতি এরাঙ্গ্যের নার্সারীর ইতি-কথা, সমস্যা এবং সমাধানের প্রযুক্তিগত ও সংগঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ডঃ মাইতি সম্ভ্রান্ত জাতের ফল গাছ (এলিট প্ল্যান্ট) খুঁজে বার করবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন, যাতে করে এরাঙ্গ্যে উত্তান অঙ্গন (নার্সারী) উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। নার্সারীর রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বিশেষভাবে বলেন।

রাজ্য উত্তানবিদ ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সমাদ্দার উত্তরবঙ্গের উত্তানবিদ ডঃ বি. এন. রায়, কৃষি বিপণন শাখার উপঅধিকর্তা শ্রীলঙ্কর এবং আরো অনেকে অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ দেন।

রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী



প্রদর্শনীর একটি পরি-
সংখ্যান পড়ছেন কৃষিমন্ত্রী।
তার ডাইনে উদ্যানবিদ
এবং কৃষি অধিকর্তা

রাজ্য কৃষি বিভাগের উদ্যান

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখার ৫০ বর্ষ পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেলা থেকে ফল উৎপাদকরা প্রতিযোগী হিসেবে যোগদান করেছিলেন। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে বিজয়ীদের কৃষিমন্ত্রী শ্রীকমল গুহ পুরস্কার বিতরণ করেন।

আমে সফদার-পসন্দ, বৃন্দাবনী, আনারস, ল্যাংড়া, ফজলী, হিমসাগর, বোম্বাই, ও রানী-পসন্দ জাতে প্রথম হয়েছেন যথাক্রমে অনাদিদাস, সরোজ কুমার রায়, সরোজ রায় (মুর্শিদাবাদ), কার্তিক মণ্ডল, বরকত হোসেন খান (মালদহ),

পরিতোষ বোস (২৪ পরগণা), তপনকুমার মিত্র (বর্ধমান) প্রমুখ। কাঁঠালে প্রথম পুরস্কার পেলেন নদীয়ার করিমপুরে মনোজ বিশ্বাস। আনারসে জায়েন্ট কিউ জাতে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি থেকে যুগ্ম প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন মাধব ঘোষ ও শ্যামল কুমার আইচ। জলপাইগুড়ির মহেশচন্দ্র মণ্ডল পেলেন লিচুর প্রথম পুরস্কার। যুগ্মভাবে আরও একটি প্রথম পুরস্কার পেলেন মালদহের কালিয়াচকের মহঃ ওয়াহেদ আলী। কলায় জায়েন্ট গভর্নরে প্রথম পুরস্কার পেলেন নদীয়ার বিশ্বনাথ বিশ্বাস। আর শীতমণ্ডলীয় ছোটো ফলে ১ম পুরস্কার পেলেন দার্জিলিঙের বি. পি. পাণ্ডে।

কৃষিক্রান্তি

নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োজক, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঋণ, কৃষি বিপন্নন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সঞ্চালন, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃষ্টির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জ্ঞাত সন্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সন্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফ্রেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রেসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিকার বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন-এস’ বার্ষিক স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইচ্ছা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/অনন্যায়িত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রেতাকারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপি কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীভিত্তিক ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

চাষবাসের সাহায্যে
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন :

- | | |
|----------------------|---|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারন্যাশনাল/এক্ট কোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিংশুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “মুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার (Sprayer) |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রেশার (Thresher) |
| | ৬। হস্তচালিত জইলহো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল/লোহার লাজল ইত্যাদি |

তদুপরি,

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে—যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

**ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রীজ
কর্পোরেশন লিমিটেড**

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা ৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

29 OCT 1984

টেলিফোন : ২২-২৩১৪

ସମ୍ବନ୍ଧ



ଆବଣ : ୧୭୯୧



ସାତ୍ତ୍ରିଂଶ ବର୍ଷ

সূচী

সম্পাদকীয়

৩—৪

আমিন ধানে সার প্রয়োগ/মনোরঞ্জন রায় ৫—৯

অতিবৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমিন ধানে

শক্তিরক্ষা/দেবব্রত চ্যাটার্জী ১০—১৪

আমিন ধানের কর্মশূচী (কবিতা)/

বিমলেন্দু বিকাশ পাহাড়ী ১৫

রোগ দমনে সংবাহী রাসায়নিক

ওষুধের ব্যবহার/ডঃ স্বধাংশু ভূষণ

চট্টোপাধ্যায় ১৬—২০

জবাফুলের চাষ/সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

২২—২৬

সাইপ্রাসে কৃষি/ডঃ শক্তিপদ সরকার

২৭—৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ

বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(সাধারণ)

ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(গবেষণা)

ধূর্জটী মুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক, কৃষি অধিকার
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক
(সদর)

হলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক

বিষ্ণুপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

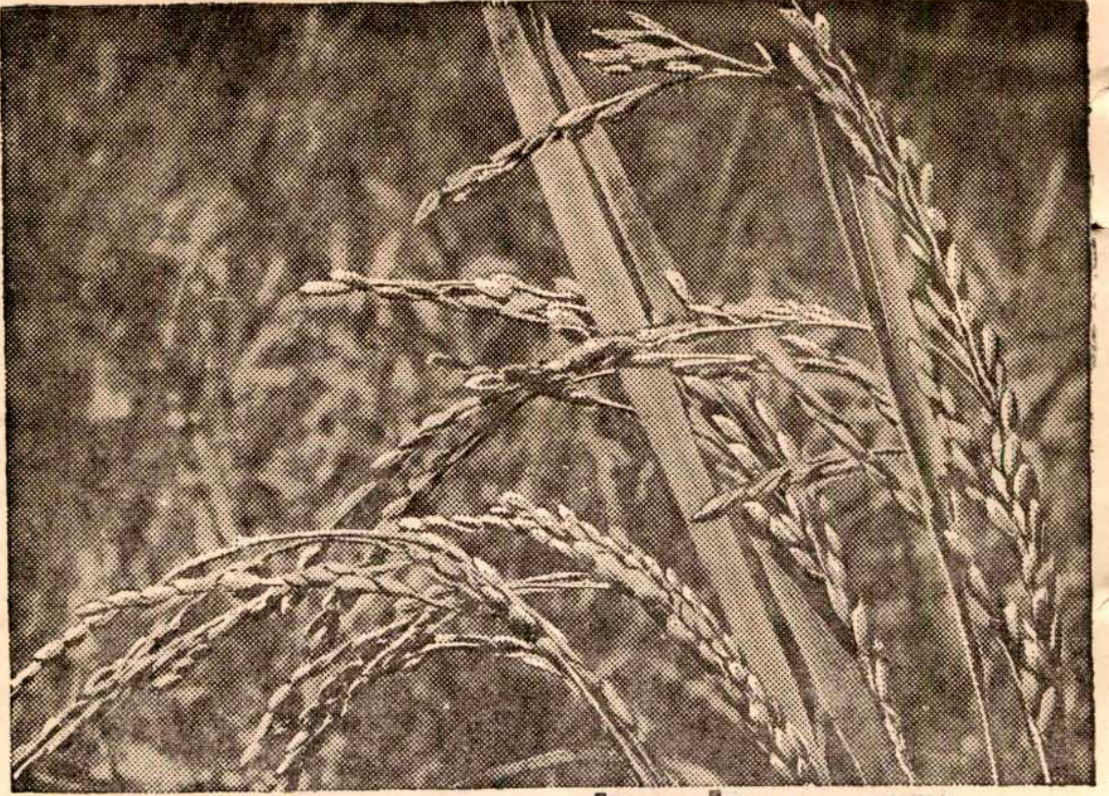
বহুক্রম

শ্রাবণ-১৩৯১

কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা

কর্তৃক প্রকাশিত





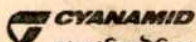
শক্তিশালী কীটনাশক থাইমেট ১০-জি

আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন

সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে

দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অধিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না। এমন পোকামাকড় বিনাশ করে। এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের প্রতিহত করার আভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে।

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১০-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে না। আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের অপেক্ষা থাইমেট ১০-জি একবার প্রয়োগ করলেই স্বফল পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তাঁরা এই ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন।



সারনামিড ইন্ডিয়া লিমিটেড
কৃষি বিভাগ

ফোন: ৮৮ নং ২১০২, বোম্বাই ৪০০ ০২৪

সারনামিড এন্ড ইন্ডিয়া লিমিটেডের সবার

* Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, U.S.A.



GL 385 NEW

সম্পাদক



ধান শুধু পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলই নয়, অধিকাংশ মানুষের উপজীবিকাও বটে। এ রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থাও এই ফসলের ভালমন্দর সঙ্গে জড়িত। তাই স্বাভাবিক কারণেই এই ফসলটির চাষের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব থাকে। কৃষক থেকে সরকার পর্যন্ত সকলেরই চেষ্টা থাকে এই ফসলটির ফলন যাতে ভাল হয়। গত বছর এ রাজ্যে আমনের ফলন খুবই ভাল হয়েছিল এবং এই ফলনের পরিমাণ এ বছরও যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

কিন্তু এ বছর আমন চাষের শুরুতেই এ রাজ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। আমন ধানের চাষ এ রাজ্যে বৃষ্টি-নির্ভর। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি, সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টির পরিমাণ এই ধানের চাষকে খুব বেশী প্রভাবিত করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে আশ্বিন মাসের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি ফসলের পরিমাণ মত হয়, তাহলে আমন ধান চাষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে কোন কোন জায়গায় জল জমে চাষের পক্ষে সমস্কার সৃষ্টি করেছে।

তবে অসময়ে অতিবৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধান চাষের জন্য যে সমস্কার সৃষ্টি হয়েছে তার উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিতে পারলে এই ক্ষতির মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। যেমন যেখানে সম্ভব সেখানে অধিক ফলনশীল স্বল্পমেরাদী জাতের চাষ করা, প্রয়োজন মত সার প্রয়োগ, ঠিকমত রোয়া করা এবং রোগপোকা দমনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া—বিশেষ করে, সারের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। কি সার কখন কতটা দিতে হবে সে সম্বন্ধে কৃষকরা যেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে। কারণ সারের ব্যবহার যদি ঠিকমত সময়ে এবং সঠিক পরিমাণে করা যায় তাহলে ভাল ফলনের আশা অনেকটাই উজ্জল হয়।

সারের ব্যবহার ছাড়া রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরের আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে এই মরশুমে রোগপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী হতে পারে। এ জন্য কৃষকদের প্রথম থেকে সাবধান হওয়া দরকার। রোগ-পোকার আক্রমণ হওয়ার আগে যদি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাহলে খরচ ও ক্ষতি দুই-এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা কৃষকরা যেন আগে থেকে নেন। উপকূলবর্তী জেলা-গুলিতে এ বছর নীচু ও মাঝারি নীচু জমিতে শ্যাওলা ও বাঁধির উপদ্রব বাড়তে পারে। সে জন্য এই সব আগাছা দমন করার জন্যও উপযুক্ত ওষুধ-ব্যবহার করতে হবে।

এ বছর অতি বৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে যে সব অঞ্চলের কৃষকরা বিশেষভাবে চাষের শুরুতেই বাধা পেয়েছেন, তাঁরা যদি প্রযুক্তিগত সুপারিশগুলি ঠিকমত কাজে লাগিয়ে চাষ করেন তাহলে তাঁরা সমস্তার মোকাবিলা করে ভাল ফলন তুলতে সক্ষম হবেন। সারা শ্রাবণ মাস ধরেই রোয়ার কাজ চলবে। আশা করি, চাষের শুরুতে যে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল তা কাটিয়ে এ বছরও এ রাজ্যের কৃষকরা ফলনের রেকর্ড করতে সমর্থ হবেন।

আমন ধানে সার প্রয়োগ

মনোরঞ্জন রায়

অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অনিয়মিত বৃষ্টি এবং জলনিকাশীর অব্যবস্থায় রাজ্যের প্রধান ফসল আমন ধানের উৎপাদন অনেক সময় ব্যাহত হয়। এইসব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ঠিকমতো কৃষি প্রকরণের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। উন্নতজাত, শস্য-রক্ষা ইত্যাদি ছাড়া সারের ভূমিকাও এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। জৈব ও রাসায়নিক, উভয় সারেরই যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে এই চাষে।

জৈব সার

প্রয়োজনমত জৈব সার অর্থাৎ গোয়াল ঘরের সার বা আবর্জনা সার প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বাড়ে। জমি কাদা করার ১০-১৫ দিন আগে জৈব সার প্রয়োগ করে মাটিতে জল ধরিয়ে দেওয়া দরকার যেন ধান রোয়ার সময় জৈব সার ভালভাবে পচে যেতে পারে। জৈব সারের যথেষ্ট সংস্থান না থাকলে যে কোন জৈব পদার্থের সংযোজন করলে উপকার হয়। সবুজ সারের চাষ যথেষ্ট উপকারী। যদি

জমিতে আগাছা থাকে তাহলে সহজ পচনশীল আগাছাগুলি চাষ দিয়ে জমিতে ভালভাবে পচিয়ে নিতে পারলে মাটিতে জৈব পদার্থের সংযোজন হয়। আগাছা পচবার সময় কিছু নাইট্রোজেন যথা—হেক্টর-পিছু ১০ কেজি (প্রায় ২২ কেজি ইউরিয়া) হারে প্রয়োগ করলে দ্রুত পচনে সাহায্য করে।

রাসায়নিক সার

খরিফ খন্ডে আমন ধানের জমিতে কাদা করা হলে মাটির ভৌতিক ও রাসায়নিক চরিত্র বদলে যায়। এই জমিতে সার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধান না হলে নানাভাবে ব্যবহৃত সারের অপচয় ঘটতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে ধান চাষে ব্যবহৃত সারের মধ্যে সাধারণতঃ ৩০-৪০ শতাংশ নাইট্রোজেন, ১০-২০ শতাংশ ফসফেট এবং ৭০-৮০ শতাংশ পটাশ ফসল নিতে অপচয় হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ব্যবহার-বিধির সাহায্যে সারের গ্রহণ-যোগ্যতা বাড়ান যায়।

* যুদ্ধ কৃষি অধিকর্তা। রসায়ন।

প. ব. কৃষি অধিকার।

বসুন্ধরা : শ্রাবণ ১৩৯১

রাসায়নিক সার অধিক কার্যকরী করতে হলে জমি উপযুক্ত পরিমাণ জৈব সার সহ-যোগে তৈরী করতে হবে। জমিতে ভাল-ভাবে আল বাঁধতে হবে এবং পুরাণ আল মেরামত করতে হবে যেন সার বহত। জলের সঙ্গে বেরিয়ে না যায়। মাটি বেশী অম্ল হলে শোধন করা, উৎপাদনের পক্ষে ভাল।

সার প্রয়োগ কার্যকরী ও লাভজনক করতে হলে সঠিক ভাবে জানতে হবে কোন্ ধরনের সার কতখানি, কখন ও কেমন করে প্রয়োগ করতে হবে।

সারের মাত্রা

প্রতি কুইন্টাল ধান উৎপাদনের জন্য ২ থেকে ২.৫ কেজি নাইট্রোজেন, ০.৫ থেকে ১.০ কেজি ফসফেট ও ২.৫ থেকে ৩.৫ কেজি পটাশ মাটি থেকে অপসারিত হয়। এই উদ্ভিদ খাদ্য ফসল অংশত মাটির খাদ্যভাণ্ডার থেকে এবং অংশত ব্যবহৃত সার থেকে সংগ্রহ করে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে উর্বরতার মান অনুযায়ী ধানের বিভিন্ন জাতের জন্য রাসায়নিক সারের প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করালে জানা যায় উর্বরতার মান কি রকম এবং সে অনুযায়ী সুপারিশ করা সার ব্যবহার করলে লাভজনক ফলন পাওয়া যায়। এ ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের গড় উর্বরতার উপর ভিত্তি করে মোটামুটি কোন্ সার কি পরিমাণ লাগবে তাও সুপারিশ করা হয়েছে।

এই সুপারিশ হোল—

(ক) দেশী উন্নত জাত :

নাইট্রোজেন হেক্টর-প্রতি ৪০ কেজি
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি
পটাশ হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি

(খ) স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল জাত
(বজা, আই. আর ৩৬ ইত্যাদি)

নাইট্রোজেন হেক্টর-প্রতি ৫০ কেজি
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ২৫ কেজি
পটাশ হেক্টর-প্রতি ২৫ কেজি

(গ) মধ্যমেয়াদী অধিক ফলনশীল জাত
(পঞ্চঙ্গ, স্বর্ণ ইত্যাদি)

নাইট্রোজেন হেক্টর-প্রতি ৬০ কেজি
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ৩০ কেজি
পটাশ হেক্টর-প্রতি ৩০ কেজি

যদি আর্থিক অসামর্থ্য বা অন্য কোন কারণে এই সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় তবে উৎপাদন কিছু কম হলেও লাভজনক সার ব্যবহারের জন্য কম মাত্রায় সার সুপারিশ করা হয়েছে। যথা—

(ক) দেশী উন্নত জাতের ধান :

নাইট্রোজেন—

হেক্টর-প্রতি ২০-৩০ কেজি
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ১০ কেজি
পটাশ হেক্টর-প্রতি ১০ কেজি

(খ) স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ও
মধ্যমেয়াদী অধিক ফলনশীল জাত :

নাইট্রোজেন হেক্টর-প্রতি ৪০ কেজি
ফসফেট হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি
পটাশ হেক্টর-প্রতি ২০ কেজি

কোন জমিতে সার ব্যবহার করলে হেক্টর-প্রতি অন্ততঃ ২০ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে। এর থেকে কম মাত্রায় নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে লাভজনক বাড়তি উৎপাদন পাবার সম্ভাবনা কম। যদি কম পরিমাণ সারের সংস্থান থাকে তাহলে কম জমিতে হেক্টর-প্রতি অন্ততঃ ২০ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে বাকী জমি সার ছাড়াই চাষ করতে হবে।

সারের ধরন

রোয়া ধানে ইউরিয়া বা অ্যামোনিয়া-ঘটিত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা উচিত। নাইট্রেট-ঘটিত সার ব্যবহার করলে অপচয়ের সম্ভাবনা বেশী। বিশেষতঃ প্রাথমিক সারে নাইট্রেট নাইট্রোজেন ব্যবহার করলে এর যৎসামান্য অংশই ফসলের কাজে লাগে। যদি নাইট্রেট জাতীয় সার ধানে প্রয়োগ করতেই হয় তবে কেবলমাত্র চাপান সার হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক সারে ব্যবহার করা মোটেই বুদ্ধিযুক্ত নয়।

রোয়া ধানের জমিতে প্রায় সব রকম ফসফেট ঘটিত সার—জলে দ্রবণীয় ফসফেট যথা—সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ট্রিপল সুপার ফসফেট বা যৌগিক সার যেমন—ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট বা সুফলা মোটামুটি সমান কার্যকর। অল্পমাটি অঞ্চলে অংশত দুই শতাংশ সাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবণীয় ফসফেট যেমন—সুফলা বা রক-

ফসফেট ব্যবহার করা যেতে পারে। রক-ফসফেট ব্যবহার করতে হলে রোয়ার একমাস আগে জৈব সার সহযোগে প্রয়োগ করা দরকার। রোয়ার সময় বা পরে যদি ফসফেট সার প্রয়োগ করতে হয় তাহলে রকফসফেট বিশেষ কার্যকরী হবে না। সে ক্ষেত্রে সুফলা বা কোনো জলে দ্রবণীয় ফসফেট ব্যবহার করতে হবে।

পটাশের জন্ম ধানে মিউরিয়েট অব পটাশ বিশেষ উপযুক্ত।

এক বা একাধিক উদ্ভিদ খাত ঘটিত সার ব্যবহার করা যেতে পারে। কেবল প্রয়োজনীয় মাত্রা অনুযায়ী সারের পরিমাণ হিসাব করে নিতে হবে।

সার প্রয়োগের সময়ঃ

নাইট্রোজেন সার মাটি থেকে জলের সঙ্গে চুঁইয়ে, গ্যাসরূপে নষ্ট হয়। সে তুলনায় ফসফেট ও পটাশের অপচয়ের সম্ভাবনা কম। সেজন্য ফসফেট ও পটাশ সারের সবটাই প্রাথমিক সার হিসাবে প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে ২৩ ভাগে ভাগ করে বারে বারে প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজন। ফসলের কয়েকটি অবস্থায় নাইট্রোজেনের চাহিদা বেশী। ঐ সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সার প্রয়োগ করে নাইট্রোজেনের যোগান দিলে নাইট্রোজেন ফসলের বেশী কাজে লাগে এবং অপচয় কম হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় নাইট্রোজেন সারের

বসুন্ধরা : শ্রাবণ ১৩৯১

এক চতুর্থাংশ এবং সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ ঘটিত সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে জমি কাদা করতে হয়।

রোয়ার ১৫-২০ দিন পর পাশকাঠি ছাড়ার সময় অর্ধেক নাইট্রোজেন প্রথম চাপান এবং খোড় আসার ঠিক আগে বাকী এক-চতুর্থাংশ নাইট্রোজেন দ্বিতীয় বা শেষ চাপান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। চারা রোয়ার কতদিন পর দ্বিতীয় চাপান দিতে হবে তা নির্ভর করে ফসলের মেয়াদ ও কত বয়সের চারা রোয়া হয়েছে তার উপর। ঠিক সময়ে রোয়া করলে স্বল্পমেয়াদী ফসলে রোয়ার ৪৫ দিন পর এবং মধ্য মেয়াদী ফসলে রোয়ার ৫৫ দিন পর দ্বিতীয় চাপান দেওয়া উচিত। দেশী উন্নত জাতে দ্বিতীয় চাপান দিতে হবে রোয়ার ৫০ দিন পর।

বেলে মাটিতে পটাশ সারের তিন-চতুর্থাংশ প্রাথমিক সারে এবং এক-চতুর্থাংশ শেষ নাইট্রোজেন চাপানের সঙ্গে প্রয়োগ করলে বেশী কার্যকর হয়।

এই বছর জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে অস্বাভাবিক বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার ফলে কোন কোন জায়গায় জল জমে গেছে। যে সব অঞ্চলে জল জমেছে সেখানে জল সরে যাওয়ার পর রোয়া করতে বেশ দেরী হয়ে যেতে পারে। কোথাও বা বীজতলা তৈরী হতে দেরী হতে পারে। যদি কোন কারণে বেশী নাবি রোয়া করতে হয় বা বেশী বয়সের চারা রোয়া করতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশ সারের সঙ্গে অর্ধেক নাইট্রোজেন

প্রাথমিক সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন খোর আসার আগে প্রয়োগ করতে হবে। যে সব জমিতে অতিরিক্ত জল জমে যাওয়ার ফলে চাপান সার দেওয়া সম্ভব হয় না বা দেশী উন্নত জাত ও মানসুরী বেশী নাবি রোয়া করা হয় সেখানে হেক্টরে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন মাত্রা অনুসারে ফসফেট ও পটাশের সঙ্গে একবারে প্রাথমিক সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

রোয়ার সময় যদি সার সংগ্রহ করা সম্ভব না হয় পাশকাঠি বেরোনের সময় প্রথম চাপানে সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাশের সঙ্গে অর্ধেক নাইট্রোজেন এবং খোড় আসার আগে দ্বিতীয় চাপানে বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন দেওয়া যেতে পারে। ফসফেট সার চাপান হিসাবে প্রয়োগ করতে হলে রোয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে জলে দ্রবণীয় ফসফেটরূপে প্রয়োগ করা উচিত। সবুজ সার চাষ করলে ফসফেট সার সবুজ সারের বীজ বোনার সময় প্রয়োগ করা উচিত।

পাশকাঠি বেরোনের শেষের দিকে নাইট্রোজেন প্রয়োগ না করাই ভাল। তাহলে নিফলা পাশকাঠির সংখ্যা বেশী হবে। এবং এতে ক্ষতিই হবে কৃষকের। দ্বিতীয় চাপানের নাইট্রোজেন ভ্রণমুকুল বেরোনের আগেই প্রয়োগ করা উচিত।

প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রাথমিক সার সমস্ত জমিতে সমান ভাবে ছড়িয়ে ভালভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে

হবে। নাইট্রোজেন ঘটিত সার মাটির ১০-১২ সে.মি. গভীরে অক্সিজেন বিহীন স্তরে প্রয়োগ করলে উপযোগিতা বাড়ে। উপরের স্তরে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করলে অপচয় বেশী হয়। এর বেশী গভীরে সার প্রয়োগ না করাই ভাল। চাপান সারও যথাসম্ভব মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ভাল কাজ করে। এর জন্য চাপান সার দেওয়ার সময় নিড়ান বা মাটি ঘেঁটে দেওয়ায় উপকার হয়।

চাপান সার দেবার সময় জমিতে বেশী জল থাকলে নাইট্রোজেন ঘটিত সার সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করলে অপচয় বেশী হয়। চাপান সার দেবার সময় নাইট্রোজেন ঘটিত সার পাঁচ থেকে দশ গুণ মাটির সঙ্গে ভাল-ভাবে মিশিয়ে দুই দিন ঘরে রেখে দিলে প্রাথমিক বিক্রিয়া হয়ে নাইট্রোজেন মাটির সঙ্গে আটকে যায়। ঐ সার মেশান মাটি ছোট ছোট বল তৈরী করে সারির মধ্যে মোটামুটি সমান দূরত্বে পা দিয়ে চেপে দেওয়া যায় বা সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করলে চাপান সারের কার্যকারিতা বাড়ে।

সার ব্যবহার অধিকতর কার্যকর ও লাভজনক করতে হলে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার—

১। জৈব সার ব্যবহারে রাসায়নিক সারের উৎকর্ষতা বাড়ে।

২। মাটিতে নাইট্রোজেন কম থাকলে প্রাথমিক সারে নাইট্রোজেনের ওপর জোর দিতে হবে।

৩। মাটিতে নাইট্রোজেন বেশী থাকলে প্রাথমিক সারে নাইট্রোজেন কম দেওয়া বা না দেওয়াই ভাল।

৪। স্বল্পমেয়াদী ফসলে প্রাথমিক সারে ও দীর্ঘমেয়াদী ফসলে চাপান সারের উপর জোর দিতে হবে।

৫। নাবিতে রোয়া করলে বা বেশী বয়সের চারা রোয়া করলে প্রাথমিক সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

৬। প্রাথমিক সারে কোন কারণে প্রয়োগ করতে না পারলে সময় মত চাপান দিয়ে সে ক্রটি কিছুটা সংশোধন করা যায়।

৭। কোন একটি চাপানে হেক্টর-প্রতি ৩০ কেজির বেশী নাইট্রোজেন ব্যবহার করা উচিত নয়।

৮। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন ব্যবহার করা উচিত নয় এবং নাইট্রোজেনের সঙ্গে ফসফেট ও পটাশ সার সুস্থম ভাবে ব্যবহার করা উচিত।

৯। চাপান সার দেবার সময় গাছের বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে চাপান দেবেন।

১০। রোগ-পোকার উপদ্রব হলে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

রাসায়নিক সার ছাড়াও ধানে নীল সবুজ শ্যাওলা বা অ্যাজোলা চাষ করলে হেক্টরে ২০-৩০ কেজি নাইট্রোজেনের সাশ্রয় হয়।

অতিরিক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধানে শস্যরক্ষা

দেবব্রত চ্যাটার্জী

খারিফ খন্ডে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসল আমন ধান। এই ধানের চাষ প্রধানতঃ বৃষ্টিনির্ভর। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ব্যাপ্তি এবং সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বৃষ্টির পরিমাণ এই ধানের চাষকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। অভিজ্ঞতা এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অতীত বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে, আষাঢ় মাস থেকে আরম্ভ করে আশ্বিন মাসের শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি সমান হারে ব্যাপ্ত হয় তাহলে আমন ধান চাষের জন্ত উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এ বছরে দেখা গেছে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ থেকে আষাঢ় মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০০ মিলিমিটার। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে

বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এবং মৌসুমী বৃষ্টিপাতের প্রায় ৫০ ভাগ। এই অসময়ের অতি বৃষ্টি আমন ধানের চাষে বিশেষ কোন উপকারে না এলেও কৃষকদের মনে অনেক আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে এবং খানিকটা বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে। এই অসময়ে অতিরিক্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমন ধান চাষের পরি-কল্পনাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে প্রযুক্তিবিদ্যার যাবতীয় সুপারিশ ঠিক মত এবং সময় মত কাজে লাগিয়ে এই চাষকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক করা যায়।

সময় মত ও সুষ্ঠুভাবে বীজতলা তৈরী যেখানে সম্ভব সেখানে অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী জাতের চাষ, প্রয়োজন মত সার প্রয়োগ, ঠিক মত রোয়া করা এবং সর্বোপরি

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (শস্য রক্ষা)
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি-অধিকার

১. রোগ ও কীটশত্রুর আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করার ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সব কিছুই সমন্বয়ের উপর এ বছরের
→ খরিফ ধানের চাষ বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

এ বছরের আবহাওয়ার বর্তমান গতি-প্রকৃতি থেকে অনেকেই আশঙ্কা করছেন যে, এই মরসুমে অস্বাভাবিক সমস্যার সঙ্গে ফসলে রোগ ও পোকাকার আবির্ভাব প্রথম থেকেই কৃষককে ব্যস্ত রাখবে। তবে প্রবাদ আছে যে, রোগ দমনের চেয়ে তার প্রতিরোধ করাই শ্রেয়।

- এই কথা মনে রেখে চাষ আরম্ভের প্রথম থেকেই শত্রুরক্ষা বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। এই বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই আসছে বীজতলা সম্বন্ধে কিছু
→ প্রয়োজনীয় কথা। আমন ধানে কীটশত্রুর

মধ্যে মাজরা পোকা, সবুজ শ্যামা পোকা, পামরী, ভেপু ইত্যাদি পোকাকার আক্রমণ বীজতলা থেকেই শুরু হতে পারে। সেই জন্তু দেখা গেছে যে, বীজতলায় প্রাথমিকভাবে ওষুধ প্রয়োগ করলে ভবিষ্যৎ চাষে অনেক সুবিধা হয় এবং খরচের দিক থেকেও অনেক সাশ্রয় হয়। পোকাকার আক্রমণ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রোগ যথা—ঝলসা রোগ, বাদামীদাগ রোগ ও খোলাপচা রোগের সূচনা হতে পারে। এই পোকা ও রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে বীজতলায় সময়মত ও সঠিকভাবে ওষুধ প্রয়োগ করলে সফল পাওয়া যাবে। নীচে দেওয়া কীট ও ছত্রাক নাশক ওষুধ ও তাদের পরিমাণ দেওয়া হল। প্রতি ১০ শতক বীজতলার জন্তু ওষুধের নাম ও মাত্রা

ওষুধের নাম

ওষুধের পরিমাণ

১। কার্বোফুরান-৩ জি (দানাদার)

২ কেজি

অথবা

ফোরোট ১০ জি (দানাদার)

৫০০ গ্রাম

২। ফস্ফামিডন

৩ মিলি প্রতি লিটার জলে

অথবা

ক্লোরোপাইরিফস্

২ মিলি " " "

ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে বীজ ফেলার ৭ থেকে ১০ দিন পরে। দানাদার ওষুধ প্রয়োগ করার সময় জমিতে ছিপছিপে জল থাকা দরকার। যেখানে দানাদার ওষুধ প্রয়োগ সম্ভব হবে না সেখানে তরল ওষুধ স্প্রে করতে হবে। সাধারণতঃ ১০ শতক

বীজতলায় স্প্রে ক'রতে ৩০ লিটারে মত জল লাগে। যেসব বীজতলায় ৭—১০ দিনের মধ্যে ওষুধ প্রয়োগ সম্ভব হয়নি সে ক্ষেত্রে চারা তোলার ৭-১০ দিন আগে অবশুই ওষুধ স্প্রে ক'রতে হবে। বীজতলায় ঝলসা ও খোলাপচা রোগ দেখা গেলে, হিনোসান ১

বসুন্ধরা : শ্রাবণ ১৩৯১

মিলি অথবা কিটাজিন ১ মিলি ও বাদামী দাগ রোগ দেখা গেলে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম, প্রতি লিটার জলে গুলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। জমি তৈরী করার সময় ভালভাবে লাঙ্গল দিয়ে আগাছা ও ধানের মুড়ী ইত্যাদি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ভালভাবে পচিয়ে ফেলা দরকার, যাতে রোগ ও পোকাকার উৎস নষ্ট হয়ে যায়। ধানের চারা রোয়ার পরে নানা রকম কীটশত্রুর অর্থাৎ বিভিন্ন রকম পোকাকার আক্রমণ হতে পারে। তাই রোয়ার পরে সপ্তাহে অন্ততঃ ২ দিন ক্ষেত ঘুরে দেখতে হবে রোগ

বা পোকা লেগেছে কিনা। আক্রমণ বেশী হলে তবেই ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। মাজরা, শ্যামা, গন্ধী ও ভেঁপু পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে সন্ধ্যার পর আলোক-ফাঁদ পেতে এদের মেরে ফেলা যেতে পারে।

পোকাকার উপদ্রব বেশী হলে উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমিতে যেখানে জলের চাপ কম সেখানে চারা রোয়ার ৩০—৩৫ দিনের মধ্যে নীচের তালিকার যে কোন একটি দানাদার কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

ওষুধের নাম	পরিমাণ (একর-প্রতি)
কার্বোফুরান ৩ জি	১২ কেজি
ফোরটে ১০ জি	৪ কেজি
কুইনালফস্ ৫ জি-	৮ কেজি
এণ্ডোসালফান ৪ জি	১০ কেজি

দানাদার ওষুধ ছড়াবার সময় জমিতে ২ই—৫ সেমি (১—২ ইঞ্চি) জল ৫—৭ দিন ধরে রাখতে হবে। যেখানে জলের চাপ

বেশী থাকায় বা চারার বয়স বেশী হওয়ায় দানাদার ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেখানে নীচের যে কোনও ওষুধ স্প্রে করুন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ	একর-প্রতি ওষুধের পরিমাণ
ফস্ফামিডন ৮৫%	৩ মিলি	১৫০ মিলি
মিথাইল প্যারাথিয়ন ৫০%	১ ”	৩০০ ”
ফেনথিয়ন ৫০%	১ ”	৩০০ ”
কুইনালফস্ ২৫%	১৩ ”	৪৫০ ”
এণ্ডোসালফান ৩৫%	১৩ ”	৪৫০ ”
বি. এইচ. সি. ৫০% জলেগোলা	৫ গ্রাম	১৩ কেজি

পামরী, চুঙ্গী, পাতামোড়া, গন্ধি, লেদা, শীষকাটা লেদা পোকা ইত্যাদির আক্রমণ দেখা গেলে একর-প্রতি ১২ কেজি হারে বি. এইচ. সি. ১০% গুঁড়ো ছড়াতে হবে অথবা প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি. এইচ. সি. ৫০% (জলে গোলা) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। লেদা ও শীষকাটা লেদা পোকাকার জন্তু এ ছাড়াও প্রতি লিটার জলে ১ মিলি ডাইক্লোরোভস ৭৬% মিশিয়ে স্প্রে

করলে সুফল পাওয়া যাবে। বাদামী শোষক পোকাকার আক্রমণ সাধারণতঃ ধানের ফুল আসার পর হয়ে থাকে। সুতরাং এই সময় থেকে ঘন ঘন ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে ও গাছের গোড়ায় দেখতে হবে পোকাকার আক্রমণ হচ্ছে কিনা। গাছে ৮-১০টির বেশী পোকা দেখা গেলে নীচে দেওয়া তালিকার যে কোন একটি ওষুধ গাছের গোড়ার দিকে বিকালে স্প্রে করুন বা গুঁড়ো ওষুধ ছড়িয়ে দিন।

ওষুধের নাম	একর-প্রতি পরিমাণ
ম্যালাথিয়ন ৫০%	২ মিলি
কারবারিল ৫% ডাস্ট	১০ কেজি
মিথাইল প্যারাথিয়ন ২% ডাস্ট	১০ ”
কুইনালফস্ ১.৫% ডাস্ট	১০ ”
বি. এইচ. সি. ১০% ডাস্ট	১২ ”
ডাইক্লোরোভস ৭৬% ই. সি	১ মিলি প্রতি লিটার জলে
মনোক্রোটোফস্ ৪০% ”	১ মিলি ” ” ”
ক্লোরপাইরিফস্ ২০% ”	২ মিলি ” ” ”
কারবারিল ৫০% (জলে গোলা)	২২ গ্রাম ” ” ”
বি. এইচ. সি. ৫০% ”	৫ গ্রাম ” ” ”

ধানে ফুল আসার পর বাদামী শোষক পোকা দমন করতে হলে কেবল কারবারিল (সেভিন) ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। দানা পুষ্ট হওয়ার পরও যদি ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে গাছের গোড়ায় একর-প্রতি ১০-১২ কেজি বি. এইচ. সি. গুঁড়ো ছড়াতে হবে।

ধানের বিশেষ বিশেষ রোগ প্রসঙ্গে

বলতে গেলে প্রথমেই ধানের ঝলসা, বাদামী দাগ, খোলাপচা ইত্যাদি রোগ ছাড়াও এ বছর টুংরো ভাইরাস রোগের প্রবণতা বাড়তে পারে। সবুজ শ্রামাপোকা এই রোগের বাহক। এই রোগের আক্রমণে গাছের বাড় বিশেষ করে বিয়ান বন্ধ হয়ে যায় ও পাশকাঠির সংখ্যা কমে যেতে পারে। গাছের পাতা কমলা হলুদ রঙের হয়ে যায়।





আক্রান্ত জমির ভেতরের দিকে অনেক জায়গায় চাকচাক হয়ে বসে যায় এবং জমি উচু নীচু দেখায়। যেহেতু সবুজ শ্যামাপোকা এই রোগের বাহক, সেইজন্য প্রথম থেকেই বীজতলায় ওষুধ প্রয়োগ সম্বন্ধে সকলকেই তৎপর হতে হবে। রোয়ার পরে এই পোকাকার সংখ্যা বাড়লে দানাদার ওষুধ বা তরল ওষুধ আগে দেওয়া সুপারিশ মত প্রয়োগ করিতে হবে। বলসা রোগের ক্ষেত্রে হিনোসান বা কিটাজিন এক মিলি অথবা জাইরাম তিন মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। যদি মাঠে খোলাপচা রোগ দেখা যায় তাহলে কারবেণ্ডাজিম এক গ্রাম অথবা হিনোসান

এক মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হতে পারে। বাদামী দাগ রোগ দেখা গেলে ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যাবে।

উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এই বছর নীচু ও মাঝারি নীচু জমিতে শ্যাওলা ও ঝাঁঝির উপদ্রব বাড়তে পারে সেই জন্য এই সব আগাছা দমন করার জন্য একরে পাঁচ-ছয় কেজি তুঁতে ভাল করে গুঁড়ো করে অথবা তিন কেজি তামাঘটিত ওষুধ সমপরিমাণ মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে ছিটিয়ে ঘেঁটে দিন। তাহলেই তো আপনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

আমন ধানের কর্মতুচী

বিমলেন্দু বিকাশ পাহাড়ী

শোন শোন চাষীভাই শোম দিয়া মন ।
উন্নত পুষ্ট বীজ ঠিক দূরত্বে করহ বপন ॥
পেরাসন, মনোসন আর এগ্রিমাইসিন ।
বীজ শোধনের সবার সেরা বেভিস্টিন বা স্টেপ্টোসাইক্লিন ॥
এন. পি. কে. সার প্রধান খাবার গাছকে দিতে হবে ।
মাটি পরীক্ষায় জানা যাবে কতটা তা দেবে ॥
আগাছা টানে খাবার, জল বাড়ায় পরিশ্রম ।
সেই টানেতে রুগ্ন হবে ফলবে অনেক কম ॥
আগাছা বীজ পাকার আগে দমন করা চাই ।
তা না হলে সাত বছরের শ্রম যে পাবে ভাই ॥
বাদামী শোষক, শ্যামা, গন্ধি আর ভেপু পোকা ।
মাজরা, পামরী সবাই বলে আমরা ধানের পোকা ॥
কার্বাক্সুরান, মেলাথিয়ান, পেরাথিয়ান বা স্প্রিমিথিয়ান ।
কৃষি বিভাগীর পরামর্শে আছেই অনেক সাজেশান ॥
ঝলসা, ধসা, টুংরো এসব কত কি যে ব্যারাম ।
এদের দমন না করলে হবে তুমি হয়রান ॥
কুমান-এল, হিনোসান বা ব্যাভিস্টিন যার কথাই বল ।
আগে ওষুধের সীল আছে নাকি সেইটি দেখা ভাল ॥
সঠিক পোকা, সঠিক রোগ দমন যদি চাও ।
মাঝে মাঝে কৃষিবিদের কাছে নমুনা নিয়ে যাও ॥
ঝামেলা কমবে, বাড়বে ফলন, দুঃখ যাবে সরে ।
চাষী ভাইদের মুখটি চেয়ে দেশ নির্ভর করে ॥

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক

চণ্ডীতলা ২নং ব্লক

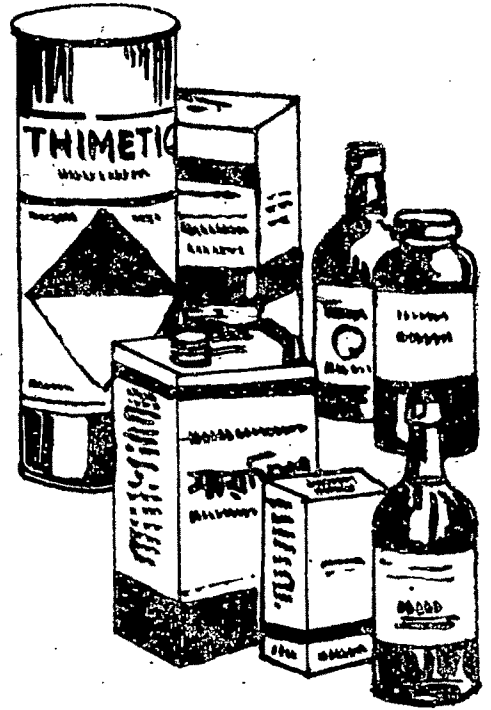
হুগলী

রোগ দমনে সংবাহী রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার

ডঃ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

রোগ এবং পোকাকার আক্রমণের পদ্ধতি ও ক্ষতি সাধনের বিষয়ে কিছুটা মৌলিক পার্থক্য আছে। গাছের মধ্যে রোগের জীবাণু প্রবেশ করে রোগের সূচনা করলে কোন ব্যবস্থাই কার্যকরী হয় না। যদি আক্রান্ত গাছের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে তবে আক্রমণ প্রতিহত হয়। তা না হলে ক্ষতির ব্যাপকতা বা পরিমাণ সাধারণতঃ কোনও রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। রোগের এই গতি বা কার্যক্রম ফলের গাছ বা বড় বড় গাছের ক্ষেত্রে সমস্তার সৃষ্টি করে, কেননা এরা দীর্ঘজীবী। আক্রমণের ফলে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলে। এই সমস্তা বৈজ্ঞানিকদের শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণই করে নি, নতুন চিন্তাধারায় এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আক্রান্ত গাছে রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগের ফলে সেই ওষুধ গাছের মধ্যে ঢুকে রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়াম বা ভাইরাসকে নষ্ট করতে সক্ষম হবে এবং রোগের লক্ষণ বা তার দরুণ ক্ষতির পরিমাণ কমাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরীক্ষামূলক কাজ হয়। এই রাসায়নিক ওষুধ সংবাহী



হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ গাছের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারবে এবং এর বিষক্রিয়া গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না। কিন্তু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে নষ্ট করতে পারবে। বিদেশে মেপল (Maple) গাছের রস নির্গমন রোগ (Bleeding disease) ডাই-আম্যাইনো বেনজিডিন হাইড্রোক্লোরাইড (Diamino benzidine hydrochloride), অক্সিন (Oxine) বা এদের থেকে উদ্ভূত রাসায়নিক দ্রব্যের মাধ্যমে দমন করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। গেমের মরিচা রোগের (Rust) আক্রমণে, ক্যালসিয়াম সালফামেট (Calcium Sulphamate) প্রয়োগে বা বিলাতী বেগুনের ঢলে পড়া রোগে ফেনোক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Phenoxy acetic acid) জাতীয় হরমোন ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু এইসব পরীক্ষা গবেষণা-ক্ষেত্রেই মূলতঃ সীমাবদ্ধ ছিল মাঠে ব্যাপক-প্রয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হয় নি।

পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক্সের (antibiotics) আবিষ্কার এবং মানুষ ও পশুর রোগ দমনে সার্থক ব্যবহার উদ্ভিদ রোগ তত্ত্ববিদদের অনুপ্রাণিত করে। তাঁরা অ্যান্টিবায়োটিক্সের সাহায্যে গাছের রোগ দমনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখেন। পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরই ব্রাউন এবং বয়েল (Brown and Boyle.) পেনিসিলিন প্রয়োগে ক্রাউন গল (Crown gall) নামে একটি ব্যাকটেরিয়ামজনিত গাছের রোগ দমনে সফল হন। এর পরই ১৯৪৬ সালে

ব্রায়ান ও হেমিং (Brian and Hemming) গ্লায়োটক্সিন (Gliotoxin) নামে অ্যান্টি-বায়োটিক প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়ার দরুণ বীজ-বাহিত রোগ প্রশমনে সমর্থ হন।

এই ভাবে ধীরে ধীরে গাছের রোগ দমনে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার শুরু হয়। অ্যান্টিবায়োটিক সংবাহী (Systemic) অর্থাৎ গাছের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ে যদিও গাছের উপরে স্প্রে করে প্রয়োগ করা হয়। খুবই অল্পমাত্রায় গাছের মধ্যে রোগের জীবাণু বা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়াম দমনে সমর্থ হয় এবং প্রতি-রোধক হিসাবে কিছুদিন সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণতঃ স্প্রে করার মাধ্যমেই প্রয়োগ করা হয়। তবে রোয়া বা বোনার জন্য ব্যবহৃত বীজ, কাটিং বা বাব্ব, অ্যান্টিবায়োটিক দ্রবণে অল্প সময়ের মধ্যে ভিজিয়ে রেখে শোধন করে রোগমুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ জমিতে প্রয়োগ করে রোগ দমন করা সম্ভব নয়। কেননা জমিতে প্রয়োগের পর এর কার্য-কারিতা অল্প সময়ের মধ্যে নানাভাবে নষ্ট হয়। অ্যান্টিবায়োটিক অনেক ক্ষেত্রে গাছের ক্ষতিও করতে পারে। প্রয়োগ ঠিকমত না হলে বা বেশী মাত্রায় প্রয়োগ হলে গাছের ক্ষতি করতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে গাছের সবুজ কণা নষ্ট হয় এবং গাছের পাতা বা অগ্ন সবুজ অংশ হলুদেটে হয়ে যায়। এজন্য অনেক অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় নি।

বসুন্ধরা : শ্রাবণ ১৩৯১

যদিও আনুমানিক ৩৪০টি অ্যান্টিবায়োটিকের রোগ দমনের ক্ষমতা দেখা গেছে কিন্তু এদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই ব্যবহার হয়ে থাকে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

(১) স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycin)

বাজারে সাধারণতঃ অক্সিট্রেট্রোসাইক্লিন (Oxytetracycline) নামে আর একটি অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে মিলিয়ে অ্যাগ্রিমাইসিন (Agrimycin), পৌষামাইসিন (Poushamycin), প্লান্টামাইসিন (Plantamycin) প্রভৃতি নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিক্রি করেন। ব্যাকটেরিয়ার দ্রুত ধ্বংসের বালসা রোগ (Bacterial blight of rice) দমনে এর ব্যবহার সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া আরও কিছু ব্যাকটেরিয়া-জনিত রোগ যথা লঙ্কার পাতায় দাগ ধরা, বিভিন্ন ফলের গাছ যথা আপেল বা নাস-পাতির বালসা, তামাকের পাতা বালসা প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করা হয়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন সালফেট বা হাইড্রোক্লোরাইড হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রকৃতিতে সংবাহী, একমাত্র ব্যাকটেরিয়া-জনিত রোগের দমনের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়, রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের ওপর এর কোনও ক্রিয়া নেই। বেশী মাত্রায় বা প্রয়োগ ঘন ঘন করলে গাছের ক্ষতি হয়। সেজন্য ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সীমিত।

ডি.ডি.টি, প্যারাথায়ন, তামাঘটিত ছত্রাক নাশকারী ওষুধ। জিনেব গন্ধকএর সংমিশ্রণে

প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু বি. এইচ. সি-র সঙ্গে মিশ্রণে এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

(২) অক্সিট্রেট্রোসাইক্লিন (Oxytetracycline)

বাজারে মানুষ ও গৃহপালিত পশুর চিকিৎসার জন্য টেরামাইসিন, হস্টোসাইক্লিন, স্ট্রাণ্ডোসাইক্লিন প্রভৃতি যে ধরনের ওষুধ ব্যবহার হয়, গাছের এক ধরনের রোগের প্রতিকারের পক্ষেও তা কার্যকরী। কুটে জাতীয় রোগের মত 'মাইকোপ্লাসমা' (mycoplasma) রোগ যথা বেগুনের তুলসী লাগা (Little leaf of brinjal), তিলের ফুল পাতায় রূপান্তরিত হওয়া (Sesamum phyllody), কমলালেবুর পাতার সবুজ ভাব (Citrus greening), আখে ঘাসের মত পাশকাঠি বার হওয়া (grassy shoot of sugarcane) ইত্যাদি ক্ষেত্রে অক্সিট্রেট্রোসাইক্লিন প্রয়োগ বিশেষ কার্যকরী।

একমাত্র স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে ব্যবহার ছাড়া অন্য রোগে এর উপকারিতা দেখা যায়নি।

(৩) সাইক্লোহেক্সামাইড বা অ্যাক্টিডিয়োন (Cycloheximide or Actidione)

স্ট্রেপ্টোমাইসিস গ্রিসিয়াস (Streptomyces griseus) নামে ছত্রাক থেকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন পাওয়া যায়। এছাড়া সাইক্লোহেক্সামাইডও পাওয়া যায়। স্ট্রেপ্টোমাইসিন ওষুধ তৈরী

করার প্রক্রিয়ার মধ্যে এই ওষুধটি গৌণ ভূমিকা হিসাবে তৈরী হয়। যেমন স্ট্রেপ্টোমাইসিন ব্যাকটেরিয়ামজনিত রোগে কার্যকরী, সাইক্লো-হেক্সামাইড ছত্রাকজনিত রোগ দমন করতে সক্ষম, কিন্তু ব্যাকটেরিয়ামজনিত রোগ দমনে কোনও কার্যকারিতা নেই। এটি সংবাহী, গাছের শরীরের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে শিকড়ের মাধ্যমে অতি সহজেই গাছের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং গাছের কোষ এবং কোষ মধ্যস্থিত রসের ছত্রাকের উপর তীব্র বিষক্রিয়া থাকে ফলে আক্রমণকারী ছত্রাক বিনষ্ট হয় এবং প্রায় পাঁচ সপ্তাহ কাল পর্যন্ত রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা থাকে। যদিও বহু ছত্রাকজনিত রোগে এমন কি গমের মরিচা রোগে শুধু রোগ প্রতিরোধক নয়, রোগ প্রতিষেধক হিসাবে ক্ষমতা থাকলেও এর ব্যবহার প্রসার লাভ করতে পারে নি। প্রথমতঃ এর অতিরিক্ত দামের জ্ঞান এবং যে মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত এবং যে মাত্রায় প্রয়োগ করলে গাছের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, এই দুই-এর মধ্যে পরিমাণের বা মাত্রার তফাৎ সামান্য। সেজন্য প্রয়োগের বা মাত্রার হেরফের হলে গাছের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী থাকে।

(৪) গ্রিসিয়ো ফুলভিন (Griseo fulvin)

পেনিসিলিয়াম গ্রিসিওফুলভাম এবং এর নিকট সম্পর্কীয় পেনিসিলিয়াম, (Penicillium Griseofulvum and related Penicillium Spp.) ছত্রাক হ'তে উৎপন্ন হয়।

এই ওষুধ গাছের মধ্যে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু খাঁটি ছত্রাক বিনাশকারী ওষুধের যে ক্রিয়া দেখা যায় এক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা পুরোপুরি নেই। গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, তবে গাছের শরীরে এবং মাটিতে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় বলে কার্যকারিতা বেশী দিন থাকে না। সেজন্য উদ্ভিদের রোগ দমনে বিশেষ স্থান লাভ করতে পারে নি বা গ্রহণযোগ্য হয় নি।

(৫) অরিওফান্গিন (Aureofungin)

ভারত সরকারের সংস্থা হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক্স (Hindusthan Antibiotics) প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরী থেকে আবিষ্কৃত হয় ১৯৬৪ সালে। এটি জলে সহজে দ্রবণীয় নয়, কিন্তু ক্ষার দ্রবণে সহজে মিশ্রিত হয়, সেজন্য সাবান জলে এই ওষুধের দ্রবণ প্রস্তুত করা সম্ভব (১০ লিটার জলে ১ গ্রাম ওষুধ)। ছত্রাকজনিত অনেক রোগ দমনে বিশেষ কার্যকরী বলা হয়। ধানের বাদামী রোগ ও বলসা (Helminthosporium, blast) রোগে বীজবাহিত জীবাণু দূর করার জ্ঞান বীজ শোধনের সুপারিশ করা হয়। কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য থাকলেও এই অ্যান্টিবায়োটিক প্রসার লাভ করতে পারে নি এবং ব্যবহার খুবই সীমিত।

অ্যান্টিবায়োটিকের সংবাহী ও কার্যকরী ওষুধ হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আশা-নুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি বা কৃষকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। কিন্তু

জাপানে ধানের বাল্‌সা (blast) রোগে এই জাতীয় ওষুধের ব্যবহার ব্যাপক। এর মধ্যে ব্লাস্টিসিডিন-এস (Blasticidin S) এবং কাসুগামাইসিন (Kasugamycin)-এর প্রয়োগ ব্যাপক আকারে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অল্প ধরনের সংবাহী ওষুধ পাওয়া যাওয়ায় এদের ব্যবহার খুবই সীমিত হয়েছে।

(৬) ব্লাস্টিসিডিন-এস (Blasticidin S)

স্ট্রেপ্টোমাইসিন গ্রীসিয়োক্রোমোজেনেস (Streptomyces Griseochromogenes) নামে ব্যাকটেরিয়াম-এর প্রস্তুতকারক। অনেক ব্যাকটেরিয়া ও ধানের বাল্‌সা রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক পাইরিকিউলেরিয়া অরাইজির (Pyricularia oryzae) উপর বিশেষ কার্যকরী। রোগের সূচনার পরও প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়। ধানের গাছের উপর প্রয়োগ করলে সামান্য কিছুটা ক্ষতি হতে পারে। সাধারণতঃ জলে গোলা পাউডার হিসাবে ১ লিটার জলে ৫০—১০০ গ্রাম পরিমাণে ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়। জীবজন্তু ও মানুষের শরীরের উপর বিষক্রিয়ার তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়।

(৭) কাসুগামাইসিন (Kasugamycin)

স্ট্রেপ্টোমাইসিস কাসুগামাইনসিন (Stre-

ptomyces Kasugaensis) নামে ব্যাকটেরিয়াম থেকে উদ্ভূত। ধানের বাল্‌সা রোগ সৃষ্টিকারী পাইরিকিউলারিয়া (Pyricularia) ও সিউডোমোনাস (Pseudomonas) জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার উপর বিশেষ কার্যকরী। রোগের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর রোগের জীবাণু দূর করতে বিশেষ কার্যকরী। গাছের শরীরের মধ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কার্যকারিতা নজরে আসে না। ধান গাছ বা জীবজন্তুর শরীরের উপর ওষুধের বিষক্রিয়ার তীব্রতা দেখা যায় না। সাধারণতঃ গাছের উপর স্প্রে করে প্রয়োগ করলে দ্রুত উপকার পাওয়া যায়। ১ লিটার জলে ২০—৩০ গ্রাম পরিমাণ ওষুধ যথেষ্ট। এই ওষুধের কার্যকারিতা বা প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনাশ করা সম্ভব হয়েছে কিছু পরিমাণ ব্লাস্ট ছত্রাকের মধ্যে। সেজন্য প্রয়োগ করেও অনেক ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া যায় না।

অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় এবং কীট দমনে সংবাহী কীটনাশক ওষুধের সার্থক কার্যকারিতা বৈজ্ঞানিকদের সংবাহী রোগ বা রোগসৃষ্টিকারী ছত্রাকনাশক ওষুধ আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে সার্থক হয়েছে তার প্রমাণ আমরা পাই তাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ বা ব্যবহারে।

আমনে সময়মত চাপান সার দিয়ে ফলন বাড়ান

আমন ধানের ফলন বাড়ানোর জন্য সঠিক সময়ে ও পরিমাণে নিম্নলিখিতভাবে চাপান সার প্রয়োগ করুন।

- চারা রোয়ার ১৫ দিন পরে জলদি জাতে একরে ১০ কেজি ও মাঝারি জাতে ১২ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে দিন। এরপর জলদি জাতে রোয়ার ৩০-৪০ দিন পরে ৫ কেজি, মাঝারি জাতে ৪০-৪৫ দিন পর ৬ কেজি নাইট্রোজেন প্রতি একরে দ্বিতীয় চাপান সার হিসাবে দিন। এছাড়া মাঝারি নাবি ও নাবি জাতে ৫৫-৬০ দিন পর ১২ কেজি ও দেশী উন্নত জাতে খোড় আসার সময় ৮ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে দিন।
- জমি কাদা কাদা রয়েছে অথচ জল জমে নেই এরকম অবস্থায় চাপান সার দিয়ে মাটি ঘেঁটে দিন, ২৪-৪৮ ঘণ্টা পরে আবার সেচ দিন।
- জল বের করা সম্ভব না হ'লে চাপান দেবার ২ দিন আগে ইউরিয়া সার ৫-১০ গুণ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ২ দিন জারিয়ে নিন। পরে সেই সার মেশানো মাটি দিয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করে প্রতি ৪টি ধানের গোছের মাঝে (৪"-৬") দূরে দূরে একটি করে বল ফেলে পা দিয়ে চাপ দিন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০৭১

জবাফুলের চাষ

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীশ্রীকালীপূজার শ্রেষ্ঠ উপচার রক্ত রাঙা জবাফুল। মুণ্ডমালিনী, করালবদনা, মসীকৃষ্ণা, ভয়ঙ্করী দেবীর সঙ্গে জবাফুলটি যেন একাত্ম হয়ে গেছে। ভক্তি এবং খানিকটা বোধ হয় ভয়েই জবার রক্তবর্ণ ভক্তদের আকর্ষণ করেছে এই রক্তবীজ বিনাশিনী দেবীপূজায় অর্ঘ্য দেওয়ার জন্তে। কবি সত্যেন দত্ত তো স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন জবার জবানীতে :

আমারে লইয়া খুশী হও ওগো !

নম দেবী নম,

ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ

ধরার শিশুরে ক্ষম।

জবাফুলের সার্থকতা দেবীপূজায়। কিন্তু ইদানীং নানা বর্ণের, নানা আকারের জবার উদ্ভাবন হওয়ায় চণ্ডীমণ্ডপ ও ঠাকুরদালান থেকে উঠে এসে জবা আসন নিয়েছে সৌখীন ড্রাইরুমেও। হলুদ, গোলাপী, কমলা, বেগুনী, সোনালী, গেরুয়া, সাদা এমন কি নীলাভ রঙের জবাও আজকাল

বিরলদর্শন নয়। ফুলের আকার ও আকৃতিতে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে। ৫ সেঃমিঃ ব্যাসের ছোট ফুল থেকে ১২-১৩ সেঃমিঃ ব্যাসের বিরাট ফুলও চোখে পড়বে। জবা গাছের পাতাতেও বৈচিত্র্য এসেছে। বহুবর্ণের পাতার বাহার আছে ভ্যারিয়েগেটাস জাতের জবাতে।

শুধু ফুলই কাটফ্লাওয়ার হিসাবে ড্রাইরুমে আসেনি, জবার টবও আজকাল ড্রাইরুমের কাছাকাছি পৌছে গেছে। কয়েকটি জাতের জবাগাছ খুব বেশী বড় হয় না। এগুলি টবের জবা হিসাবে বেশ জনপ্রিয়।

পূজা এবং পুষ্পসজ্জা ছাড়াও জবার ব্যবহার আছে ভেষজ হিসাবে। সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য তাঁর ‘চিরঞ্জীব বনৌষধি’ গ্রন্থে (৩য় খণ্ডে) জবার ভেষজগুণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে ‘জবাফুল স্নিগ্ধ ও শীতল। তাই ফুলের পাপড়ির কাথ জ্বর,

কাস ও বস্তুপ্রদাহে ব্যবহৃত হয়। পাপড়ির বাটা বা সিরাপ স্নিগ্ধশীতল পানীয়রূপে মূত্র-যন্ত্রের প্রদাহে ব্যবহৃত হয়। তিনি আরও বলেছেন যে ‘সমপরিমাণ জলপাইএর তেলের সঙ্গে পাপড়ির রস পাক করে সেই তেল অকালপক্ চুল কালো করার জন্যে ব্যবহার করা হয়’।

জবাকে চীন দেশের ফুল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এই অনুমান বোধহয় পুরোপুরি সত্য নয়। যদি সত্য হত তাহলে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত আমাদের সূর্য-প্রণামের মন্ত্রে “জবাকুশুম সংকাশং কাশুপেয়ং মহাছাতিং”-এর উল্লেখ থাকত না। তবে পঞ্চমুখী জবার (*Hibiscus rosa sinensis* var *floro-teano*) আদি নিবাস হয়ত চীন দেশে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি

জবা Malvaceae পরিবারের *Hibiscus* গণের অন্তর্ভুক্ত বহুবর্ষজীবী গুল্ম। এর পাতা একান্তর (alternate), একক, মুক্ত-পার্শ্বীয়, পাতার আকার ডিমের আকার (ovate), পাতার কিনারা করাতের দাঁতের মত কাটা। জবার পুষ্পবিজ্ঞাস অনিয়ত, বৃত্তাংশ পাঁচটি, যুক্ত এবং উপবৃতি দ্বারা বেষ্টিত। পাপড়ি পাঁচটি, পরস্পর পৃথক। ডবল জবার ক্ষেত্রে এই পাঁচটি পাপড়ির কয়েকটি থাক থাকে। মূলতঃ ফুলের পুংকেশরগুলি পাপড়িতে পরিণত হয়ে এই থাকের সৃষ্টি করে।

জবার আর একটি প্রজাতি *Hibiscus schizopetalous* আমাদের দেশে ‘ঝুমকো-

জবা’ নামে পরিচিত। ঝুমকো জবার ফুল নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। এর পাপড়ি ফুলের পিছনের দিকে খানিকটা বাঁকানো গ্রামোফোনের চোঙের মত। ফুলের গর্ভ-দণ্ডটি বেশ লম্বা এবং প্রথমেই নজরে পড়ে।

আর একটি ফুলের সঙ্গে জবা নামটি যুক্ত আছে, সেটি লম্বা জবা। আঙ্গুলের মত সরু সরু লাল টুকটুকে ফুল হয় এবং গোলাপী রঙের ফুলও হয়। এর পাপড়ি পুরো খোলে না বলে লম্বা দেখায়।

আর এক জাতের জবা আছে যাদের পাতা কতকটা ত্রিভুজ আকৃতির, আকারেও অল্প জবার পাতা থেকে ছোট। এদের ফুল ছোট কিন্তু রঙের বৈচিত্র্য আছে। এদের বৈজ্ঞানিক নাম *Hibiscus syriacus*।

আর এক জাতের জবা আছে যার পাতা ছোট, ফুলও ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে। এদের ফুলের রঙ হয় লাল।

চাষ

জমি : পশ্চিমবাংলার সমতলভূমিতে সর্বত্র জবার চাষ করা যায়। যদিও সব রকম মাটিতেই জবার চাষ করা যায়, তবে জল-নিকাশের সুবিধা আছে এমন দোআঁশ মাটিই জবার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

জবা গাছ লাগাতে হবে এমন জায়গায় যেখানে বর্ষায় জল জমে না এবং সারা দিন রোদ পায়।

জমি তৈরী করা : গাছ লাগাবার অন্ততঃ এক সপ্তাহ আগে মাটিতে গর্ত করে রোদ খাইয়ে নিতে হবে। এই সময়ে একটু

বসুন্ধরা : শ্রাবণ ১৩৯১

গ্যাম্বলিন পাউডার গর্তে ছিটিয়ে দেওয়া ভাল। এই গর্ত তৈরী করতে হবে ৫০—৬০ সে: মি: গভীর করে, গর্তের চওড়াও হবে ৫০—৬০ সে: মি:। এই গর্তের সারমাটি তৈরী করতে হবে ৩ ভাগ সাধারণ দোআঁশ মাটি, ১ ভাগ গোবর সার, ১ ভাগ পাতাপচা সার ও ৪ মুঠো বোনমিল মিশিয়ে। এই সারমাটি ভালভাবে মিশিয়ে একটু জল ছিটা দিয়ে মেখে কয়েক দিন চাপা দিয়ে রেখে তার পর খুলে রোদে শুকিয়ে নিয়ে গর্তে ভরা হলে ভাল হয়।

টবের মাটি : ছোট জাতের জবা টবে লাগালে ৩০ সে: মি: বা তার বেশী মাপের টব নিতে হবে। সিমেন্টের টব বানিয়ে নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। তাতে শিকড়ের চাপে ভবিষ্যতে টব ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে না। অবশ্য সিমেন্ট তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় বলে গরমের দিনে রোদের তাতে শিকড়ের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

টবের সারমাটি তৈরী করা যাবে ২ ভাগ বাগানের সাধারণ দোআঁশ মাটি, ১ ভাগ গোবর সার ও ১ ভাগ পাতাপচা সার মিশিয়ে। এর সঙ্গে ১ মুঠো বোনমিল মিশিয়ে দিতে হবে। টবে কয়েক বছর গাছ রাখতে হলে বছরে অন্ততঃ একবার উপরের মাটি যথাসম্ভব ফেলে দিয়ে নতুন করে সারমাটি ভরে দিতে হবে।

গাছ লাগানো : জবা গাছের বংশ বিস্তার করা যায় কাটিং এবং কলম থেকে। কাটিংএর চেয়ে কলমের গাছই ভাল হয়।

বেশীর ভাগ জবার ক্ষেত্রে গুলকলম করা হয়ে থাকে। তবে অনেক ভাল জাতের জবা আছে যাদের ক্ষেত্রে জোড়কলম বা বাডিংএর প্রয়োজন হয়।

চারা গাছ বসানোর সময় মাটি খুব শুকনো বা খুব ভিজ়ে থাকবে না। গর্তের ঠিক মধ্যে চারাগাছের শিকড়ের মাটির বলের আন্দাজে মাটি খুঁড়ে নিয়ে গাছটিকে সাবধানে বসাতে হবে। এর পর গর্তের চারিদিক থেকে মাটি টেনে নিয়ে শিকড়ের চারপাশ ভরিয়ে দিয়ে আশ্বে আশ্বে চেপে দিতে হবে। জোড় কলম লাগালে জোড়ের অর্ধেকটা মাটির মধ্যে বসাতে হবে। চারা-গাছ লাগাবার পর মাটি ভাসিয়ে জল দিতে হবে।

বর্ষার ঠিক আগে জবাগাছ লাগানো উচিত।

পরবর্তী পরিচর্যা

জলসেচ ও নিড়ানি : চারাগাছ মাটিতে ভাল করে লেগে যাওয়ার পর সপ্তাহে অন্ততঃ একবার খুব ভাল করে জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে মাটির অবস্থা ও আবহাওয়ার শুষ্কতা অনুসারে সপ্তাহে দুবার জল দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। শীতকালেও সেই একই কথা খাটে। স্বাভাবিক বর্ষায় জবাগাছে জল দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

গাছের গোড়ায় যাতে ঘাস না জন্মায় তার জন্য মাঝে মাঝে নিড়ানি করতে হবে। এতে মাটিও একটু আলগা হবে। মাসে

২—৩ বার নিড়ানি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। প্রতিবার জলসেচের পর মাটি শুখিয়ে এলে নিড়ানি অবশ্যই দিতে হবে।

সার : জবাফুলের প্রাচুর্য গ্রীষ্মে ও বর্ষায়। এই ফুল আসার আগে কিছু বাড়তি সার দিতে হবে। এ্যামোনিয়াম সালফেট, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং সালফেট অফ পটাসের মিশ্রণ ১ : ৩ : ২ অনুপাতে তৈরী করে এই মিশ্রণের ১০০ গ্রাম ফুল আসার আগে মাসে দুবার দেওয়া চলবে। টবের ক্ষেত্রে এই সারের মাত্রা হবে চা চামচের ২ চামচ। কুঁড়ি দেখা দিলে সপ্তাহে একবার তরল জৈবিক সার ব্যবহার করা ভাল। কিন্তু কুঁড়িতে রঙ আসামাত্র সর্বকম সার প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে।

টবের গাছ যেহেতু জমির স্বাভাবিক অবস্থা পায় না সেজন্তে টবের গাছে বাড়তি অণুখাত্তের যোগান দেওয়া ভাল। প্রতি টবের সারমাটির সঙ্গে Sequestreone Plus এক চা চামচ করে মিশিয়ে দিলে এই অণুখাত্তের অভাব মিটবে। Sequestreone Plus-এ থাকে লোহা, ম্যাগনেসিয়াম ও বোরোনযুক্ত লবণ।

গাছের ডাল ছাঁটা : ফুল শেষ হয়ে যাওয়ার পর গাছ হালকা করে ছেঁটে দিতে হবে। ডাল ছাঁটার সময় নজর রাখতে হবে যে ডাল যেখানে কাটা হবে তার ঠিক নিচে যেন মুকুল থাকে। কারণ এই মুকুল থেকেই আবার নতুন ডাল গজাবে। ডাল ছাঁটার জন্তে Secateur বা

কলম কাটা ছুরি ব্যবহার করা ভাল। কাটারী দিয়ে কাটলে ডাল খেঁতলে যেতে পারে অথবা ফেটে যেতে পারে। ডাল ছাঁটার পর কাটা জায়গাটির উপরে একটু আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া ভাল। এতে এই কাটা জায়গা দিয়ে পোকাকার আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না। জবা গাছের শুকনো ডালও এই সময়ে ছেঁটে দিতে হয়।

গাছ ছাঁটাই-এর পর গাছের গোড়া খুঁড়ে ৩-৪ দিন রোদ হাওয়া লাগিয়ে নিতে হয়। এর পর সারমাটি ভরে দিতে হয়। জমি তৈরী করার সময় যেভাবে সারমাটি তৈরী করা হয় সেইভাবে তৈরী করতে হবে। এই সারমাটির সঙ্গে গাছের বয়স ও উচ্চতা অনুসারে ১ থেকে ২ চা চামচ কলিচুন মিশিয়ে নিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা : কখনও কখনও

জবাগাছের কুঁড়ি আধফোটা অবস্থায় ধরে যেতে দেখা যায়। যদি এর অত্ কখন কারণ, যেমন জলের টান, সারের অভাব বা রোগ-পোকা না থাকে তাহলে পাতায় হরমোন স্প্রে করে উপকার পাওয়া যায়। ‘প্লানোফিক্স’ এ ধরনের এক হরমোন।

জবার রোগ ও কীটশত্রু

জবা গাছে ছত্রাক রোগ, মিলডিউ, কখনও কখনও দেখা যায়। পাতায় এর আক্রমণ হয়, পাতার উপরে সাদাটে দাগ দেখা দেয় এবং ক্রমশঃ পাতা পচতে আরম্ভ

বসুন্ধরা : শ্রাবণ ১৩৯১

করে। ডাইথেন জেড বা এর বিকল্প ওষুধ ব্যবহারে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

জবার কীটনাশকের মধ্যে উই পোকা, ষ্টেম বোরার এবং লাল মাকড়সা অত্যন্তম।

উই পোকা গাছের শিকড় এবং গোড়ায় লাগে। BHC (১০%) পাউডার ছিটিয়ে উই পোকা ধ্বংস করা যায়।

ষ্টেম বোরার বর্ষার সময় গাছের কচি ডাল ফুটো করে দেয়। থায়োডান ৩৫ ই.সি. অথবা এর বিকল্প কীটনাশক ওষুধ স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।

লাল মাকড়সা পাতার নিচে থাকে। পাতার রস চুষে চুষে এরা পাতাকে কুঁকড়িয়ে ফেলে। একভাগ গন্ধকচূর্ণ তিন ভাগ কলিচুনের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের পাতায় ডাষ্টার মেশিন দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। ছেটাবার আগে পাতায় জল স্প্রে করে দিতে হয় যাতে গন্ধকচূর্ণ ও কলিচুনের মিশ্রণ পাতায় আটকে থাকে। এতে লাল মাকড়সা দমন করা যাবে।

জবার কয়েকটি ভাল জাত

সিঙ্গল : ক্রমওয়েল (সাদা, মধ্যে বাদামী ছোপ), এ্যাগনেস (ফিকে গোলাপী), ভাইসরয় (লাল), হাওয়াইয়ান হোয়াইট (সাদা), এককুইজিট (গোলাপী), মাই বিউটি

(গেরুয়া), নেতাজী হোয়াইট (সাদা, ঠিক মাঝে লাল), জুপিটার ব্লু (নীলাভ), লক্ষ্মী (হলুদ), নিউ অরেঞ্জ (কমলা রঙের মধ্যে লালের ছিটে), শ্রীরাধা (দুধে আলতা), পার্সি ল্যান্ডাষ্টার হাইব্রীড (উজ্জল হলুদ), কোরাল ষ্টার (ঘোর লাল), লিপ ষ্টিক (লাল), মিটিয়োর (গন্ধক হলুদ, মধ্যে লালের ছোপ ঘিরে সাদা দাগ), ডিপ রোজ সৌন্দর্য (হালকা গোলাপী)।

সেমিডবল : পঞ্চমুখী (লাল), শ্রীলঙ্কা (গোলাপীর সঙ্গে হালকা হলুদ আভা), লুটিয়োলেনাস (ঘিয়ে)।

ডবল : ড্যাফোডিল (হলুদ), অরোরা (গোলাপী), জুনো (খয়েরী), ব্ল্যাক প্রিন্স (কালচে লাল), মে ওয়াকার (বেদানা রঙ), গোল্ডেন গ্রীম (সোনালী), আলিপুর বিউটি (লাল), মহাত্মা (কমলা, মধ্যে লাল), ট্রিপল জেম (গাঢ় গোলাপী), অটম টর্নিস (কমলা), ক্রয়েটাস্ (সিঁহুরে), ক্যালেরী (হালকা হলুদ), মদন মোহন (কমলার উপর গোলাপী আভা)।

টবেরজন্যে : জুনো (খয়েরী), স্মাইট হার্ট (সাদা, মধ্যে লাল), হাওয়াইয়ান হোয়াইট (সাদা), ড্যাফোডিল (হলুদ), স্নো ফ্লেক (পাতা বহু বর্ণের, ফুল লাল), অ্যালবো ভ্যারিয়েগাটা (পাতা বহুবর্ণের, ফুল লাল সাদা)

সাইপ্রাসে কৃষি

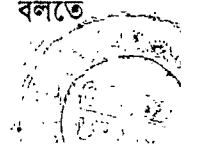
ডঃ শক্তিপদ সরকার

ভূমধ্যসাগরে ছোট দ্বীপ সাইপ্রাস। উত্তরে ইউরোপ আর পূবে আরব দুনিয়া। তিনহাজার বর্গমাইল আয়তনের এই ছোট দেশে জলবায়ু সত্যিই মনোরম। গ্রীষ্মকালে গরম যেমন অসহনীয় নয় তেমনি শীতকালে শীতও ইউরোপের মত মানুষের শরীরের মধ্যে ঢুকে হাড় কাঁপায় না। এই সূর্যাস্নাত ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর দেশে এসে বসতি স্থাপন ও রাজত্ব করার জন্ত যুগ যুগ ধরে অল্প দেশের লোক এই ছোট দ্বীপদেশকে আক্রমণ করেছে। এখানে রাজত্ব করেছে রোমানরা, ভেনিসিয়ানরা, গ্রীকরা, তুর্কীরা ও ইংরেজরা। ষাটের দশকের প্রথমের ইংরেজরা

সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দান করে। এ দেশে প্রধানতঃ দুটো জাতি বাস করে, গ্রীক-সাই-প্রিয়ট, যারা খৃষ্টান ও তুর্কী-সাইপ্রিয়ট, যারা মুসলমান। গ্রীক-সাইপ্রিয়টরা সংখ্যায় বেশী, তবে জমি জায়গা বেশীরভাগই তুর্কী-সাইপ্রিয়টদের হাতে। “একটা দেশ দুটো জাত” এভাবেই চলছিল কিন্তু ১৯৭৪ সালে তুর্কী সৈন্যরা আক্রমণ করে দেশের শতকরা ৪৫ ভাগ জায়গা দখল করে নেয়। ফলে এখন ছোট দেশটা কার্যত দুটো দেশে পরিণত হয়েছে। তুর্কী এলাকা ও গ্রীক এলাকার সীমানা বরাবর শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সৈন্যদের হাতে।

॥কৃষি অর্থনীতিবিদ ও পণ্যবিকার বলে অপর কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে ফল ও শাক-সবজি জন্মায় প্রচুর। এককথায় বলতে



বন্ধুরা : শ্রাবণ ১৩৯১

গেলে গোটা দেশটাই হচ্ছে আঙ্গুর ও কমলালেবুর দেশ। আর আছে অলিভ গাছের বাগান। অগ্ন্যন্ত্র মাঠের ফসল বলতে প্রধানতঃ আলু, গম ও বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি বোঝায়। গ্রীক অধ্যুষিত সাই-প্রাসে আমার ছ' সপ্তাহ ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। কৃষিতে এই ছোট্ট দেশ গত এক দশকে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল তা অল্প কথায় বলার চেষ্টা করবো। তার আগে দেশটার মাটি, জলহাওয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে ছ' চার কথা বলে নেই।

মোট জমির শতকরা ৬৫ ভাগ কৃষিকাজের উপযোগী। মাটি হালকা, খুব একটা উর্বর নয় এবং মাটিতে চুনের ভাগ বেশী। শতকরা ১৫ ভাগ জমি এতই অনুর্বর যে সেখানে চাষ-আবাদ করা যায় না। শীতকালে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪০০ থেকে ৬০০ মিলিমিটারের মধ্যে। ছোট ছোট নদীর সবগুলোতেই শুধু বৃষ্টির সময় জল থাকে। মাটির তলায় কিছু কিছু জায়গায় মিষ্টি জল আছে সেই জল তুলে চাষ-আবাদ হয় আবার পানীয় জলের যোগানও দেওয়া হয়। শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে সেচের সংস্থান আছে। এর মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ জমি সরকারী সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। দেশে মোট জনসংখ্যা সাড়ে ছয় লাখ এবং কৃষিকাজে নিযুক্ত আছে সর্ব-সাকুল্যে ৪০ হাজার পরিবার। এদের মধ্যে আবার শতকরা ৭০ ভাগই কৃষি ছাড়াও অন্য

কাজ করে থাকেন। সাইপ্রাসে শতকরা ৯৭ ভাগ লোক অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। দেশের মোট সম্পদসৃষ্টিতে কৃষির অবদান শতকরা ২৫ ভাগ। বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ১০-১১ ভাগ কৃষিজাত পণ্য থেকে আসে।

পরিবার পিছু গড় জমির পরিমাণ পাঁচ হেক্টর। এই জমিও আমাদের দেশের মতই ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত। পরিবার পিছু বা মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমে যাওয়া ও জমি টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য সরকার হতে আইন পাশ হয়েছে যার ফলে সেচ এলাকা, আংশিক সেচ এলাকা ও অসেচ এলাকায় মাথাপিছু সর্বনিম্ন কতটা জমি থাকতে হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যদি দেখা যায় জমির মালিক মারা যাওয়ার পরে তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে জমি ভাগ হলে প্রত্যেকের জমির পরিমাণ আইন-নির্দিষ্ট ন্যূনতম এলাকার নীচে চলে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে জমি ভাগ হবে না। তখন ভাই বোনদের মধ্যে সমঝোতায় আসতে হবে যার ফলে কোন কোন শরিককে তাঁর বা তাঁদের ভাগের জমি আপোষে অন্যদের দিতে হবে নচেৎ সব জমি সরকারে বর্তাবে। এতো গেলো মালিকপিছু জমির এলাকা কমে যাওয়া রোধ করার উপায় কিন্তু টুকরো টুকরো জমিকে একত্রীকরণ করতে না পারলে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার হবে কি করে? এক্ষেত্রেও দেশে আইন পাশ

হয়েছে যার ফলে কোনও গ্রাম বা একাধিক গ্রামের কমপক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ জমির মালিকরা যদি তাঁদের মালিকানাভুক্ত জমির একত্রীকরণ করতে সম্মত হন এবং সরকারে আবেদন করেন তাহলে সরকারের “জমি একত্রীকরণ বিভাগের” (Land Consolidation Department)) কর্মীরা কাজ শুরু করবেন। জমি জরিপ করা, মাটির গুণাগুণ নির্ধারণ করা, রাস্তাঘাট বানানো, জমি একত্রীকরণ করা এবং যেখানে যেখানে সম্ভব সেচের বন্দোবস্ত করা সব কিছুই সরকার হতে করে দেওয়া হবে এবং এর জন্য যা খরচ হবে তার সবটাই উপকৃত কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া হবে। এই জমির একত্রীকরণ করার ব্যাপারে কৃষকদের কাছ থেকে খুবই সারা পাওয়া গেছে এবং যেখানেই কাজ হয়েছে সেখানেই কৃষিতে সাফল্য এসেছে আশাতীত।

আমি আগেই বলেছি গোটা দেশটাতে মিষ্টি জলের প্রাচুর্যের অভাব আছে। শীতকালে বৃষ্টির জল পেয়ে নদীনালাতে যে জল জমে সেই জল ও মাটির নীচের জলই একমাত্র ভরসা। এই জল হতে সাড়ে ছ’লাখ লোকের দৈনন্দিন জলের প্রয়োজন মেটাতে হয়, জমিতে সেচের জল সরবরাহ করতে হয় ও অগণিত টুরিষ্টদের প্রয়োজন মেটাতে হয়। বলতে ভুলে গেছি প্রচুর সূর্যকিরণ ও ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুতে ছুটি কাটাতে ইউরোপ থেকে প্রতি বছরে ছুটে আসে লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের সুখ স্বচ্ছন্দে

ব্যবস্থা করার জন্য তৈরী হয়েছে বিলাসবহুল অগুনতি হোটেল। পরিবর্তে দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ আয় হয় এই টুরিষ্ট ব্যবসা থেকে।

দেশে জল যেহেতু অপ্রতুল সেজন্য জলের বিশেষতঃ সেচের জলের সৃষ্টি সদ্যবহারের দিকে সরকারের দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। যেখানে মাটির নীচে জলের সম্পদ খুব সীমিত সেখানে যে কোন কৃষক তাঁর নিজের চেষ্টায় ও অর্থে একটা কুয়ো খুঁড়তে পারেন বা পাম্প বসাতে পারেন কিন্তু প্রতিদিন তিনি কতোটা জল তুলতে পারবেন এবং কি ফসল করবেন সেটা নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। এর জন্য ফসলের নাম ও তার এলাকাই শুধু নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় না নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট ফসলের জন্য প্রতিদিন ওই কৃষক কতোটা জল তুলবেন তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। অবশ্য এই জলের প্রয়োজন কতোটা হবে তা গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করেই ঠিক করা হয়।

আরও বেশী জমিতে সেচের বন্দোবস্ত করা ছাড়া দ্রুত কৃষি উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য সরকার থেকে দুটো বড় সেচ প্রকল্প বিশ্বব্যাঙ্ক ও অগ্নাত আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে গত একদশকে রূপায়িত করেছে। এর একটা দেশের মধ্যাঞ্চলে পিতসিলিয়ার (Pitsilia) অলুর্বর পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। পাহাড়ের মধ্যে ছোট ছোট জলাধার তৈরী করা হয়েছে। চুইয়ে জল যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য নীচে প্লাস্টিকের

বস্তুকরা : শ্রাবণ, ১৩৯১

চাদর ও তার ওপরে বালির আস্তরণ দেওয়া হয়েছে। এই জলাধার থেকে পাইপের সাহায্যে সেচের জল দূরদূরান্তরে জমিতে সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিটি জমির মুখে পাইপ ও জলের মিটার বসানো আছে। এক একটা গ্রামের জমির জন্য দৈনিক কতোটা জল সরবরাহ হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই মূল্যবান সেচের জল প্রধানতঃ আঙ্গুরের চাষে ব্যবহার করা হয়।

অন্য প্রকল্পটি দেশের উত্তরাঞ্চলে প্যাফোস (Paphos) এলাকায় অবস্থিত। এখানে ছোট ছোট কয়েকটা নদীতে বাঁধ দিয়ে জলাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জলাধার হতে পাম্প করে জল পাইপের সাহায্যে চাষের জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। যদি কোন সময় পাম্প অচল হওয়ার দরুন বা অন্য কোন কারণে সেচের জল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে তাহলেও ফসল যাতে মার না খায় সেজন্য মাঝে মাঝে কংক্রিটের তৈরী উঁচু বাড়তি ছোট জলাধারে জল সবসময় মজুত রাখা হয়। কোন এলাকায় কতোটা জল প্রতিদিন সরবরাহ করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে কম্পিউটারের সাহায্যে। এই এলাকা উর্বর এবং এখানে সেচের সাহায্যে আঙ্গুর, কমলালেবু, শসা, টমেটো ইত্যাদি ফসল ফলানো হচ্ছে।

সরকারী সেচ ব্যবস্থায় কৃষকদের শুধু জল সরবরাহ করার জন্য খরচ-খরচা মায় কর্মচারীদের মাহিনা শুধু বহন করলেই চলবেনা এই সেচ ব্যবস্থা রূপায়িত করতে যা

ব্যয় হয়েছে তার একটা অংশও (সাধারণতঃ শতকরা ৪০ ভাগ) বহন করতে হয়। এর জন্য চাষীদের মনে কোন বিক্ষোভ দেখিনি। তবে যেহেতু একঘনফুট জলের দাম পড়ে যায় প্রায় দুটাকা চল্লিশ পয়সা সেজন্য সরকার হতে অনুদান দিয়ে ৭০ থেকে ৮০ পয়সা মাত্র আদায় করা হচ্ছে। এই মূল্যবান সেচের জলের প্রতিটি বিন্দু যাতে ঠিকমত সদ্যবহার হয় সেদিকে চাষীদের দৃষ্টি খুব সজাগ। মাঠে প্রতিটি চাষী Sprinkler-এর মাধ্যমে বা Drip (ড্রিপ) সেচ (প্রতিটি গাছের গোড়ায় কিছু সময় অন্তর এক ফোঁটা করে জল পাইপ হতে বেরিয়ে মাটিতে পড়বে) দিয়ে থাকেন। ভাবতে অবাক লাগে যেখানে আমাদের দেশে সেচের জলের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ মাত্র ঠিকভাবে ব্যবহার হয় ও বাকীটা নানাভাবে নষ্ট হয় সেখানে সাইপ্রাসে শতকরা ৯৫ ভাগ সেচের জল গাছের কাজে লাগানো হয়।

কৃষকদের মধ্যে উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কৃষি বিভাগের প্রতি জেলায় একজন করে জেলা কৃষি আধিকারিক আছেন। দেশের সাতটি কৃষি জেলা মোট ৩৩টি বিটে (Beat—আমাদের ব্লকের মত কিন্তু আয়তনে ছোট) বিভক্ত। প্রতিটি বিটে একজন করে ‘বিট কৃষি আধিকারিক’ (Beat Agricultural Officer) আছেন। জেলা অফিসের অধীনে যতসংখ্যক বিট আছে ঠিক ততজন ‘বিষয় বিশেষজ্ঞ’ (Subject Matter Specialist) আছেন। এদের

সাহায্য করার জন্তু আছেন কয়েকজন 'টেকনিসিয়ান' (Technician)। প্রতি বিটে গড়ে ১০০০ থেকে ১৫০০ কৃষক পরিবার আছেন। বিট কৃষি আধিকারিকের কাজ প্রতিটি কৃষকের খামার পরিকল্পনা (Farm Plan) রচনা করা, তার সেচের জলের প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ধারণ করা ও সর্বোপরি খামার পরিকল্পনা ঠিকমত রূপায়িত করা হচ্ছে কিনা তার তদারকি করা।

কৃষকের ফসলের দিন দিন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকেন “বিষয় বিশেষজ্ঞরা”। কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি-বিভাগে শিক্ষা দেওয়ার জন্তু ছুটি ‘কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে। এখানে কৃষকরা এসে কিছুদিন থেকে কৃষি শিক্ষা নিয়ে ফিরে যান। দেশে একটা কৃষি গবেষণাগার রাজধানী নিকোসিয়াতে (Nicosia) ১৯৬০ সাল হতে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কাজের জন্তু স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের মারফৎ উন্নত প্রযুক্তিবিজ্ঞা কৃষকদের কাছে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। আমি কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলে বুঝেছি তাঁরা সরকারী কাজে ও ব্যবস্থাপনায় মোটামুটি সন্তুষ্ট। প্রাইভেট ডিলারদের মাধ্যমে সময়ে আয়ামূল্যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধের সরবরাহ পেতে তাঁদের অসুবিধা হয় না বলেও বলেছেন। ট্রাক্টর, কম্বাইন হারভেস্টার (Combine Harvester) ইত্যাদি কৃষি যন্ত্রপাতির সরবরাহেও ঘাটতি

নেই বলে জানা গেল। তবে কৃষকদের মনে একেবারেই কোনও ক্ষোভ নেই বা চাহিদা অনুযায়ী যোগানের অভাব নেই বললে নিশ্চয়ই ভুল হবে। সাইপ্রাসের কৃষকরা চাল কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার জন্তু আরও বেশী সরকারী ঋণ এবং উৎপন্ন ফসলের আয়্য দাম।

ফসলের আয়্য দামের ব্যাপারে ছুঁচর কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আঙ্গুরের প্রধান বাজার ইউরোপে। আঙ্গুর হ’তে তৈরী হয় সুস্বাদু মদ। ইউরোপের আঙ্গুর ফসল সাধারণতঃ আগষ্ট মাসে বাজারে আসে। অতীতকালে সাইপ্রাসে জুন-জুলাই মাসেই আঙ্গুর বাজারে আসতে শুরু করে। যতদিন না ইউরোপে উৎপন্ন স্থানীয় আঙ্গুর বাজারে আসছে শুধু ততোদিন সেখানেই বাজারে সাইপ্রাসের আঙ্গুরের চাহিদা থাকে। আগষ্ট মাস থেকে এই চাহিদা পড়ে যায় এবং ফলে সাইপ্রাসের কৃষকরা মার খায়। এ ব্যাপারে কৃষকদের সাহায্য করার জন্তু সরকার ছুঁতাবে এগোচ্ছেন। যেসব জাতের আঙ্গুরের চাহিদা ইউরোপের বাজারে সাধারণতঃ থাকে সেইসব জাতের চাষ বাড়ান ও দেশের মধ্যে ট্যুরিষ্টদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে টেবল জাতের (Table Variety) আঙ্গুরের চাষের সম্প্রসারণ। এ ছাড়াও ফসল তোলার পরে প্রতিটি কৃষক যে পরিমাণ আঙ্গুর মদ তৈরীর কারখানায় (Winery) বিক্রী করেন এবং সরকার নির্ধারিত দাম ও কারখানায় দেয় দামের

মধ্যে যে ফারাকটুকু থাকবে তা অনুদান হিসাবে কৃষক সরকার থেকে পেয়ে যাবেন।

কৃষকরাও তাঁদের উৎপন্ন ফসলের সর্বোচ্চ দাম কিভাবে পেতে পারেন সেজন্য খুবই তৎপর। ইংলণ্ডে মহিলারা লাল খোসাযুক্ত আলু পছন্দ করেন। অতএব ইংলণ্ড থেকে প্রতিবছর বীজ এনে সাইপ্রাসের কৃষকরা আলুর চাষ করেন। ইউরোপের লোকেরা স্যালাডের (salad) সাথে ছ' এক টুকরো শসা পছন্দ করে, কিন্তু শসা যেহেতু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ফসল, অতএব সাইপ্রাসে গ্রীনহাউসে (Greenhouse) শসার চাষ করা হয়। আবার যেহেতু পশ্চিমের উন্নত দেশের লোকেরা এ্যাভোকেডো (Avocado) পছন্দ করে খুব এবং এর বাজার-দামও খুব বেশী সুতরাং সাইপ্রাসে কৃষকদের “এ্যাভোকেডো” চাষে সরকার থেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। অনেক গ্রামেই কৃষকদের সমবায় বিপণন সমিতি আছে। প্রতিটি সমিতিতে সদস্যরা চাঁদা দিয়ে একজন সর্বসময়ের সচিব (Secre-

tary) রাখেন। এঁর কাজ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাজার ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন ফসলের বাজার চলতি দাম সংগ্রহ করা এবং সদস্যদের উৎপন্ন ফসল যেসব বাজারে ভাল দাম পাওয়া যাচ্ছে সেখানে চালান দিয়ে সাহায্য করা। তবে এই কৃষি বিপণনের ব্যাপারে সরকারের আরও অনেক কিছু করার আছে বলে আমার ধারণা হয়েছে। সাইপ্রাস সরকার নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রকল্প নিয়ে বর্তমানে এগুচ্ছেন বলেও আমাদের বলা হয়েছে।

পরিশেষে আমি এটাই বলবো যে সাইপ্রাসের কৃষকদের মনোবল যে খুব বেশী তা আমার মনে হয়েছে। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও খুব স্বচ্ছ। এঁরা বছরের পর বছর ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন আর এ কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবী করার অধিকার আছে সাইপ্রাসের মহিলাদের। কারণ হিসাবে বলা যায় সাইপ্রাসে বর্তমানে কৃষিকাজে যাঁরা ব্যাপৃত আছেন তাঁদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশী।

কৃষিক্রান্তি

বিজ্ঞানমাসিক

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে ভাষ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রদোত্তর, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিক্ষেত্র, কৃষি বিপন্নন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্মত্বহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জঙ্ঘ সন্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সন্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার তিসানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে জমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রেসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিকার, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস’ দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

টীকা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিশোধী নক্সা) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপি কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

চাষবাসের সাহায্যে
নানান সামগ্রী যোগান দিতে এগিয়ে এসেছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

আধুনিক প্রণায় চাষ এবং কম খরচে আরও বেশী ফলনের জন্য পাবেন :

- | | |
|----------------------|---|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারগ্যাশনাল/এক্সট কোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “সুজলা” ডিজেন-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার (Sprayer) |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রেশার (Thresher) |
| | ৬। হস্তচালিত ছইনহো/সীড উইডার/সীড ড্রিল/লোহার লাম্বল ইত্যাদি |

তত্পরি,

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে—যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

29 OCT 1984

**ওয়েস্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিজ
কর্পোরেশন লিমিটেড**

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা ৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

টেলিফোন : ২২-২৩১৪

কৃষিকা

আশ্বিন : ১৩৯১



চত্বিংশ বর্ষ

সূচী

সম্পাদকীয়

৩—৪

পশ্চিমবঙ্গের সরবের চাষ/প্রবাল গুপ্ত ৫—৬
মটরের একটি উন্নত জাত/সন্তোষ কুমার দত্ত

৭—৮

দার্জিলিঙে গ্লাডিওলাস : একটি সাক্ষাৎকার/

চিদানন্দ গোস্বামী ৯—২১

কৃষি উৎপাদনে কে. পি. এস ১৩—১৫

১৯৮৪-৮৫-সালে রবি-গ্রীষ্ম চাষের

কার্যবিধি ও লক্ষ্য ১৭—১৯

পান চাষ/স্থায়ী চন্দ্র পাল ২০—২৭

কার্তিকে কৃষকের করণীয় ২৮

বিত্তখাত দিবস ও খাতোৎপাদনে মহিলাদের স্থান

২৯—৩১

সংবাদ ৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ষদ

বিকৃপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(সাধারণ)

ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(গবেষণা)

ধর্মীমুখার্জী, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক, কৃষি অধিকার
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষিতথ্য আধিকারিক
(সদর)

হুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক

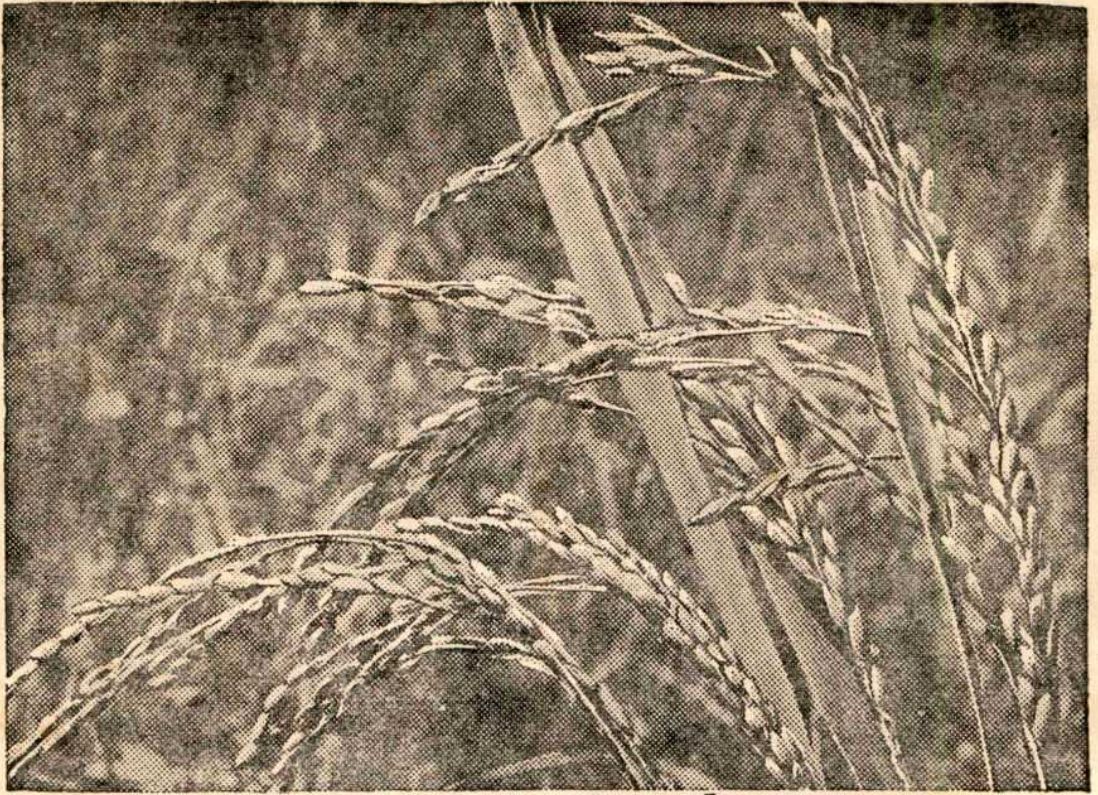
বিকৃপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

আশ্বিন-১৩৯১

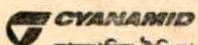
কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা

কর্তৃক প্রকাশিত



শক্তিশালী কীটনাশক থাইমেট ১০-জি আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে

দেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অধিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না এমন পোকামাকড় বিনাশ করে। এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের প্রতিহত করার আভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে।
তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১০-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের অপেক্ষা থাইমেট ১০-জি একবার প্রয়োগ করলেই সফল পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তাঁরা এই গুণবাহু ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন।



সায়নামিড ইন্ডিয়া লিমিটেড
কৃষি বিভাগ

পোস্ট বাক্স নং ১১০১, বোম্বাই ৪০০ ০১০

সায়নামিড প্রতিষ্ঠাচারী নির্ভরযোগ্য সহায়

* Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, U.S.A.



GL 355mm

সম্প্রদায়



শরতের বাংলার আকাশ বাতাস যখন শারদীয়া উৎসবের আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে তখন কৃষকের ক্ষেতের ধান শরতের রোদে আর রাতের শিশিরে ধীরে পরিণত হয়ে ওঠে। এই ধান পরিণত পুষ্ট হয়ে যখন কৃষকের ঘরে উঠবে তখন তা একাধারে যোগাবে ক্ষুধার অন্ন, আনবে সংসারে সমৃদ্ধি। কিন্তু ক্ষেতের এই ধান ঘরে ওঠার আগে অনেক সময়েই নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে কৃষকের ক্ষতি হয়ে যায়।

এ বছর খরিফ চাষের শুরুতেই অতি বৃষ্টির ফলে অনেক জায়গায় জল জমে চাষের পক্ষে সমস্তার সৃষ্টি করে। তবে সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এই সমস্তার মোকাবিলা করা অনেকটা সম্ভব হয়েছে এবং কৃষকরা এ বছর ব্যাপক জমিতে রোয়ার কাজ করতে পেরেছেন। এ বছর বৃষ্টির পরিমাণ অল্প বছরের তুলনায় বেশী হওয়ায় এবং আকাশ প্রায় মেঘলা থাকায় রোগ-পোকার উপদ্রপ কিছুটা বেশী। তবে এই সমস্যা সম্বন্ধে কৃষক এবং সরকার সজাগ থাকায় সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। যাতে রোগ-পোকার আক্রমণ হলেই তা দমন করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আশা করা যায় প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় আর না ঘটলে এ বছরও কৃষক ভাল ফলন তুলতে পারবেন।

এই সময় আমন ধানের যত্ন ও তদারকি যেমন চলতে থাকবে সেই সঙ্গে রবি চাষের প্রস্তুতিও নিতে হবে। এই আশ্বিনেই রবি চাষের কাজ শুরু হচ্ছে। আলু, গম, তৈলবীজ ডালশস্য এই সময়ের ফসল। এগুলির ফলন বাড়ানোর জন্য এখন থেকেই তৎপর হতে হবে।

গম এই সময়ের অত্যন্ত ফসল। গমের উৎপাদন মাঝে কিছুটা নেমে গেলেও গত বছর অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে এবং এ বছরও যাতে উৎপাদন আরও বাড়ানো যায় তার জন্য কার্যসূচী নেওয়া হয়েছে। গমের উৎপাদন বাড়াতে গেলে প্রথমেই এর উপযুক্ত জাতটি বেছে নিতে হবে এবং সময়মত বোনার কাজ শুরু করতে হবে।

তাছাড়া তৈলবীজ ও ডালশস্যের কোন একটি বাড়তি ফসল তুলে নেওয়ার সুযোগও আশ্বিনে আছে। আশ্বিনে এমন অনেক জমি থাকে যেখানে পাট বা স্বল্প মেয়াদী ধান চাষ হয়ে গেছে। সেখানে মাটির রসে ও বৃষ্টির জলে সরষে, ছোলা বা মুসুরের যে কোন একটি ফসল তুলে নেওয়া যায়।

ছোট ও প্রান্তিক কৃষকরা যাতে রবি ফসলের চাষ সময়মত শুরু করতে পারেন, সেজন্য মুসুর, ছোলা প্রভৃতির মিনিকিট বিনা মূল্যে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এ বছর অতি বৃষ্টির ফলে খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এই জলের সুযোগ নিয়ে কৃষকরা রবি চাষের জন্য বাপক কর্মসূচী নিতে পারবেন। রবি চাষের যে উৎপাদন লক্ষ্য সীমা এ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা রূপায়িত করতে সমর্থ হবেন এবং তা করতে পারলে এ বছরও খাণ্ড উৎপাদনের নতুন রেকর্ড তৈরী করা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবাংলায় সরষের চাষ

প্রবাল গুপ্ত

সুবরকম তৈলবীজের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় সরষের চাষই সবচেয়ে বেশী হয়। আর এর চাষও এ রাজ্যে ক্রমশঃ বাড়ছে। গত পাঁচ বছরে এ রাজ্যে সরষের চাষ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ সালে খরিফ মরসুমে প্রথর খরার জন্তু এ রাজ্যে অস্থান্য অনেক ফসলের চাষ কম হলেও, সরষের চাষ কিন্তু বেড়েছে। সরষের সঙ্গে তাল রেখে এ রাজ্যে তিলের চাষও ক্রমশঃ বাড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ তৈলবীজের মাত্র শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদন করছি। বাকী শতকরা ৮০ ভাগ তৈলবীজের জন্তু এখনও আমরা বাইরের যোগানের উপর নির্ভরশীল। কাজেই স্বনির্ভরতার দিকে এগোবার জন্তু আমাদের এ রাজ্যে তৈলবীজের উৎপাদন এখনও অনেক পরিমাণ বাড়তে হবে। যেহেতু সরষেই এ রাজ্যে প্রধান তৈলবীজ, তাই সরষে চাষের প্রতি আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে। এর এলাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একর প্রতি ফলন বাড়ানোও বিশেষ প্রয়োজন।

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক—(তৈলবীজ), কৃষি
অধিকার।

দেখা যাচ্ছে যে গত কয়েক বছর ধরে সরষে চাষের এলাকা ক্রমশঃ বেড়েছে। কিন্তু সীমিত সেচ ব্যবস্থার মধ্যে সরষের চাষ আরও খুব বেশী পরিমাণ জমিতে বাড়িয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে না। তবুও এরই মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যতখানি সম্ভব সরষের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। সেচ-সেবিত এলাকায় দুটি প্রধান ফসলের মাঝখানে যে সময়টা পাওয়া যায়, তাতে স্বল্পমেয়াদী টোরিয়ার (অগ্রনী) চাষ করে একটি অতিরিক্ত ফসল নেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া এক ফসলী অসেচ এলাকায় খরিফ মরসুমে স্বল্পমেয়াদী অধিক ফলনশীল ধান চাষের পর মাটিতে থেকে যাওয়া রসের (আর্দ্রতা) ব্যবহারে কোনও স্বল্পমেয়াদী এবং স্বল্পসেচ চাষযোগ্য সরষের চাষ করা যেতে পারে যেমন সীতা, বিনয়, ইত্যাদি। এভাবে অস্থ কোনও রবি ফসলের এলাকা না কমিয়েও সরষের চাষের এলাকা বাড়ানো সম্ভব। এছাড়া গম, ছোলা, মুসুর ইত্যাদি ফসলের সঙ্গে মিশ্র চাষ করেও সরষের এলাকা বাড়ানো সম্ভব।

ফলন (হেক্টর প্রতি) বাড়ানোর দিকেই
নজর বেশী দেওয়া প্রয়োজন। অস্থান্য

পশ্চিমী রাজ্যগুলির তুলনায় এখানে সরষের হেক্টর প্রতি ফলন বেশ কম। উন্নত প্রথায় চাষ করে সরষের ফলন অনেকটা বাড়ানো সম্ভব। এরজন্য প্রয়োজন ভালো বীজ, সুখম সার প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় সেচব্যবস্থা এবং রোগ পোকাকার আক্রমণে সঠিক ওষুধ প্রয়োগ। শুধুমাত্র উন্নত বীজ ব্যবহারেই ফলন প্রায় দেড়গুণ বাড়িয়ে নেওয়া যায়। বহরমপুর তৈলবীজ অনুসন্ধান কেন্দ্র থেকে কয়েকটি ভাল জাত বেরিয়েছে, যেমন— অগ্রনী, সীতা, বিনয়। বরুনা, আর-ডব্লিউ ৩৫১ এবং আর-ডব্লিউ ৮৫-৫৯ জাতও ভাল।

পশ্চিমবাংলায় কৃষকদের উন্নত প্রথায় সরষের চাষ ও তার ফলন দেখাবার জন্য ১৯৮২-৮৩ সালে কৃষি বিভাগ থেকে ২,৫৬০টি সরষের প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হয়। এই প্রদর্শন ক্ষেত্রগুলির জন্য কৃষকদের প্রয়োজনীয় বীজ, সার এবং কীটনাশক সরকারী খরচে দেওয়া হয়। এই রকম দুটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল।

বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকে গিয়ে-ছিলাম। ঐ ব্লকে সে বছর দুটি সরষের প্রদর্শনীক্ষেত্র করা হয়। একটি করা হয় পিয়ারীগঞ্জ গ্রামে শ্রীসুহাস বাগের জমিতে। দ্বিতীয় প্রদর্শনী ক্ষেত্রটি করা হয় ডাঙ্গাল গ্রামে শ্রীসুধীর ঘোষের জমিতে। দুটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রেই এক বিঘা করে জমির উপর হয়েছে। একবিঘার এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে

শ্রীসুহাস বাগ ফলন পেয়েছেন ১৬৫ কেজি অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে ১২.৩৮ কুইন্টাল এবং শ্রীসুধীর ঘোষ তাঁর প্রদর্শনী ক্ষেত্রে ফলন পেয়েছেন ১৪১ কেজি অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ফলনের হিসেব হচ্ছে ১০.৫৭ কুইন্টাল। শ্রীঘোষের জমিতে জাব পোকাকার আক্রমণ হয়েছিল তার জন্য রোগের স্প্রে করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ফসলের কিছু ক্ষতি হয়। জাব পোকাকার আক্রমণ না হলে বা ঠিকমত পোকা দমন করতে পারলে শ্রীঘোষ ফলন আরও বেশী পেতেন।

এক বিঘার এই প্রদর্শনী ক্ষেত্র দুটির জন্য শ্রীবাগ এবং শ্রীঘোষকে দেওয়া হয় ১ কেজি ক'রে উন্নত মানের বীজ (সীতা)। এই বীজ এঁরা বুনেছিলেন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে। প্রতিটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রে সার দেওয়া হয়েছে ইউরিয়া ১০ কেজি, সুপার ফসফেট (সিঙ্গল) ২০ কেজি এবং মিউরেট অফ পটাশ ৬ কেজি। সেচ দেওয়া হয়েছে ছবার বোনার ২০ এবং ৪০ দিন পরে। জমির অবস্থান একটু উঁচু এবং মাটি হালকা। ফসল কাটা হয়েছে বোনার ৯৫ দিন পর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সম্ভবমত সরষে চাষের এলাকা বাড়িয়ে এবং উন্নত প্রথায় চাষ করে সরষের ফলন আশানুরূপভাবে বাড়ানো সম্ভব এবং এ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তার তৈলবীজের ঘাটতি পূরণে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে।

মটরের একটি উন্নত জাত

সন্তোষ কুমার দত্ত

ডাল হিসেবে মটরের চাষ পশ্চিমবঙ্গে বেশী প্রচলিত নয়। তবে শুঁটীর জন্ম এই ফসলের চাষ বহুল প্রচলিত। যে সব জাত ডাল হিসেবে চাষ হয় সেগুলো দীর্ঘমেয়াদী ও মটরের ছত্রাক ঘটিত প্রধান রোগ “পাউডারী মিলডিউ” সহনশীল নয়। কাজেই স্বল্প-মেয়াদী ও কাঁচা শুঁটি হিসেবেও ব্যবহার করা যায় এমন জাত কৃষকদের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

এইরকম একটি জাতের নাম জি. এফ-৬৮। এটি ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার থেকে উদ্ভূত ও বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বহরমপুরস্থ ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে মূল্যায়িত। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি চাষ করলে মাঘ মাসের মাঝামাঝি, মোট ৮২—৮৫ দিনের মধ্যেই ফসল তোলার উপযুক্ত হয়ে যায়। ৫৫—৬০ দিনে একবার কাঁচা শুঁটি তুলে নিয়ে বাকী শুঁটি ডাল হিসেবে নেবার জন্ম রেখে দেওয়া যায়। স্বল্প মেয়াদী হওয়ার জন্ম এই জাতটিতে “পাউডারী মিলডিউ” রোগের আক্রমণ হবার সুযোগ কম। কোনও কোনও বছর এই রোগ হয়ই না।

ডালশস্য ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর।

প্রকৃতি—বেঁটে জাতের গাছ, উচ্চতা ৪৫-৫০ সে:মি:, শাখা-প্রশাখা কম হয় ও লতানে নয়। শুঁটির আকার বড় ও প্রতি শুঁটিতে ৫-৬টি বীজ থাকে। বীজ বড় আকারের ও খোসা কোঁচকানো, প্রতি ১০০টি বীজের ওজন গড়ে ১৫—২০ গ্রাম। যেখানে প্রচলিত দীর্ঘমেয়াদী জাতগুলোর ১০০টি বীজের ওজন গড়ে ৬—৮ গ্রাম। বীজ ও ফুলের রং সাদা।

চাষ পদ্ধতি

জমি নির্বাচন—এঁটেল, অল্প বা ক্ষার জাতীয় মাটি ছাড়া অন্য সব রকম জমিতেই এই জাতটির চাষ সম্ভব। তবে বেলে ও বেলে-দো-আঁশ মাটি ও জল নিকাশের ভালো ব্যবস্থা আছে এমন জমিতেই এই উন্নত জাতটির চাষ ভালো হয়।

বীজ বোনার সময়—কার্তিকের মাঝামাঝি সময়ের আগে জি. এফ-৬৮ উন্নত জাতটির চাষ করা সম্ভব নয়। কেননা শীতের আবহাওয়া এই জাতটির বিশেষ প্রয়োজন।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি—গাছ ছোট আকারের হওয়ার জন্ম হেক্টর প্রতি বেশী

বসুন্ধরা : আশ্বিন ১৩৯১

পরিমাণ বীজের প্রয়োজন হয়। ছিটিয়ে বা সারিতে যে ভাবেই বোনা হোক না কেন, হেক্টর প্রতি ৭৫ কেজি বীজ লাগবে। সারিতে বুনলে প্রতি সারি ২০ সেঃমিঃ দূরে দূরে হবে ও এই দূরত্বে পরিমাণ মত বীজ ফেললে ছুটি গাছের মধ্যকার দূরত্ব ১৫ সেঃমিঃ হবে। ভালো রসযুক্ত জমিতে বুনতে হবে। কেন না বীজের আকার বড় হওয়ার ফলে অংকুরোদগমের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ রসের প্রয়োজন।

বীজ শোধন—পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ পেতে হলে বোনার আগে প্রতি কেজি বীজ থাইরাম-ঘটিত ওষুধ যেমন 'থাইরাইড' বা পি. সি. এম. বি. ঘটিত ওষুধ যেমন 'ব্রাসিকল-৭৫' তিন গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

জীবাণুসার প্রয়োগ—কখনও মটরের চাষ হয়নি এমন জমিতে নিয়মানুগ জীবাণু সার প্রয়োগে ভাল ফলন আশা করা যায়। তবে জমিতে যদি আগে মটর, মুসুর ও খেসারীর চাষ হয়ে থাকে তবে জীবাণুসার প্রয়োগ না করলেও চলবে।

সার প্রয়োগ—মটর শিথিজনাতীয় ফসল। তাই এই ফসলে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রয়োজনীয়তা সীমিত। তবে ফসফেট ঘটিত সারের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। জমি তৈরীর সময় হেক্টর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন ও ৪০ কেজি ফসফেট প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে।

সেচ—সেচ প্রয়োগে মটরের ফলনে সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই উন্নত জাতটির বেলায়। বোনার ২০—২৫ দিন পর মাটিতে রসের অভাব দেখা গেলে একটি সেচ দিতে হবে। ১৫—৩০ দিন পর আর একটি সেচ দিতে হবে। সেচের প্রয়োজন অবশ্যই মাটিতে রসের অবস্থার ওপর নির্ভর করবে।

রোগ ও পোকার আক্রমণ দমন—মটরের প্রধান রোগ ছত্রাক জাতীয় "পাউডারী মিলডিউ"। জি. এফ-৬৮ স্বল্প মেয়াদী। তাই এই জাতটিতে "পাউডারী মিলডিউ" দেখা দেবার সম্ভাবনা কম।

কাণ্ডছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ চারা অবস্থা থেকেই দেখা যায়। এই পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে এণ্ডোসালফান জাতীয় ওষুধ যেমন 'থায়োডান', 'হিলডান', 'থায়োটকস' ইত্যাদির প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার জলে ১বা ১.৫ মিঃ লিঃ পরিমাণ ওষুধ মিশিয়ে, হেক্টর প্রতি ৫০০—৭০০ লিটার দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। চারার অবস্থা ভেদে দ্রবণের পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

ফলন—উপরোক্ত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি গড়ে ২৫ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যাবে। একবার শুঁটী তুলে নিলে শুঁটীর ফলন হেক্টর প্রতি ৫০ কুইন্টাল পাওয়া যাবে। এর ফলে উপরোক্ত ফলনের হার কম হবার সম্ভাবনা কম। এই উন্নত জাতটির চাষে এটাই প্রধান সুবিধা।



কাশিয়াঙের বি.
পাণ্ডে পাঁচ, গ্রাম
ইত্যাদি ফলে প্রথম
পুরস্কার বিজয়ী।
পশরা দেখাচ্ছেন
বঙ্গদর্শন সহ-
সম্পাদককে

দার্জিলিঙে গ্লাডিওলাস : একটি সাক্ষাৎকার

চিদানন্দ গোস্বামী

হ্যাঁ, শ্রী বি. পি. পাণ্ডে কালিম্পাঙের জর্নৈক নামীদামী প্রতিভাধর প্রগতিশীল কৃষক মাত্র। দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা এবং প্রগতি-চিন্তা—এই কয়েকটি বৃত্তির দৌলতে কালিম্পাংবাসী এই পাহাড়ী ভদ্রলোকটি তামাম জেলায় এবং উত্তর বঙ্গেও কৃষিতে উল্লেখ্য হয়ে উঠতে পেরেছেন।

শিলিগুড়ির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনীর উৎসবেই শ্রীপাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ। উৎসব উদ্বোধন করেছিলেন রাজ্য কৃষি মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ। এই ফল প্রদর্শনীতে শীতমণ্ডলীয় ফলে একাধিক পুরস্কার বিজয়ের কৃতিত্ব শ্রীপাণ্ডের।

সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম প্রদর্শনী কক্ষে বসেই। ধারে পাশে সামনে বিচিত্র রঙের আমেরিকান গ্লাডিওলাস ফুলের বাহার। পুষ্পকুন্ড থেকে বেরিয়ে আছে মনোরম রঙীন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের শিষ। প্রদর্শনী কক্ষের একটি কোণ যেন গ্লাডিওলাসের কুঞ্জবন। জেনে বিস্মিত হলাম, এই আকর্ষণীয় পুষ্প-বাহার শ্রীপাণ্ডেরই সৃষ্টি। শুধু তাই নয়, কালিম্পাং দার্জিলিং জুড়ে আমেরিকান গ্লাডিওলাস ফুলের বৃহদাকার উৎপাদক বলতে একমাত্র শ্রী বি. পি. পাণ্ডেই। এবং এহো বাহ। দার্জিলিঙ থেকে তাঁর ফুল বিক্রী হয় কোলকাতা, দিল্লী এবং বম্বেতে।

বসুন্ধরা : আশ্বিন ১৩৯১

তথ্যগুলো শুনতে শুনতে ক্রমেই আমার মানসিকতা যখন রঙীন হয়ে উঠছিলো, তখন শ্রীপাণ্ডে আমাকে তাঁর পূর্ব ইতিহাসে নিয়ে গেলেন।

দার্জিলিংয়ের কালিম্পাঙে শুভবস্থিতে বাড়ি। পুরোদস্তুর কৃষক। ১৯৬৬ সালে চাষ করতেন ধান, ভুট্টা, মিলেট ইত্যাদির। ঝাঁক গেল ফুলকপির দিকে। দু-একর জমিতে শুরু করলেন ফুলকপির স্নোবল, ডালিয়া জাতের চাষ। তল্লাট জুড়ে সাফল্যের যশকথা ছড়িয়ে পড়ল। আর লাভও হোল ধান ভুট্টার চেয়ে অনেক বেশি এই কপিতে। ফুলকপির বীজের উৎপাদক হিসেবে শ্রীপাণ্ডে একটি আকর্ষণীয় নাম হয়ে উঠলেন। লাভের কথা এবং বীজের মানের কথা মনে রেখে তিনি কালটিভেশন প্যাটার্ন বা চাষপ্রথা পালটে ফেললেন। এই নতুন প্রথায় বীজ করে তাঁর ৫-৬ গুণ বেশী লাভ হতে থাকল। সেই ট্রাডিশন আজো চলেছে। এখন আর ২ একরে নয়। ৫ একরে ফুলকপির বীজের চাষ। জেলার সীমানা ছাড়িয়ে শ্রীপাণ্ডের ফুলকপির বীজের চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা নানা জেলায় শ্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

শ্রীপাণ্ডে সর্বদাই নিত্য নতুন চিন্তার অধিকার নিয়ে চলেন। এই নিত্য নব চিন্তা ও প্রগতিশীলতাই তাঁকে নতুন নতুন পথের হাতছানি দেয়। তখন আমেরিকায় পড়াশুনো করছেন শ্রীপাণ্ডের মেয়ে। আমেরিকা থেকে মেয়ে পাঠালেন আমেরিকান গ্লাডিওলাস ফুলের কয়েকটি

বাস্ব বা গুটি। আর তাই থেকে শ্রীপাণ্ডে নির্ণায় এবং গভীর অনুপ্রেরণায় তৈরি করলেন কয়েক লক্ষ গুটি। ৮-১০টি গুটি থেকে ৭ বছরে লক্ষ লক্ষ গুটি তৈরি হোল।

এপ্রিল থেকে জুন, মাত্র তিন মাসের মরশুম এই ফুলের। তিন মাস পরেই বাস্ব তুলে ফেলেন। এক একটি বাস্ব থেকে প্রায় ৭০টি গুটি। এগুলো সংরক্ষণ করে তার থেকেই মালটিপ্লিকেশন করে গুটির সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন। মাটি থেকে এক একটি মরশুমে প্রায় ৪ মণ বাস্ব তোলেন পাণ্ডেজী। আড়াই একরে এই বাস্বের চাষ।

অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারটাও জেনে নিলাম বৈকি। আড়াই একরে মোট অর্থ বিনিয়োগ ২০ হাজার টাকা। প্রতিটি বাস্ব এক টাকা হিসেবে ৪০ হাজার বাস্ব থেকে ৪০ হাজার টাকা পাচ্ছেন পাণ্ডেমশাই। আর ফুল? ফুল থেকে আসছে ৪০ হাজার টাকা। মোট আয় মরশুমে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা। শ্রীপাণ্ডের কথা মতো খরচা বাদ দিয়ে সব ঝুঁকি বাদ দিয়ে লাভ থাকে প্রায় ৬০-৭০ হাজার টাকা।

বাজার সম্বন্ধে বললেন, সবচেয়ে ভাল বাজার দিল্লী আর বম্বে। ওখানের ফুল বাজারে পাণ্ডের গ্লাডিওলাসের বিশেষ কদর। কোলকাতাও মন্দ নয়। কোলকাতার নিউ মার্কেটে দৈনিক প্রায় হাজারটি ষ্টিক পাঠান।

রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনীতে শীত-মণ্ডলীয় ফলের পীচ এবং প্লামে দু'ছোটো প্রথম পুরস্কার বিজয়ী শ্রীপাণ্ডে। ৫০টি গাছ ছিলো আপেলের। চেষ্টাও করেছিলেন আপেল-চর্চার। কিন্তু জমি সায় দেয়নি বলে সব গাছ নষ্ট করে ফেলেছেন। তার পর শুরু করলেন পীচ, প্লাম, পীয়ারসের চাষ। ১০টি পীচ, ৪০টি প্লাম এবং ১০টি পীয়ারস ফলের গাছ রয়েছে তাঁর। কাঠমাণ্ডু থেকে জাত এনে চাষ করছেন। শ্রীপাণ্ডের আক্ষেপ, 'এই শীতমণ্ডলীয় ফলের চাষ করছি ঠিকই, কিন্তু এদের ভালো মার্কেট নেই।

আর সেই কারণেই কোন ইণ্ডাস্ট্রীও নেই। তাই এ সবের চাষ সম্প্রসারণের পথে বহুত ঝামেলা।' শ্রীপাণ্ডের পাশেই দাঁড়িয়ে তাঁর তরুণ পুত্র। চোখে মুখে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতি ও প্রত্যয়। জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, গ্রাজুয়েট হয়েছেন, কিন্তু বাবার সঙ্গে চাষেই থাকবেন। শ্রীপাণ্ডের আর দুই ছেলেও বাবার সঙ্গে চাষে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাক্ষাৎকার শেষ হতেই পিতা-পুত্র সৌজন্যের হাসি হাসলেন। কিন্তু চাষে তাঁর আন্তরিকতা এবং গভীরঅনুপ্রেরণা আমাকে মুগ্ধ করে রাখল—বিস্মিত করে রাখল।

পুষ্টিসাধন যন্ত্র

পুসা-মাড্‌পট

কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে ডাল শস্যের ফলন বাড়িয়ে তুলতে, বীজ-ডাল রিজোবিয়াম কালচার দিয়ে শোষণ করে নেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু গ্রামে ঠিকমত ব্যবস্থা না থাকায় সেখানে রিজোবিয়াম কালচার সংরক্ষণ করা যায় না। সুতরাং বেশীর ভাগ চাষাই এই অসুবিধার জগত বীজ-ডাল রিজোবিয়াম কালচার দ্বারা শোষণ না করেই তা চাষ করছেন, ফলে ফলনও কম পাচ্ছেন।

সুতরাং রিজোবিয়াম কালচার যাতে গ্রাম্য পরিপ্রেক্ষিতেও ঠিকমত সংরক্ষণ করা যায় তার জগত নতুন দিল্লীতে অবস্থিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থার মাইক্রো-বায়োলজি বিভাগ খুব সস্তায় এক প্রকার পুষ্টি-সাধন যন্ত্র (incubator) তৈরী করেছেন। ডালের ফসলের পর্যাপ্ত ফলন পাওয়ার জগত রিজোবিয়াম কালচার নামে রাসায়নিক সংমিশ্রণে পর্যাপ্ত পরিমাণে রিজোবিয়া ও

এ্যাজোটোব্যাকটার নামে বীজাণু উপস্থিত থাকা দরকার। কারণ এই বীজাণু জীবিত থাকলেই ডাল-বীজকে এই সংমিশ্রণ দ্বারা শোধন করা হলে, সেই বীজ পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণে সমর্থ হবে এবং নিজের শিকড়ে বহু সংখ্যায় গুটি উৎপন্ন করে সেখানে তা সংরক্ষণ করতে পারবে। এই সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত রাখার জন্য রেফ্রিজারেটর দরকার। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তার অসুবিধা থাকায় রিজোবিয়াম কালচার পলিথিন ব্যাগে করে মাটির তলায় পুসামাডপটে রাখার অভিনব ব্যবস্থা কৃষি-বিজ্ঞানীরা সম্ভাবিত করে তুলেছেন।

প্রথমে কোন বড় গাছের তলার ছায়ায় একটি ২০ লিটার মাপের বড় মুখের মাটির পাত্র পুঁতে রাখতে হবে। তারপর হাঁড়ির ভেতর পুরু স্তরে (১৫—২০ সে: মি:) নদীর বালি ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে শুধু হাঁড়ির কানা ও তার ঢাকা দেখা যায়। তারপর পলিথিন ব্যাগগুলি যার ভেতর রিজোবিয়াম এবং এ্যাজোটোব্যাকটার কালচার ভরা আছে সেগুলি একের পর এক করে হাঁড়ির ভেতর সাজিয়ে রাখতে হবে এবং তার পর

বালির ওপর ভালো করে জল সেচ দিতে হবে। এইভাবে মাটির তলায় হাঁড়ির ভেতর এই কালচার সংরক্ষণ করলে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কালচার বীজাণু সংরক্ষণ করা যাবে। এই সংরক্ষণ পরীক্ষার ফল আই. এ. আর. আই. কর্তৃক নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানে দেওয়া হয়েছে :—

ব্যাকটেরিয়াল কালচার তিনভাগে ভাগ করে এই ভাবে সংরক্ষণ করা হয় :

১। ঘরের ভেতর সর্বনিম্ন তাপে (৩২°-৫২° সেন্টিগ্রেড্)

২। ঘরের বাইরের সর্বনিম্ন তাপে (৩২°-৯২° সেন্টিগ্রেড্)

৩। এবং তৃতীয় ভাগ উল্লিখিত উপায়ে মাটির তলায় ২৬°—৩৭° সেন্টিগ্রেডে। দেখা গেছে মাটির তলায় হাঁড়ির ভেতর সংরক্ষণ করায় এই কালচারের জীবাণু পর্যাপ্ত সংখ্যায় জীবিত পাওয়া গেছে। সুতরাং চাষীরা রিসার্চ স্টেশন থেকে এই ব্যাকটেরিয়া কালচার এনে মাটির তলায় সংরক্ষণ করতে পারেন এবং দরকার মত ডাল-বীজ তাতে শোধন করে নিয়ে পর্যাপ্ত ফসল তুলে লাভের অংক বাড়াতে পারেন। (এফ. আই. ইউ-এর সৌজন্যে)।



বিশাল মেলার
কে. পি. এস.
কৃষক ভাইদের
চীনাবাদাম গাছ
দেখাচ্ছেন।

নিরঞ্জন ভূঞা

কৃষি উৎপাদনে কে. পি. এস

কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক, এক কথায় “কে. পি. এস” এই নামটির সঙ্গে এখন গ্রাম বাংলার মানুষ অপরিচিত নয়। কৃষকদের চাষের নানা সমস্যা, তার বৈজ্ঞানিক সমাধান কি হতে পারে, আর্থিক সাহায্য কিভাবে পাওয়া যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য করছেন এই কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা। উদ্দেশ্য কৃষি উৎপাদন যাতে কৃষকরা বাড়াতে পারেন। কৃষি প্রযুক্তি সহায়করা কিভাবে কৃষকদের সাহায্য করছেন মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তারই কিছু ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো।

কৃষিতথ্য আধিকারিক (পঃ)
জেলা মেদিনীপুর

সবং ব্রকের দেডোবা ১নং সারকেলের ৩নং ইউনিটের কৃষি কাজ দেখার জন্ত একদিন কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে রওনা হলাম। উচিতপুর প্রাইমারী বিদ্যালয়ে পৌঁছে পাশের গ্রামের একজন কৃষক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা হলো। সেখানে গ্রামের আরও কয়েকজন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। আমরা কে. পি. এস. শ্যামল চক্রবর্তীকে খুঁজছি জেনে তাঁরা বললেন যে শ্যামলবাবুর আজ এখানে আসার কথা আছে। সেজন্ত তাঁরা এখানে অপেক্ষা করছেন। তাঁরা এও জানালেন যে শ্যামল বাবু এখানে আসতে তাঁদের চাষের অনেক উপকার হয়েছে। চাষ ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন তাঁরা আগে দেশী ধান কেটে গম চাষ করতেন। তাতে গম বুতে দেবী হতো। ভাল ফলন পাওয়া যেত না। এ বছর শ্যামলবাবুর কথামত অধিক ফলনশীল জলদি জাতের ধানের চাষ করেন, সেই ধান কেটে গম সময় মত লাগাতে পেরেছিলেন। সরষের চাষ এখানে বাড়ছে এবং অনেকে এখানে বিনয় সরিষার চাষ করেছেন। তার ফলনও খুব ভাল হয়েছে। বোরোর জন্ত বীজতলা এখন সময় মত এবং উন্নত পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। তাছাড়া ছোটখাট পরামর্শ সব সময়ই শ্যামলবাবুর সঙ্গে করা হচ্ছে। উনি আসাতে আমাদের চাষের কাজে খুবই সুবিধা হয়েছে। কোন সমস্যায় পড়লেই শ্যামলবাবুর কাছে সবাই ছোটেন।

আর একদিনের ঘটনা। নারায়ণগড়

ব্রকের মকরামপুর ১নং সারকেলের ২নং তালী ইউনিট পরিদর্শনে গেছি। ঐ অঞ্চলের কে. পি. এস. মৃত্যুঞ্জয় রায়কে গ্রামেই পাওয়া গেল। তিনি তখন গ্রামের কৃষকদের নিয়ে চাষের বিষয় আলোচনা করছিলেন। কৃষকরা তাঁকে নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। আলোচনার শেষে কৃষকরা অনেকেই আমাদের জানালেন কি ভাবে তাদের কাজের সুবিধা হচ্ছে কে. পি. এস.-রা নিয়মিত গ্রামে যাওয়ার জন্ত।

যেমন ক্ষুদীরাম জানা নামে একজন কৃষক বলে উঠলেন, বোরো বীজ ধান যে বোনার আগে ওষুধ দিয়ে শোধন করে বেছে নিলে ভাল হয় তা জানতাম না। বিভূতি বাঁকুড়া একজন যোগাযোগকারী কৃষক, উনি বললেন কে. পি. এস.-এর উপদেশ মত সেচের জলের অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি বোরো চাষ কমিয়ে গত বছর থেকে সরিষা চাষ আরম্ভ করেছেন।

আরও একটি ঘটনা তুলে ধরি। কেশিয়ারী ব্রকের ১নং ঘূতগ্রাম সারকেলের একটি গ্রামের নাম দরবারমেলা। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করছে শুষ্ক-ডাঙ্গা, সারা বছর এমনই পড়ে থাকে। বর্ষাকালে বোনা ধান লাগান হয়। কিন্তু বৃষ্টির সুসম বর্টনের অভাবে ফসল প্রায়ই ঘরে ওঠে না। সদর দক্ষিণ মহকুমায় প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার একর জমির মাটি লাল, সেখানে কোনও ফসল হয় না বললেই চলে। ঐ সব এলাকায়

চীনাবাদাম, অড়হর, ভুট্টা, বরবটি, কলাই, তিল ও পাটবীজ ইত্যাদি একক অথবা সাথী ফসল হিসাবে লাগানর জন্ত কৃষকদের উৎসাহিত করা হয়। ঐ সারকেলের কে. পি. এস অমৃতময় মাহাত ঐ এলাকা বেছে নিয়ে চাষী ভাইদের উদ্বুদ্ধ করেন। কৃষি বিভাগ থেকে কেবল মাত্র চীনাবাদাম, কলাই, তিল, পাটবীজ ও ছলার ধান ছাড়া অন্য কোন বীজ সরবরাহ করা হয় নি। ফলে সাথী ফসল হিসাবে চাষ না করে যেটুকু বীজ পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে এক যায়গায় প্রায় ৭-৮ একর চীনাবাদাম, ২ একর কলাই, ৪ একর ছলার ধান, দেড় একর পাটবীজ ও ৫০ শতাংশ তিল-চাষ চাষী-ভাইদের দিয়ে করিয়ে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন ও চাষীভাইদের মনে একটা সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন। শুষ্ক ডাঙ্গা জমিতে বিনা সেচে শুধু বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে যে এত সুন্দরভাবে ফসল ফলান যায় চাষী-ভাইদের তা ধারণা ছিল না। এইভাবে চাষ করে চাষীভাইরা একর পিছু তিন থেকে চার কুইন্টাল চীনাবাদাম ফলিয়েছেন, যার

বাজার মূল্য পনের শত থেকে দুই হাজার টাকা। ছলার ধানও খুব ভাল হয়েছে। ভাল হয় নি পাটবীজ, তা শুধু যত্নের অভাবে এবং অসময়ে লাগানর জন্ত।

শুষ্ক ডাঙ্গা জমিতে যে এত সুন্দর ভাবে ফসল চাষ করা যায় তা দেখে মেদিনীপুরের জেলা শাসক খুশী হয়েছেন ও প্রশংসা করেছেন। মহকুমা কৃষি আধিকারিক মেদিনীপুর (সদর) দক্ষিণ, কেশিয়ারী ব্লকের কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সহযোগিতায় এই সম্ভাবনাকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরার জন্ত তিন চারটি ব্লকের কৃষক ভাইদের নিয়ে উক্ত স্থানে একটি কিশান মেলার আয়োজন করেন। কে. পি. এস অমৃতময় মাহাতর অক্লান্ত পরিশ্রমে অম্লরূপ চাষ এবং সেটাকে কেন্দ্র করে বিশাল মেলা উপস্থিত চাষীভাইদের বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে ফসলের পরিবর্তন ঘটিয়ে ঐ শুষ্ক ডাঙ্গা জমি থেকে যে যথেষ্ট আয় করা যায় তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে অনেক চাষী ভাইরা সেদিন কিশান মেলা থেকে ফিরেছেন।

উন্নত প্রথায় রাই ও সরষের চাষ করে ফলন বাড়ান

• উন্নত জাত

রাই ও সরষের কয়েকটি উন্নত জাত ও তাদের বৈশিষ্ট্য

জাত	মেয়াদ (দিন)	বোনার সময়	সারের পরিমাণ (উদ্ভিদ খাণ্ড হিসাবে একর প্রতি কেজিতে) প্রাথমিক সার চাপান না: ফ: প: সার নাইট্রোজেন
অগ্রণী (টোরি বি ৫৪)	৭০—৭৫	আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের ১ম সপ্তাহ	৮ ৮ ৮ ৮
সীতা (রাই বি ৮৫)	৮০—৯০	কার্তিকের মাঝামাঝি মধ্যে	১০ ১০ ১০ ১০
বরুণা (রাই টি ৫৯)	১১৫—১২০	আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের ৩য় সপ্তাহ	১০ ১০ ১০ ১০
বিনয় (শ্বেত সরষে বি ৯)	৯০—৯৫	আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিকের ১ম সপ্তাহ	১০ ১০ ১০ ১০
সেচবিহীন এলাকায়			৮ ৮ ৮ ৮

(জমিতে যথেষ্ট রস থাকলে)

- বীজের হার ও বীজ শোধন—একর প্রতি বীজ লাগবে ২৫—৩ কেজি। বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ব্রাসিকল ৭৫ বা এ্যাগোসেন জি এন বা ডাইথেন এম ৪৫ গুঁড়ো ওষুধ মাখিয়ে বীজ শোধন করুন।
- দূরত্ব—সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি), কেবলমাত্র বরুণার ক্ষেত্রে ৪৫ সে.মি.।
- সেচ—মাটিতে রসের পরিমাণ অনুযায়ী বোনার ৩-৪ দিন আগে ও বোনার পর ৪ সপ্তাহ পর পর টোরিতে ২টি ও রাইতে ৩টি সেচ দেওয়া দরকার। ফুল আসা ও দানা পুষ্ট হওয়ার সময় অবশ্যই জমিতে রস থাকা চাই।
- পরিচর্যা—বোনার ৮—১০ দিন পরে এবং ১৫ দিন পরে ছ'বার নিড়েন দিন। সারিতে বীজ বুনলে ছ'টি গাছের মধ্যে ৪"—৬" (১০-১৫ সে.মি.) দূরত্বে রেখে চারা পাতলা করে দিন।
- শস্য রক্ষা—রোগ পোকার উপদ্রব দেখলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর পরামর্শ নিন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০০৭১

এ বছরের জুন মাসের ৪ থেকে ৭ এবং ২১ থেকে ২৫ এই দুই পর্যায়ে অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়। প্রথম দফায় বৃষ্টিতে রাজ্যের ১২টি জেলার নীচু জমি জলে ডুবে গিয়েছিল। জল জমা শুরু হতেই দ্বিতীয় দফায় আবার বৃষ্টি নামে। ফলে বহু নদীতে জলবৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলের পুকুর, খাল-বিল এবং জলাশয়-গুলি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এ বছর কৃষকরা স্বাভাবিক কারণেই রবিচাষে সেই সঞ্চিত জলের সদ্যবহারে উৎসাহিত হবেন। জলে ডুবে থাকার জন্য যেসব নীচু জমিতে আমন চাষ করা সম্ভব হয়নি সেসব জমিতে বোরো ধান এবং রবিশস্যের চাষ করে কৃষকরা খরিফে পাট, আউশ, আমন এবং সবজি চাষের যে ক্ষতি হয়েছিল তা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন। ১৯৮৩-৮৪তে কতটা এলাকায় রবি-গ্রীষ্ম মরসুমে বিভিন্ন শস্যের চাষ হয়েছিল এবং এ বছর অর্থাৎ ১৯৮৪-৮৫তে চাষ এলাকার লক্ষ্যমাত্রা কত ধরা হয়েছে তা নীচে দেওয়া হলো।

১৯৮৪-৮৫ সালে

রবি-গ্রীষ্ম চাষের

কার্যসূচী ও লক্ষ্য

বসুন্ধরা : আশ্বিন ১৩৯১

১৯৮৩-৮৪ সালের এলাকা এবং ১৯৮৪-৮৫ সালের চাষের লক্ষ্যমাত্রা (হাজার হেক্টরে)

শস্য	১৯৮৩-৮৪র চাষ এলাকা	১৯৮৪-৮৫র চাষ এলাকার লক্ষ্যমাত্রা
১। গম	৩৬২'০	৫০০'০
২। বোরো ধান	৫০২'০	৫০০'০
৩। ডালশস্য	৪০০'০	৫০০'০
৪। তৈলবীজ	৩৫৯'৭৬২	৪০০'০
৫। আলু	১৫০'০	১৫০'০
৬। আখ	৩০'০	৩০'০
৭। সবজি	৩০০'০	৩০০'০

গত ১৯৮৩-৮৪ সালে বিভিন্ন রবিশস্যের ১৯৮৪-৮৫ সালে কত লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে কত উৎপাদন হয়েছিল এবং এ বছর অর্থাৎ তা নীচে দেওয়া হলো।

(হেক্টর প্রতি হাজার টন)

শস্য	১৯৮৩-৮৪-র উৎপাদন	১৯৮৪-৮৫-র উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
১। গম	৮৫৪'০	১০০০'০
২। বোরো ধান	১৩৩০'০	১৪০০'০
৩। আলু	৩০৪২'০	৩০০০'০
৪। ডালশস্য	২৬২'০ (আঃ)	৩৫০'০
৫। তৈলবীজ	১৯৫'৬	২০০'০
৬। আখ	২০'৫	২২'৫

রবিশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ১। সুপারিশ করা উন্নত মানের বীজ উপকরণ প্রভৃতি কৃষকরা যাতে ঠিক সময়ে ব্যবহার। উৎপাদন বাড়ানোর বড় হাতিয়ার পান তার জন্য কৃষি কার্যক্রমে গুরুত্ব হলো উন্নত মানের বীজের ব্যবহার। দেওয়া হয়েছে। গমের উৎপাদন বাড়ানোর ২। যথাসময়ে অর্থাৎ ১৮ই নভেম্বর জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব থেকে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে বীজ দেওয়া হয়েছে। বোনা।

৩। প্রতি বর্গমিটারে ৪০০ শীষ পেতে হলে হেক্টর প্রতি বীজের হার ১০০ কেজি রাখতে হবে। বীজ লাইনে বুনতে হবে এবং যেখানে সম্ভব লাঙলের পিছনে বীজ বুনতে হবে।

৪। চারার বৃদ্ধির বিশেষ সময়গুলিতে যেমন মুকুটমূল ধরা, গুছি ছাড়া, ফুল ধরা এবং গমে দুধ আসার সময় সেচ অবশ্যই দিতে হবে।

৫। ফসল ঠিক সময়ে কাটা এবং কাটার সময় প্রযুক্তিগত পদ্ধতি অনুসরণ করা।

বিভিন্ন কৃষি উপকরণের যোগান

রবি-গ্রীষ্মকালীন শস্যের চাষের জন্য বীজের সরবরাহ যাতে অব্যাহত থাকে তার-জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সার—সারের ঘাটতি যাতে না পরে সেজন্য ভারত সরকারকে প্রয়োজন মত রাসায়নিক সার সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশা করা যায় রবি-

গ্রীষ্ম চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের সরবরাহের অভাব হবে না।

কীটনাশক—প্রয়োজন অনুসারে কীটনাশকের যোগান যাতে ঠিক থাকে তা দেখা হচ্ছে এবং এ বছর এ বিষয়ে কোন ঘাটতি হবে বলে মনে হয় না।

সম্প্রসারণ ব্যবস্থা—বিভিন্ন শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যেমন, জেলা, মহকুমা ও গ্রাম স্তরে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভার মাধ্যমে উন্নত চাষ পদ্ধতি, সেচের জলের ব্যবহার, সুখম সারের ব্যবহার, বোনার সময় ইত্যাদি প্রযুক্তিগত তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকরা চাষের কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে রবি-গ্রীষ্ম কর্মসূচী সফল করে তুলবেন। এই কার্যসূচী রূপায়ণের জন্য যেমন কৃষি প্রযুক্তিবিদ তেমনই কৃষককুল ছয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।



পান চাষ

সুধীর চন্দ্র পাল

প্রাচীন ভারতে ভেষজ বিজ্ঞানীদের কাছে পানের গুণাগুণ অজানা ছিল না। আর তাছাড়া পানের সামাজিক মর্যাদাও আছে। পান অর্থকরী ফসলও।

- পান চাষের প্রধান কয়েকটি দিক হচ্ছে জল নিকাশের সুবিধা আছে এমন উঁচু উর্বর জমি, সেচের সুবিধা, প্রয়োজনীয় ছায়ার ব্যবস্থা এবং সময়-মত চাপান সার দেওয়া আর রোগ-পোকা সম্বন্ধে সচেতন থাকা।
- সম্ভব হ'লে প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে পান-বরজ দেখা অবশ্য কর্তব্য। আর এটা বেশ পরিশ্রমের কাজ, কারণ প্রতিটি লাইনের প্রতিটি গাছকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করে যেতে হবে।

অবশ্য চোখ একবার ঠিক হয়ে গেলে এই কাজটা তেমন অসুবিধাজনক মনে হয় না।

- পান সম্বন্ধে প্রত্যেক জেলার চাষীদের দেয়া কিছু কিছু নামকরণ আছে। যেমন ১৬ হাতের একটা লাইনকে বলা হয় ১ পিলি।

পানের জাত

জাত বিচারে পান চার রকমের। মাটির গুণাগুণের উপরে একই জাতীয় পানের ফলনের তারতম্য হতে পারে। সাধারণতঃ পুরোপুরি ফলন পেতে তিন বছর সময় লাগে এবং পরিচর্যা ঠিকমত করলে ফলন দশ বছর পর্যন্ত ঠিক থাকে যদিও পান গাছ বহু-বর্ষ জীবীত। স্থানীয়ভাবে একই জাতের পানের নানা ধরনের নাম আছে।

প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল)
পঃ বঃ ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কলিকাতা-১৭

১। দেশী পান বা মিঠা পান বা মিষ্টি পান—দোআঁশ মাটির উপযুক্ত পান

সাধারণভাবে এই পানের চাষই বেশী। বাজারে চাহিদা এই পানেরই বেশী, কারণ এই পান বেশ পাতলা আর ঝাল নয়। বাংলা পানের তুলনায় এই পানের আকৃতি কিছুটা সরু এবং লম্বা আর মাথার দিকটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। বাংলা পানের তুলনায় লতা আন্তে আন্তে বাড়ে কিন্তু শাখা-প্রশাখা হয়। বোঁটা ছোট আর সরু। ভাল দাম পাওয়া যায়।

২। বাংলা পান বা ভাবনা পান

এই জাতের পানের চাষই সবচেয়ে বেশী। এর উপযুক্ত মাটি হচ্ছে দোআঁশ, মেটে দোআঁশ। বেশ বড় আকারের পান হঠাৎ মাথার দিকটা সরু হয়ে গেছে। বোঁটা বেশ লম্বা আর সরু। একটা গাঁট থেকে আরেকটা গাঁট বেশ লম্বা। শাখা-প্রশাখা প্রায় হয়ই না। পান একটু মোটা তবে খুব অল্প ঝালের জন্য বাজারে চাহিদা বেশ আছে। দামও ভাল পাওয়া যায়। এই পানের ফলন এবং চাহিদাই সবচেয়ে বেশী।

সাঁচি পান

এ পানের পাতা ডিম্বাকৃতি এবং আকারে ছোট নরম এবং পাতলা আর মাথার দিকটা বেশ সরু। বাংলা পানের জমি আর সাঁচি পানের জমি একই রকমের। ২-৩ প্রকারের সাঁচি পান আছে এবং তা বেশ সুগন্ধযুক্ত অবশ্য এই পান একটু ঝাল।

গাছ পান

অনেকটা বহু ধরনের পান। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত এলাকাতে গাছ পানের লতা সুপারি, নারিকেল বা অল্প কোনও গাছে তুলে চাষ করা হয়। রোদ বৃষ্টি বেশ সহ্য করতে পারে। তবে গাছের গোড়ায় জল বেশী সময় জমে থাকলে সহ্য করতে পারে না। এ পানের চাষের খরচ খুব কম তবে পান বেশ মোটা ও ঝাল, ফলে জিভ খসখসে হয়ে যায়।

পানের জমি বা মাটি

পান বরজের পান অল্প বা স্কারফ কোন-টাই সহ্য করতে পারে না। ৪-৫ বছরের পতিত উঁচু, উর্বর জমিই হচ্ছে পান চাষের পক্ষে উপযুক্ত। জমিতে দ্রুত জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার। পলিমাটি ও জৈব সার মিশিয়ে আগে থেকে জমি তৈরী করে নিয়েও পান চাষ করা যায়। পাহাড়ী এলাকাতে মাটিতে ৪'×২' এবং ১২' গভীর গর্ত করেও পানের চারা (গাছ পান) লাগাবার প্রচলন আছে। সেই গর্তে ২ কেজি কাঠের ছাই বা পাতা পচা সার প্রয়োগ করার পর পান গাছ লাগাবার ব্যবস্থা করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে এক এক জাতের পানের এক এক ধরনের মাটির প্রয়োজন। সব ঠিক থাকলে ৫-৬ বছর এমন কি ১০ বছর পর্যন্ত ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পানের মাটি প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে জল না দাঁড়ায় এমন উঁচু

জমিকে বছরের পর বছর উর্বর রাখার জন্য পান বরজের পাশে প্রায় সম পরিমাণ জমি খালি অবস্থায় প্রথম থেকেই রেখে দিতে হবে, যাতে করে পরবর্তী সময়ে পান বরজের লতা মাটি দিয়ে ঢাকা দেবার জন্য বাইরে থেকে আর মাটি আনার প্রয়োজন হবে না। আর যদি তেমন খালি জমি না থাকে তবে বর্ষার আগেই বাইরে থেকে মাটি এনে বরজের পাশে স্তূপ করে করে রাখতে হবে।

পান বরজ তৈরীর পদ্ধতি

প্রথমে সূর্যালোক পান একেবারেই সহ্য করতে পারে না। অর্থাৎ পান চাষের পরিবেশ হচ্ছে অল্প অল্প আলো-হাওয়া যুক্ত স্নাতস্নাতে পরিবেশ আর তার সাথে থাকা চাই জল নিকাশের সুবিধা যুক্ত সেচের ব্যবস্থা। পান বরজে পানের লাইন ২'-২½' দূরে দূরে করা হয় আর এক একটা লাইন সাধারণতঃ লম্বা হয় ১ পিলি বা ১৬ হাত বা ২৪—২৭ ফুট। বরজের ভেতরে যাতায়াতের সুবিধার জন্য চারপাশে এবং কয়েক লাইন পরে পরে সরু জায়গা রাখতে হবে। ১ বিঘাতে সাধারণতঃ ১৫০টি এর কম লাইন থাকে। পান বরজ সাধারণতঃ ৭ ফুট এর মতো উঁচু হয় অর্থাৎ বরজের ছাউনির উপরটা যাতে করে হাতের নাগালের মধ্যে থাকে। যেখানে বরজ হবে তার চারদিকে বাঁশ, খড়, খড়ি, পাট কাঠি ইত্যাদি দিয়ে ঘরের মত ঢেকে দিতে হবে। বরজ যাতে করে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে পারে তার জন্য গেলভেনাইজড লোহার

তার দিয়ে চারপাশের মোটাখুঁটি লম্বালম্বি ভাবে এবং আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে দেয়া হয়। ঝড়ের হাত থেকে বরজকে বাঁচাবার আরেকটা পদ্ধতি হ'ল পানের লতাগুলি যে বাঁশকাঠিগুলি অবলম্বন করে জড়িয়ে উপরে উঠে সেই সব বাঁশের কাঠিগুলি সোজা করে না পুঁতে একটু বাঁকা করে পুঁতে হবে এবং এমন ভাবে চক্রাকারে, যাতে করে ঝড় যে-দিক থেকেই আসুক না কেন তাতে করে খুব বেশী ক্ষতি করতে না পারে। পানের লতা জড়াবার জন্য বাঁশের কাঠিগুলি বেশ শক্ত এবং লম্বা হওয়া দরকার যাতে করে বেশীদিন ব্যবহার করা চলে। ১০'-১১' লম্বা বাঁশের কাঠি ব্যবহার করাই ভাল।

আগেই বলা হয়েছে যে বরজের জমি এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে করে অতি বৃষ্টির সময়েও বরজের ভিতর জল না জমতে পারে অর্থাৎ জল নিকাশের ব্যবস্থা খুব ভাল থাকা চাই।

পানের পাতা লাগানো এবং সতেজীকরণ

পানের আকার, রং এবং ফলন ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন মত স্নাতস্নাতে পরিবেশ যুক্ত অল্প অল্প আলো বাতাসের ব্যবস্থা যে একান্তভাবেই প্রয়োজন তা আগেই বলা হয়েছে। ২'-২½' দূরে দূরে লাইনে ৩"-৪" গভীর করে নালা কেটে পানের লতা লাগাতে হয়। একটা গাছ থেকে আরেকটা গাছের দূরত্ব সাধারণতঃ

৬'—৮'। পানের লতাকে ৭ ফুট এর বেশী লম্বা হতে দেয়া হয় না কারণ বেশী লম্বা বা উঁচু পান গাছ থেকে পানের পাতা সংগ্রহ করা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় আর সেই সঙ্গে লম্বা গাছের জীবনী শক্তিও কমে যায়। তাই বেশী লম্বা বা উঁচু গাছকে নামিয়ে এনে “সতেজীকরণ” করা হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ ৭ ফুট উঁচু হবার পর গাছকে আর বাঁশের কাঠির সাথে বাঁধার প্রয়োজন হয় না। সে অবস্থায় গাছের লতাগুলি লতিয়ে নিচের দিকে নেমে এসে অবশেষে মাটিতে চলে আসে। গাছের বর্ধনশীল অংশ অর্থাৎ মাথার দিকটা বাইরে রেখে বাকি অংশ মাটি ঢাপা দেয়া হয়। এই প্রকার সতেজীকরণ পদ্ধতি প্রথম বছরে একবার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে দুবার করে করাই সঙ্গত। কোন কোন সময়ে লতার বর্ধনশীলতা অনুযায়ী আরও বেশীবার “সতেজীকরণ” করা চলে। যেহেতু শীতকালের তুলনায় বর্ষকালে লতার বর্ধনশীলতা বেশী তাই বর্ষাকালেই “সতেজীকরণ” করা হয়ে থাকে।

পানের লতা বরজে লাগাবার পর আলো, বাতাস এবং সেচ নিয়ন্ত্রণ

(১) অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি অর্থাৎ যখন আবহাওয়া শুকনো হতে আরম্ভ করে তখন বরজের ছাউনি দেবার কাজ অর্ধেকটা শেষ করে ফেলতে হবে।

(২) পৌষের প্রথম সপ্তাহে আবহাওয়া বেশ শুকনো এবং ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। আর

তাই পৌষের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বরজ পুরোপুরি ছেয়ে ফেলতে হবে কারণ পান গাছ ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আর তাছাড়া মাটি শুকনো হ'লে পরে পান গাছের ক্ষতি হবে।

(৩) সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে বরজের আবহাওয়া স্নাতস্নেতে থাকে অর্থাৎ পরিমিত সেচ দিতে হবে কলসির সাহায্যে। কারণ কলসির জল হাত দ্বারা চমৎকার ভাবে ছেটান যায়।

লাগাবার সময়

বছরে তিন বার পানের লতা লাগানো যায়।

(১) ফাল্গুন-চৈত্র মাসে

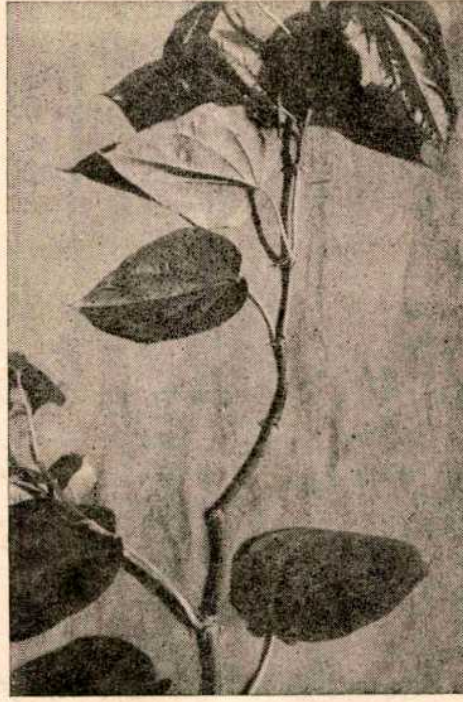
(২) আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এবং

(৩) আশ্বিন-কার্তিক মাসে।

১। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে লাগানোই সব-চাইতে ভাল কারণ তা'হলে ভাদ্রের মধ্যে পুরো ফসল পাওয়া যায়। গরমের সময় বলে সেচ বেশী লাগে আর তাই খরচ বেশী পড়ে। তবে তেজী বাজার পাওয়া যায় সেজন্য লাভ বেশী।

২। আষাঢ়-শ্রাবণে লাগালে এক বছর বাদে আবার আষাঢ়-শ্রাবণে পুরো ফলন পাওয়া যায়। সেচ লাগে না তাই পরিশ্রম ও খরচ কম।

৩। আশ্বিন-কার্তিকে লাগালে এবং জমির সালো থাকলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে



অর্ধেক ফলন পাওয়া যায়। পুরো ফসল ১০ মাস পরে পাওয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে লাগানোর তুলনায় খরচ কম এবং লাভও কম।

পানের লতা লাগানো এবং লাগাবার আগে রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা

পান গাছের মাথার দিক থেকে ৪' পরের নিচের দিকের অংশে প্রায়ই গোড়া পচা রোগ/পাতা পচা রোগ/ঢলে পড়া রোগের জীবাণু দেখতে পাওয়া যায় আর তাই পান লতার মাথার দিকের ৪' লতা সংগ্রহ করে তিনটে ভাগ করে ১'—১½'-এর

এক একটি কলম তৈরী করে নিতে হয় যাতে ৩—৫টা করে গাঁট থাকবে। লতার চারা/কলম/কাটিং লাগাবার আগে শোধন করে নিতে হবে।

পানের চারা/কলম/কাটিং তৈরীর জন্য ছ'বছরের পুরানো এবং সুস্থ নীরোগ বাগান বেছে নিতে হবে। এক বা একাধিক গাঁট মাটির উপরে রেখে কলম/চারা/কাটিংগুলি লাগাতে হয়।

যে সব এলাকাতে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী সেসব এলাকাতে প্রতিষেধক হিসেবে সেচের জলের সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং তার জন্য সেচ-

নালায় খাঁচার মধ্যে তুঁতে খণ্ড আগে থাকতে ডুবিয়ে রাখলেই চলে। তিন সপ্তাহের মধ্যেই পানের চারা সতেজ হয়ে ওঠে এবং একমাসের মধ্যেই প্রথম পাতা দেখা দেয়।

বরজের পরিচর্যা, সার তথা চাপান সার প্রয়োগ এবং মাটি চাপান দেয়া

বরজে যাতে করে কোন প্রকারের আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। পানের লতা বসাবার সময়ে উর্বর জমিতে সার লাগে না। আর তা না হলে সাধারণতঃ বিঘা প্রতি বছরে ৪ টন থেকে ১৬ টন জৈব সার অর্থাৎ পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট সার ব্যবহার করা দরকার। কোথাও আবার পুকুরের পচা পান্ডা গুলো সার এবং পচা গোবর সারের সাথে খোলের গুঁড়ো মিশিয়ে জমিতে দেবার প্রচলন আছে। জেলা ভিত্তিতে

খোলের পরিমাণ পরে দেয়া হচ্ছে। পান চাষীদের মধ্যে একটা কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চালু আছে যে “পান গাছ চাপানেই বাঁচে আবার চাপানেই মরে” অর্থাৎ ঠিক সময়ে পরিমাণ মত চাপান সার দিতে হবে অর্থাৎ সময় ও মাত্রার ব্যতিক্রম হলে গাছের ক্ষতি হবে।

(১) হুগলী ও হাওড়া জেলাতে চাপান সার প্রয়োগ

যতদিন না পানের লতাটি ৩’—৪’ লম্বা হচ্ছে ততদিন ১৫—২০ দিন অন্তর অন্তর বিঘা প্রতি ৫০ কেজি হারে সরষের খোল দেয়া প্রয়োজন। তারপর ২০—৩০ দিন অন্তর অন্তর বিঘা প্রতি ১০০ কেজি হারে সরষের খোল দেয়া দরকার এবং তা চলবে লতা নামানোর আগে পর্যন্ত। তারপর ১৫—২০ দিন বাদে বাদে বিঘা প্রতি ২০০ কেজি হারে খোল দিতে হবে।

(২) নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলাতে চাপান সার প্রয়োগ

উপরে বর্ণিত চাপান সার দেবার পদ্ধতি হাওড়া-হুগলী জেলার মত নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলাতেও প্রযোজ্য। যথা—

১। প্রথমবার চাপান সার দেবার মোটামুটি সময়	১লা আষাঢ়
২। দ্বিতীয়বার “ “ “	১৫ই আষাঢ়
৩। তৃতীয়বার “ “ “	১লা শ্রাবণ
৪। চতুর্থবার “ “ “	২০শে শ্রাবণ
৫। পঞ্চমবার “ “ “	১০ই ভাদ্র
৬। ষষ্ঠবার “ “ “	৩০শে আশ্বিন থেকে ২রা কার্তিক

সাবধানতা

কৃষি বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন যে রোগ-পোকা দমনে সাহায্য করার জন্য সরষের খোলের পরিবর্তে তিল অথবা বাদাম খোল ব্যবহার করা দরকার।

পান চাষে মোট ৬ বার চাপান সার দিতে হয় গাছের মাথা কালচে রংয়ের এবং শেকড় কালো রংয়ের হলে পরেই। অভিজ্ঞতায় বলে যে গাছের মাথা কালচে হয় নি বা শেকড় কালো হয় নি তেমন বরজে চাপান সার দেবার প্রয়োজন নেই।

আগেই বলা হয়েছে যে পানের লতায় মাটি চাপা দেবার জন্য আগে থেকেই সব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হবে।

১। ১লা আষাঢ়ের প্রথমবার চাপান সার হিসেবে পিলি প্রতি বা ১৬ হাতের লাইন প্রতি ১৫০—২০০ গ্রাম খোল দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

২। বর্ষা ভাল হলে ১৫ই আষাঢ় দ্বিতীয়বার চাপান সার হিসেবে পিলি প্রতি ২০০—২৫০ গ্রাম খোল দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। এ সময়ে গাছের মাথা লক্ষ্য করে বুঝতে হবে যে গাছের মাথা কালচে হয়েছে কিনা। উপরের দিকের আকর্ষের রং যদি কালচে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে মাটির ভেতরে শেকড়ের রঙও কালচে হয়েছে। শেকড় কালচে হলেই তবে তৃতীয়বার চাপান সার দিতে হবে।

৩। যদি শেকড় কালচে হয় তাহলে খোল ২০০—২৫০ গ্রাম হিসেবে পিলি প্রতি

দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। যদি শেকড় কালচে না হয় তাহলে চাপান সার না দেওয়াই উচিত। আর সে অবস্থায় যদি চাপান সার দেয়া হয় তাহলে গাছের ক্ষতি হবে এবং গাছের মাথার দিকে ঝাড় হবে না অর্থাৎ পাতার সংখ্যা বেশী হবে না। পাতায় দাগ ধরে যাবে আর এই ছলসা দাগ বা পোড়া দাগ সারে না।

৪। শেকড়ের রং দেখে তৃতীয়বার চাপান সার দেবার ২০ দিন বাদে ৪০০—৬০০ গ্রাম খোল চতুর্থ চাপান সার হিসেবে দিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে।

৫। পঞ্চমবার চাপান সার চতুর্থবার চাপান সার দেবার ২০ দিন বাদে ৪০০—৬০০ গ্রাম খোল চাপান সার হিসেবে দিয়ে গাছ খাটো করতে হবে। গাছ খাটো করা অর্থাৎ লতা নামিয়ে দিয়ে সতেজীকরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

৬। আশ্বিনের শেষ বা কার্তিকের প্রথম দিকে শেকড়ের রং কালো দেখে মাটির জো বুঝে শেষ বারের মত ৪০০—৬০০ গ্রাম খোল ষষ্ঠবারের মত চাপান সার দিতে হবে ও মাটি চাপান দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে মাটি যেন বেশী ভিজে না থাকে কারণ মাটিতে বেশী রস থাকলে পানে ছলসা দাগ বা পোড়া দাগ হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। আবার বেশী শুকনো হয়ে গেলে গাছে টান ধরবে। এই শেষ চাপান সার দেবার পর বৃষ্টি হয়ে গেলে তো খুবই ভালো আর তা না হলে প্রয়োজন

মত সেচ দিতে হবে। শেষ চাপান সার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আগেই বলা হয়েছে যে সরষের খোলের বদলে তিল অথবা বাদামের খোল ব্যবহার করাই শ্রেয়।

পান চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার

পান চাষে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সম্বন্ধে চাষীদের মধ্যে নানা প্রকারের অভিজ্ঞতা আছে। যেমন কেউ বলেন রাসায়নিক সার ব্যবহার খারাপ আবার কেউ বলেন রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হলে জৈব সারের সাথে মিশিয়ে করলেই ভাল। কারণ রাসায়নিক সারের পরিমাণ বেশী হলে গাছ নষ্ট হয়ে যাবে। রাসায়নিক সারের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন জাতের পানে বিভিন্ন রকমের যথা :—

১। দেশী পানে ইউরিয়া বা এমো-নিয়াম সালফেট প্রয়োগে প্রথম বছরে ভাল ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পরের বছর থেকে পানের ফলন কমতে থাকে; পান ঝাল হয় এবং রং খারাপ হয়ে যায়। কাজেই রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভাল।

২। বাংলা পান বা ভাবনা পানে রাসায়নিক সারের ব্যবহার খারাপ ফল দেয় না। তবে এখানেও পরিমাণ মত জৈব সার দেবার পরেই রাসায়নিক সারের কথা ভাবা দরকার।

৩। সাঁচি পানে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া দেশী পানের মতই।

৪। গাছ পানের বেলাতে নিয়ম মেনে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা চলে কারণ গাছ পান অনেকটা বন্য ধরনের পান আর তাই এর গুণাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কেউ মাথা ঘামায় না।

পান পাতা তোলা

আগেই বলা হয়েছে যে ঠিকমত সময়ে পান গাছ লাগিয়ে পরিচর্যা করলে ৬ মাস পরেই পাতা তোলা যায়। আবার ঠিকমত পরিচর্যা না করলে পুরো ফলন পেতে ৩ বছরও লেগে যেতে পারে। পান চাষীরা স্থানীয়ভাবে পানের সংখ্যা অনুসারে নামকরণ করে থাকে যেমন

৩২টি পান = ১ গোছ

৩৭'৫ গোছ = ১২০০ পান = ১ পাই

৮ পাই = ১ মোট

সাধারণভাবে মোট মানে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবার বোঝা। বাছাই করে ১ মোট পান বের করার পর কলাপাতা দিয়ে ভালভাবে বেঁধে বিক্রির জন্য কাছা-কাছি বাজারে বা হাটে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে।

প্রতিটি গাছ থেকে বছরে তিন, চার এমন কি পাঁচবারও পান তোলা যায়। বিঘাপ্রতি ভাল বরজে ১৫ লক্ষ পান পাওয়া যেতে পারে।

[বাকী অংশ পরের সংখ্যায়]



কাটিকে কৃষকের করণীয়

কাটিকে রবিশস্যের চাষ শুরু হয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই আসি সরিষার চাষে। তৈলবীজের ফলন বাড়াবার জন্য এবছরও রবি-কর্মসূচীতে এর চাষের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষই প্রধান। এ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অগ্রনৌ ও বিনয়। মাঝামাঝির মধ্যে সীতা ও তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বরুণা বোনা শেষ করুন।

আলু : তারপরই আলু। এ সময়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। জলদি জাতের আলু এ মাসের প্রথম দিকেও লাগানো যায়। নাবি জাত কুফরি জ্যোতি ও কুফরি সিন্দুরি লাগান। প্রধান ফসল হিসাবে এ মাসের মাঝামাঝি থেকে আলু লাগান। মাটি পরীক্ষা করে সুপারিশমত সার দিন। তা না হলে জমির উর্বরতা অনুযায়ী একর প্রতি ৪০-৬০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ আলু বসানোর নালিতে ছড়িয়ে দিয়ে

অল্প গুঁড়ো মাটি ছড়িয়ে আলুর বীজ বসান।

গম : এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সমতলভূমিতে সোনালিকা ও ইউপি ২৬২ জাতের গম শোধন করে বুহুন। গমের বীজ ৩-৪ বছর অন্তর পাণ্টে নেওয়া প্রয়োজন। অগ্ৰথায় বীজের ফলন ক্ষমতা কমে যায়। মাটি পরীক্ষা করিয়ে সুপারিশমত সার দিন। অগ্ৰাণ ফসলের মধ্যে সারা মাস ধরে মটর, তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত মুসুর এবং দ্বিতীয়ার্ধে চীনা বাদাম লাগান।

বোরো ধান : অপেক্ষাকৃত নীচু জমি ও যেখানে মাটির জল ধারণের ক্ষমতা বেশী এবং পৌষ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত যেখানে নিশ্চিত সেচের জল পাওয়া যাবে সেখানে বোরো চাষ করুন।

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে শোধন করা বীজ বীজতলায় ফেলুন। বোরো ধানের জাত এমন ভাবে ঠিক করুন যাতে বৈশাখের মধ্যে কেটে ফেলা যায়।

বিশ্বখাদ্য দিবস ও খাদ্যোৎপাদনে

মহিলাদের স্থান

বিশ্বখাদ্য দিবসে “ক্ষুধা থেকে মুক্তি” এই হোক আমাদের শপথ। এজন্য অধিক খাদ্যোৎপাদনই নয়—খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্বও অপরিসীম। সমীক্ষায় দেখা গেছে—সময়মত এবং সঠিক সংরক্ষণের অভাবে মোট উৎপাদিত শস্যের ১০ শতাংশ বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে এই শস্য যদি রক্ষা করা যায় তাহলে খাদ্যে স্বয়ংসন্তরতার দিকে আমরা অনেকটা এগিয়ে যাব।

এই কাজে মহিলাদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খাদ্য সংরক্ষণের কাজে মহিলারা বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন।

মোটামুটি নিম্নোক্ত কারণে সঞ্চিত শস্য নষ্ট হয়ে থাকে :

১। গোলাজাত শস্যে পোকাকার আক্রমণ ;

২। শস্যে ছাতা পড়া ;

৩। ইত্বরের উৎপাত।

(ক) সংরক্ষিত শস্য যাতে উপরোক্ত কারণে নষ্ট না হতে পারে তার জন্য ভাল-ভাবে শুকিয়ে, বাতাস না ঢেকে সে রকম পাত্রে রাখতে হবে।

(খ) ছাতা পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শস্য মাঝে মাঝে রোদে শুকিয়ে নিন।

(গ) পোকাকার আক্রমণ দমন করতে উপযুক্ত ওষুধ যেমন ই ডি বি অথবা ই ডি সি টি গ্র্যামপুল ব্যবহার করুন।

শস্য সংরক্ষণে সাহায্য করা ছাড়া মহিলারা খাদ্যোৎপাদনেও নানাভাবে অংশ নিয়ে থাকেন। ধানের যে বিশাল রোয়া করার কাজ করতে হয় তাতে মহিলারা অংশ নিয়ে থাকেন। ঠিকমত রোয়া করার উপরও ফলনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে। মহিলাদের উন্নত চাষ-পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা আরও ভাল থাকলে এ সব কাজ আরও সুষ্ঠুভাবে তাঁরা করতে পারবেন।

রাসায়নিক সার ছাড়া জৈব সারও চাষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। উন্নত প্রথায় কম্পোস্ট করে জৈবসার উৎপাদনে মহিলারা সাহায্য করতে পারেন। ঘরের নানা আবর্জনা, গোবর, চোনা ইত্যাদি দিয়ে উন্নত প্রথায় কিভাবে কম্পোস্ট তৈরী করা যায় সে সম্বন্ধে মহিলাদের প্রয়োজন হলে শিক্ষার ব্যবস্থা করাও দরকার।

আজকাল নানা কারণে ফসলে রোগ-পোকার আক্রমণ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। ফসলে রোগপোকা দমন করা এখন চাষের একটি অত্যন্ত কার্যসূচী। রোগপোকার দমনে নানা রকম রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সব ওষুধ বিষাক্ত। ঘরে ওষুধ এমনভাবে রাখা দরকার যাতে তা শিশুদের হাতের নাগালের বাইরে থাকে। এ কাজ ঘরের মহিলাদেরই করতে হয়।

তা ছাড়া চাষের কাজে এখন নানা রাসায়নিক সার ও কৃষি-যন্ত্রপাতির ব্যবহার হচ্ছে। সেগুলি সম্বন্ধে মহিলাদের যদি ভাল ধারণা থাকে, তাহলে ঘরে সেগুলির যত্ন ও দেখাশোনার কাজও মহিলারা করতে পারেন।

পুরুষরা মাঠে চাষের কাজ করলেও মহিলারা তাদের পাশে থেকে সব বিষয়েই সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে উন্নত চাষ-পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রধানতঃ কৃষকদের জন্য নানা

শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে। উন্নত চাষ-পদ্ধতি ও তাতে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধেও শিক্ষা-শিবিরের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে মহিলাদের এ বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রতি জেলাতেই মহিলা-শিবিরের আয়োজন করে মহিলাদের নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে করা দরকার। খাটোৎপাদনে মহিলা ও পুরুষ একে অন্নের পরিপূরক। কাজেই অধিক উৎপাদনে শুধু পুরুষদের সচেষ্টিত হলেই হবে না—মহিলাদেরও এই বিষয়ে অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

বিশ্বখাদ্য দিবসে আমাদের ব্রত হবে অধিকতর খাদ্য উৎপাদন এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে খাদ্যের অপচয় রোধ করা। মনে রাখতে হবে, একটি শস্যদানা রক্ষা করার অর্থ বাড়তি শস্যের উৎপাদন। মহিলাদের সক্রিয় চেষ্টাতেই তা করা সম্ভব।

সামগ্রিক খাদ্যোৎপাদন এবং কৃষি সমৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ বিচিত্র কৃতিত্ব ও গৌরবের অধিকারী

১৯৭৭-৭৮ : ৮৯ লক্ষ ৭০ হাজার টন।

১৯৮০-৮১ : ৮২ লক্ষ ৮১ হাজার টন।

১৯৮৩-৮৪ : ৯২ লক্ষ টন।

- খাদ্যোৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গে সর্ব-
কালীন রেকর্ড গৌরবের এক
উল্লেখ্য উদাহরণ।

- শুধু খাদ্যোৎপাদনই নয়, চালের
উৎপাদনে ১৯৮৩-৮৪ সর্বোচ্চ
ফলনের রেকর্ড সৃষ্টির বছর এবং
সর্বোচ্চ গড় ফলন-হারেও তৈরি
হয়েছে গৌরবময় রেকর্ড।

১৯৭৭-৭৮ : ৭৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টন।

১৯৮০-৮১ : ৭৪ লক্ষ ৬৬ হাজার টন।

১৯৮৩-৮৪ : ৭৯ লক্ষ ৪০ হাজার টন।

১৯৮৩-৮৪ : ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টন।

- ১৯৮৩-৮৪ সাল আলু উৎপাদনেও
এক সর্বভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টির
নজির। শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণতা নয়,
অন্য রাজ্যে বাড়তি উৎপাদন
রপ্তানীর গৌরবও অর্জন করেছে
পশ্চিমবঙ্গ।

- গমের ক্রমবর্ধমান ফলন-হার
১৯৮৩-৮৪তে শুধু রোধই হয় নি,
তাদের এ যাবৎকালের আন্তঃরাজ্য
ফলন-হারে রেকর্ড গড়ে তুলেছে।

১৯৮৩-৮৪ : হেক্টর-প্রতি ফলন হার।
২,৫৯৫ কেজি।

১৯৮৩-৮৪ : ৩০ : ১০ : ৭

- সার ব্যবহারের হার প্রসঙ্গেও এই
রাজ্য গৌরবের অধিকারী। সর্ব-
ভারতীয় সুষম সার ব্যবহারে
পশ্চিমবঙ্গ অগ্রগণ্য।

সংবাদ

পান চাষের উন্নয়নে একটি পদক্ষেপ

মাসিক অনুষ্ঠানে কিংবা আয়ুর্বেদ বিধি মতে রোগব্যাধি নিরাময়ে কিংবা বিলাসে পান অপরিহার্য বলেই পরিগণিত। ঐতিহ্য যেমন আছে তেমনি জনপ্রিয়তাও চূড়ান্ত বেড়ে চলেছে। তাই জন্মে পান কৃষকদের একটি লাভজনক ফসল।

সম্প্রতি পান চাষের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্মে রাজ্যভিত্তিক একটি কমিটি করা হয়েছে। রাজ্য কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীকমল গুহ কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। এই কমিটিতে আছেন লোকসভার সদস্য শ্রীসত্যগোপাল মিত্র। তা ছাড়া পান চাষের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি মনোনীত হয়েছেন, অধ্যাপক গজেন্দ্রনাথ সী (মেদিনীপুর), নিরঞ্জন পাত্র (হাওড়া) এবং পরমেশ্বর নন্দী (হুগলী)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই কমিটিতে রয়েছেন অধ্যাপক ডি. কে. দাশগুপ্ত (কলি: বিশ্ববিদ্যালয়) ও অধ্যাপক শঙ্কর মুখোপাধ্যায়

(বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)। তাছাড়া রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি সচিব, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার, কৃষি বিপণন শাখার অধিকর্তা এবং কৃষি বিভাগের উপসচিব। রেলওয়ে বোর্ডের ডিরেক্টর অব মুভমেন্টস্ও এই কমিটিতে একজন প্রতিনিধি।

পান চাষের সম্যক উন্নয়নের জন্মে এই কমিটি উপদেষ্টা সমিতির কার্য সম্পাদন করবেন বলে জানা যাচ্ছে। দ্রুত ও প্রান্তিক কৃষকের স্বার্থে পান চাষের উন্নয়নের মৌলিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে যথাসময়ে পান চাষের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা এবং পানের উৎপাদন বাড়ানোর জন্মে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা এই সমিতির কর্তব্যের অঙ্গ। পানের উৎপাদন এবং বিপণনের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করে সমাধানের চেষ্টা করা। পান চাষের উন্নয়ন এবং গবেষণার মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করা, পানের গুণগত মান ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্মে উপদেশ দেয়া ইত্যাদিও এই সমিতির কর্তব্যের অন্তর্গত।

কৃষিক্রান্তি

নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাচ্ছাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রদোত্তর, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঋণ, কৃষি বিপন্নন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্ধ্যাবহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জন্য সন্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সন্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফোপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা "কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ"-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস' ঘারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংপ্রণোদিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাক, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপি কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

- | | |
|---|---|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারগ্যাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবাটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “সুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রেশার |
| ৬। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য | ৬। হস্তচালিত ছইলহো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি |
| | ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল পাম্প |

তত্পরি,

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা ৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

টেলিফোন : ২২-২৩১৪
২৩-৩১২২

স্বপ্নকথা

কার্তিক : ১৩৯১



চল্লিশ বর্ষ

সূচী

সম্পাদকীয়	৩-৪
তৈলবীজের উন্নত জাত ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য	৫-৮
শুভেন্দু দেব চ্যাটার্জী ও বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী	
তৈলবীজের পোকা ও তার দমন	৯-১১
ডঃ দিলীপ কুমার নাথ	
পশ্চিমবঙ্গের তৈলচিহ্ন	১৩-১৫
ডঃ কল্যাণকান্ত সেনগুপ্ত	
তৈলবীজের রোগ ও তার দমন	১৬-২২
বীরেন্দ্র নাথ বাগচী	
তৈলবীজের উন্নত চাষ পদ্ধতি	২৩-৩২
সমীর রঞ্জন পাল	

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্বদ	
বিকল্পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ	
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা	(সাধারণ)
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা	(গবেষণা)
বুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)	
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ	
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ	
আধিকারিক, কৃষি অধিকার	
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক	(সদর)
স্বলেখ। ঘোষ, সম্পাদিকা	
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক	

প্রধান সম্পাদক
বিকল্পদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ
কার্তিক-১৩৯১

কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা।
কর্তৃক প্রকাশিত



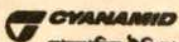
শক্তিশালী কীটনাশক থাইমেট ১০-জি

আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন

সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে

পেহরস, স্পর্শ ও ধোয়ার অধিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না এমন পোকামাকড় বিনাশ করে। এমনকি পোকামাকড়ের আক্রমণের আগেই তাদের প্রতিহত করার অভ্যন্তরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলে।

তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১০-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের অপেক্ষা থাইমেট ১০-জি একবার প্রয়োগ করলেই সফল পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তাঁরা এই ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও স্বরক্ষিত রেখে নিশ্চিতরূপে বেশী সফল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন।



সারসানিভ ইন্ডিয়া লিমিটেড
কৃষি বিভাগ

ফোন: ৮১ নং: ২১০২, বোম্বাই ৪০০ ০২০

সারসানিভ প্রাইভেট চাৰ্মি মিউজবোধ্য সন্যার

Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, U.S.A.



GL 385 BEN

সম্পাদক



কার্তিকের মাঠে এখন আমন ধান ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাকৃতিক কোন দুর্ঘটনা এর মধ্যে না ঘটলে আশা করা যায় এ বছরও আমন ধানের ফলন খুবই ভাল হবে।

এর পরই রবি মরশুমের চাষ। আমন ধান কাটার পর জমিতে যে রস থাকে তাতেই প্রধানতঃ রবি ফসলের চাষ হয়ে থাকে। রবি ফসলের মধ্যে বিশেষ করে তৈলবীজ ও ডালশস্য। এ দুটির চাষ এলাকা ও ফলন দুইই প্রয়োজনের তুলনায় কম। অথচ এই দুটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের জন্ম আমরা অল্প রাজ্যের উপর নির্ভর করে থাকি।

তৈলবীজ ও ডালশস্যের ফলন যাতে বাড়ে তার জন্ম রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে গত কয়েক বছরে ডালশস্যের এলাকা এবং উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পে তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্ম চলতি বছরেও রাজ্য সরকার এক ব্যাপক কার্যসূচী নিয়েছেন। চার লক্ষ হেক্টর তৈলবীজ চাষের লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে এবং উৎপাদন লক্ষ্যসীমা ধরা হয়েছে ২ লক্ষ টন। এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে তৈলবীজের চাষে সার ও সেচের ব্যবহার খুবই সীমিত। তাতে ফলন আশানুরূপ হয় না। যেখানে সেচের জলের সুবিধা আছে সেখানে সেচ দেওয়া ও পরিমাণ মত সার ব্যবহারের জন্ম কৃষকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এ ছাড়া এ বছরও সরষে, তিল, তিসি প্রভৃতি শস্যের জন্ম প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভাল ফলনের জন্ম সময়-মত চাষ শুরু করা যেমন দরকার, তেমন প্রয়োজন ভাল বীজের। বীজের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে সেজন্য সরকার এ বিষয়ে যত্ন নিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বীজের অভাবে বেশিরভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য এ বছরও মিনিকিট প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ডালশস্য, সরষে, সূর্যমুখী প্রভৃতির বীজ বিলি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্ম রাজ্য সরকার নানা-

ভাবে চেষ্টা করছেন। উদ্দেশ্য, তৈলবীজে ক্রমশঃ স্বয়ম্ভূত হয়ে ওঠা।
তৈলবীজের ওপর গুরুত্ব রেখে এ বছর কার্তিক সংখ্যা প্রকাশিত
হলো। তৈলবীজের চাষ, তার উন্নতির ধারা, উন্নত জাত ও
তাদের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ এই সংখ্যায়
সংযোজিত হলো। স্বল্প পরিসরে আরও বিশদভাবে আলোচনা
করা সম্ভব হলো না।

এ বছর রবি চাষের প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল। কৃষকদের
অনুরোধ করি তারা যেন এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, যেখানে যে
ধরণের শস্যের চাষ করা সম্ভব তা ঠিক করে নিয়ে চাষ শুরু করে
দেন। এ বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে কৃষকরা
যেন স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
কৃষকদের যত্ন ও চেষ্টার উপরই নির্ভর করে উৎপাদন প্রকল্পের
সফলতা।

তৈলবীজের উন্নত জাত

শ্রেষ্ঠাঙ্কিত বৈশিষ্ট্য

শুভেন্দু দেব চ্যাটার্জী ও বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী

এ রাজ্যে গড়পড়তা ২৯৯* হাজার হেক্টর জমিতে তৈলবীজের চাষ হয়। এর মধ্যে ১৩৮* হাজার হেক্টর জমিতে রাই-সরিষা, ৯১ হাজার হেক্টর জমিতে তিল ও ৬১* হাজার হেক্টর জমিতে তিসির চাষ হয়। সুতরাং এই তিনটি ফসলকেই এই রাজ্যের প্রধান তৈলবীজ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এই তিনটি ফসলের মধ্যে আবার, রাই-সরিষা ও তিসি রবিফলদের ফসল। পঃ বঙ্গে তিলের চাষের প্রচলন মূলতঃ শ্রাক খরিফ খন্ডে। (*বিগত পাঁচ বছরের গড়)

রবিফল ফসল লাগাবার সময় প্রায় এসেই গেছে, আর যেহেতু রাই-সরিষা ও তিসিই হল এ সময়ের উপযুক্ত ফসল কাজেই এই স্বল্প পরিসরে এ দুটি প্রধান তৈলবীজের উপরেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হল।

রাই-সরিষা

পশ্চিমবঙ্গে মূলতঃ রাই-সরিষা গোষ্ঠীর তিনটি প্রজাতির চাষ হয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের ভাষায় এদের বলা হয় (১) টোরী সরিষা, (২) খেত সরিষা ও (৩) রাই। ইংরাজী পরিভাষায় রাই অর্থে Mustard এবং খেত ও টোরী সরিষাকে একত্রে বলা হয় রপসীড (Rapeseed)। এই বিভাজিত প্রজাতির মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন রাই এর তেলে পাওয়া যায় আকাংক্ষিত ঝাঁজ কিন্তু টোরী ও খেত সরিষার তেলে সেই ঝাঁজের ভাগ কম থাকে। আবার রাই ও খেত সরিষার ক্ষেত্রে যেখানে স্ব-পরাগ সংযোগে ফল ও বীজ হয়, টোরী সরিষার ফুলে পরাগদানী গর্ভমুণ্ডের বিপরীত দিকে বঁকে থাকার ফলে মোমাছি দ্বারা

বঙ্গবন্ধু : কার্তিক : ১৩২১

বা অল্প কোন উপায়ে অল্প কোন ফলের পরাগ সংযোগে অর্থাৎ ইতর পরাগ সংযোগে বীজ ও ফল হয়। আবার রাইয়ের পাতা লম্বা বোঁটার সাহায্যে গাছের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্তু শ্বেত সরিষা ও টোরীর বোঁটাহীন পাতা গাছের কাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি সংবদ্ধ থাকে। এই তিনটি প্রজাতিরই বেশ কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পশ্চিমবঙ্গের জল হাওয়ার উপযোগী বলে এরা বিবেচিত হয়েছে। প্রথমে এই জাতগুলির পরিচিতি দেওয়া হল।

টোরী

১। অগ্রণী :—গাছ বেঁটে, উচ্চতা ৮০—৮৫ সে.মি., বীজ আকারে ছোট। রং লালচে বাদামী। ৭০—৭৫ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন ২'৫—৩'৫ গ্রাম। তেলের পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ।

২। কম্পোজিট-৩ :—অগ্রণী থেকে কিছুটা লম্বা। বীজ মাঝারি আকারের। পাকতে সময় লাগে ৮০—৮৫ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন ১২—১৪ কুইন্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন ৩—৪ গ্রাম। তেলের পরিমাণ শতকরা ৭১ ভাগ। শ্বেত সরিষা

বিনয় : গাছ লম্বা, প্রায় ২০—১০০ সে.মি.। ডালপালা কম। ফল চ্যাপ্টা। দানা মাঝারি আকারের, হলদে। পাকতে সময় নেয় ২০—২৫ দিন। ফলন হেক্টর প্রতি ১৪—১৫ কুইন্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন ৩—৩'৫ গ্রাম। তেলের ভাগ শতকরা ৪৬।

রাই

১। নীতা :—গাছ লম্বা, প্রায় ১২০ সে.মি.। অনেক ডালপালা যুক্ত। বীজ আকারে ছোট, রং বাদামী। পাকতে সময় লাগে ২৫—১০০ দিন। হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১৪—১৫ কুইন্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন ২'৫—৩ গ্রাম। তেলের ভাগ শতকরা ৩৮।

২। আর ডব্লিউ-৩৫১ :—বরুণা ও এপ্রেসড, মিউটেণ্টের সংমিশ্রণে তৈরী এটি। গাছ ১২৫—১৫০ সে.মি. লম্বা। শাখা প্রশাখা চাপা। ফলগুলো কাণ্ডের সঙ্গে সাঁটা। দানা মাঝারি আকারের, বাদামী রং। পাকতে সময় লাগে ১১০—১১৫ দিন। হেক্টরে ফলন প্রায় ১৭ কুইন্টাল। প্রতি হাজার বীজের ওজন ৪—৪'৫ গ্রাম। তেলের ভাগ শতকরা ৩৮।

৩। আর ডব্লিউ-৮৫—৫৯ :—এটি বরুণা ও বি-৮৫ জাতের সংমিশ্রণে তৈরী। গাছ প্রায় ১৫০ সে.মি. লম্বা। শাখা বহুল ও ছড়ানো জাতের। দানা মাঝারি আকারের, রঙ বাদামী। প্রতি হাজার বীজের ওজন ৪'০—৪'৫ গ্রাম। পাকতে সময় লাগে ১১০—১১৫ দিন। হেক্টরে ফলন ১৮ কু.। তেলের ভাগ শতকরা ৩৮।

উপরে উল্লিখিত প্রাতিটি জাতই উচ্চ ফলন-শীল। কিন্তু বোনার সময়, সেচের সুবিধা, জমির চরিত্র ইত্যাদি বিচার করে সঠিক জাতটি বাছাই করে নিতে পারলে তবেই আশাহুৰূপ ফলন পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বোনার সময় নির্ভর করে প্রধানতঃ শস্য পথায়ের (crop sequena) উপর। যারা ভাদ্রের শেষে বা আশ্বিনের প্রথমার্ধে উঁচু জমিতে

বোনা ধান বা পাট কেটে সময়ের বুন গম চাষে যেতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে খেত সরিষা বা রাই অপেক্ষা কম দিনের ফসল হিসাবে টোরি সরিষার “অগ্রণী” জাতটি উপযুক্ত হবে। অন্ত্যায় পরের ফসল গম বুনতে দেরী হবে এবং ফলন পড়ে যাবে।

আবার, যারা আমন ধান কেটে রাই-এর চাষ করতে চান তাঁদের দেখতে হবে অন্ততঃ কার্তিকের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে রাই বোনা যাচ্ছে কিনা। যদি এই সময়ের মধ্যে বোনা সম্ভব হয় তবে সেচের দিকে নজর রেখে জাত বাছাই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। যদি সেচের কোনরকম সুবিধা না থাকে অর্থাৎ বৃষ্টি নির্ভর চাষ করতে হয় তবে “অগ্রণী”, “সীতা”, “কম্পোজিট-৩” এর যে কোন একটি বেছে নেওয়া যেতে পারে। যদি একটি মাত্র সেচের সুযোগ থাকে তাহলেও বাছাই তালিকায় থাকে এই জাতগুলিই। তবে মনে রাখা দরকার একটিমাত্র সেচের সুবিধা থাকলে ওই সেচটি টোরি সরিষার বেলায় বোনার ২০—২৫ দিনের মাথায় এবং রাই-এর বেলায় ৩০—৪০ দিনের মাথায় অবশ্যই দিতে হবে। জুটির বেশী সেচের সুযোগ থাকলে বাছাই তালিকায় থাকা দরকার “বিনয়”, আর. ডব্লিউ-৩৫১ অথবা আর. ডব্লিউ-৮৫—৫২। কিন্তু ধান কেটে রাই বুনতে যদি দিন গড়িয়ে কার্তিকের শেষ অথবা অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ এসে পড়ে তাহলে বেছে নিতে হবে “বিনয়” অথবা “আর. ডব্লিউ-৮৫—৫২”। এখানে বলে রাখা দরকার সরিষা বত দেবীতে বোনা হবে বসারোগ ও জাব পোকাকার প্রকোপও ততো

বাড়বে। সেদিক থেকে বিচার করলে “বিনয়”-এর চেয়ে আর. ডব্লিউ-৮৫—৫২ জাতটি বোনাই সম্ভব হবে। কারণ “বিনয়” ধসা রোগ ও জাব পোকাকার আক্রমণে আর. ডব্লিউ ৮৫—৫২ এর চেয়ে অনেক বেশী সংবেদনশীল।

জমির চরিত্র বলতে এখানে জমির অয়ত্ব ও ক্ষারত্বের কথাই বোঝানো হচ্ছে। সাধারণভাবে জমির মাটির পি. এইচ যেখানে ৬-এর কাছাকাছি থেকে ওপরের দিকে, সেখানে খেতসরিষা ও রাইয়ের চাষ ভাল হবে। কিন্তু যেখানে জমির মাটির পি. এইচ ৫—৫.৫ এর মধ্যে, সেখানে টোরি সরিষার চাষই উপযুক্ত হবে এবং জাত হিসাবে “অগ্রণী” অথবা “কম্পোজিট-৩” এর মধ্যে যে কোন একটি বেছে নেওয়া যাবে। মূলতঃ এই কারণেই দঃ বঙ্গে খেতসরিষা ও রাই এবং উত্তরবঙ্গে টোরি সরিষার চাষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

এতো গেল একক ফসল হিসাবে জাত বাছাই পর্বের কথা। কিন্তু সাথী ফসল হিসাবে রাই-সরিষার চাষ বর্তমানে বেশ জনপ্রিয়। বিশেষ করে গমের সাথে রাই-সরিষার চাষ তো প্রায়শই চোখে পড়ে। এখানেও জাত বাছাই কাজে বিশেষ নজর দিতে হবে। গম সাধারণতঃ অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ থেকে বোনা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে “আর. ডব্লিউ-৮৫—৫২” জাতটি বেছে নেওয়াই ভাল হবে। তবে মনে রাখা দরকার গমের সাথে সাথী ফসল হিসাবে রাই বুনলে গম সারিতে বোনাই বাঞ্ছনীয়। প্রায় ২ সারি গমের পর এক সারি রাই বুনলে গমের ফলনের হেরফের হবে না আবার সাথী

বোনার জল রাই-এর জাতি পোকা দমনের ব্যবস্থাও সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করা যায়। ছিটিয়ে বোনা গমে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না। এ ছাড়া লীতকালীন আখের সাথেও সাথী ফসল হিসাবে সরিষার চাষ করা যেতে পারে। ছ' সারি আখের মধ্যকার্তী অঞ্চলে সরিষার দুটি সারি বুনতে হবে। এক্ষেত্রে “অগ্রণী” “কম্পোজিট-৩” অথবা “বিনয়” নির্বাচন করা যেতে পারে, তবে “বিনয়” এর চেয়ে অল্প দুটি জাত নির্বাচন করা সময়ের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় হবে।

তিসি

অতি অল্প আয়াসেই তিসির চাষ সম্ভব বলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীর কাছে তিসি চাষ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিসির তেল মূলতঃ শিরাজ তেল হলেও পঃ বঙ্গে ভোজ্য তেল হিসাবে তিসির ব্যবহার বড় কম নয়। কতকগুলি স্নেহজাতীয় অম্লের আধিক্যের জন্য অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা এই তেলটিকে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে রায় দিয়েছেন। তবে শিরে ব্যবহারের জন্য এটি অত্যন্ত মূল্যবান। নীচে এই ফসলটির দুটি উচ্চ ফলনশীল জাতের বিস্তারিত পরিচিতি দেওয়া হ'ল :

নীলা : উচ্চতা ৬০—৭০ সে.মি.। ফুলের রং নীল। চ্যাপ্টা চকচকে বাদামী রঙের দানা। পাকতে সময় লাগে ১২৫—১৩০ দিন। হেক্টর

প্রতি ফলন ৮—১০ কু.। প্রতি হাজার বীজের ওজন ৬—৬.৫ গ্রাম। তেলের ভাগ শতকরা ৪০। জাতটিতে তলে পড়া রোগ খুবই কম হয়।

মুক্তা : উচ্চতা ৬০—৭৫ সে.মি. ডাল-পালা চাপা। দানা চ্যাপ্টা, চকচকে বাদামী রঙের। ফুলের রঙ সাদা। ১২৫—১৩০ দিনে পাকে। হেক্টর প্রতি ফলন ১০—১২ কু.। প্রতি হাজার বীজের ওজন ৭—৭.৫ গ্রাম। তেলের ভাগ শতকরা ৩৮—৩৯। জাতটি মরিচা রোগ সহনশীল।

উপরোক্ত দুটি জাতের মধ্যে এঁটেল মাটিতে ধান কাটার পর চাষ দিয়ে অথবা “পয়রা” হিসাবে ধানের জমিতে তিসি বুনতে হলে “নীলা” জাতটি বেছে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আবার বেলমাটি, দোআশ মাটিতে “নীলা” অপেক্ষা “মুক্তার” ফলন ভাল হবে। বিশেষ করে যে সব এলাকায় মরিচা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী সেখানে অবশ্যই “নীলা” অপেক্ষা “মুক্তা”র চাষ যুক্তিযুক্ত হবে।

১৯৭৫-৭৬ সালে তৈলবীজের ফলনের হার ছিল হেক্টর পিছু ৩৯৮ কেজি। উপরোক্ত জাতগুলির আংশিক প্রসারে এই ফলনের হার ১৯৮০-৮১ সালের শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে হেক্টর পিছু ৪৭৭ কেজি। এই জাতগুলির সর্বাঙ্গীন প্রসারে ফলনের হার আরও বাড়ানো সম্ভব হবে বলেই বিশ্বাস।

তৈলবীজের সোকাও তার দুসমন

ডঃ দিলীপ কুমার নাথ

রবি মরসুমের তৈলবীজ বলতে প্রধানতঃ সরষেকেই বোঝায়। ইদানিং এর চাষ বেশ বেড়েছে। সরষে চাষের শুরু থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত কয়েক জাতের পোকা উপদ্রব করে। এখনো পর্যন্ত ওষুধ ছিটানোই পোকা দমনের একমাত্র ভরসা। কিন্তু পোকার ধরণ-ধারণ জানা থাকলে একদিকে যেমন ওষুধের সঠিক ব্যবহার হয় তেমনি অনেকক্ষেত্রে ওষুধের ব্যবহার না করেও কাজ চলে যায়।

কাটুই পোকা

কাটুই পোকা জমির মাটিতে থাকে। হালকা মাটির জমিতে কদাচিৎ হয় এবং তখন এদের প্রাচুর্য্যবে বহু চারাগাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাত্রিবেলা লেদাগুলি গাছের পাতা ও ডাঁটা খায়। লেদাগুলি বড় হয়ে উঠলে সূর্য্য ওঠার আগে চারাগাছকে কাঁচিকাটা করে গোড়ার দিকে কেটে ফেলে এবং গাছের কিছু অংশ মাটির তলায় নিয়ে যায় যাতে দিনের বেলায় খাওয়া চালিয়ে যেতে পারে। তাই আক্রান্ত গাছের কাছাকাছি মাটির অল্প গভীরে বড় আকারের মেটে রঙের চকচকে লেদা খুঁজে পাওয়া যায়। ফসলে একবার মাত্র আক্রমণ করে বলে আক্রান্ত গাছের কাছাকাছি আঙ্গুল দিয়ে মাটি

একটু আলগা করে এদের খুঁজে মেরে ফেলা চলে। তবে কাজটি সকালবেলা সারতে পারলে ভাল।

করাত পোকা

সরষের চারা অবস্থায় গাঢ় নীল রঙের লেদা সকাল ও সন্ধ্যাবেলা পাতায় ও ডাঁটায় দেখা যায়। পোকা পাতার একধার থেকে খাওয়া শুরু করে। একটি পাতা খেয়ে অল্প পাতায় যায়। এমনি করে চারা অবস্থায় গাছকে ছাড়া করে দেয়। গাছ একটু নাড়া খেলে পোকা ভয় পেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে গাছ থেকে তলায় বারে পড়ে এবং মরার ভাণ করে। এদের করাত পোকা বলে, কারণ মাছির মত দেখতে পূর্ণাঙ্গ পোকা করাতের মত স্ত্রী অঙ্গ দিয়ে চারার পাতার পর্দার ভিতর ডিম পাড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পোকা কম সংখ্যায় থাকায় পোকাগুলিকে হাত দিয়ে টুকে মেরে ফেলা চলে। সূর্য্যের উন্টোদিকে দাঁড়িয়ে গাছের লেভেলে চোখ রাখলে পোকাগুলি নজরে পড়বে। ঠিক সময় গাছ পাতলা করে জমি নিড়ান দিলেও পোকাকার উপদ্রব থাকে না। জমিতে কয়েকটি ঝোপ পুঁতে দিলে পাখীরাও এর ব্যবস্থা করে। ওষুধ ছিটানোর একান্ত দরকার হলে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি গুঁড়ো ছিটালেই চলবে।

পাতা-জড়ানো পোকা

অজকাল এই লেদা পোকা সরষে গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় কোথাও কোথাও বেশ দেখা যাচ্ছে। খেত সরষেতেই বেশী নজরে পড়ে। তবে সারা মাঠ জুড়ে ফসলে ক্ষতি কখনো এরা করতে পারে না। এখানে ওখানে খুব বেশী হলে ৩-৪টি গাছ নিয়ে চাক চাক করে ক্ষেতে পড়ে। লেদা ২-৪টির দল বেঁধে পাতা, ডাঁটা, ফুল ও কুঁড়ি খেয়ে জাল বুনে গাছকে হতভীত করে দেয়। এদের দমনের জন্য সারা মাঠে ওষুধ দেওয়া লাভজনক হয় না। বেশী আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলেও চলে। নিরুপায় হয়ে ওষুধ ছিটাতে হলে আক্রান্ত জায়গাগুলোতে দিলেই যথেষ্ট। স্প্রেয়ার দিয়ে স্পর্শবিষ যথা : বি-এইচ-সি ৫০% জলে গোলা ওষুধ লিটার প্রতি ৪ গ্রাম বা মিথাইল পারাথিয়ন গোত্রীয় ওষুধ (যেমন : মেটাসিড ৫০, প্যারোটম ৫০, ইত্যাদি) লিটারে ১ মি.লি. বা কুইনেলফস গোত্রীয় ওষুধ (যেমন : ইকেলাক্স ২৫, স্কুইন ২৫ ইত্যাদি) লিটারে ২ মি.লি. বা ফেনথিয়ন গোত্রীয় ওষুধ (যেমন : লেবেসিড ৮০) লিটারে ০.৭৫ মি.লি. বা ডাইক্লোরডস গোত্রীয় ওষুধ (যেমন : হুভান ৭৬, ভেপোনা ৭৬) লিটারে ০.৭৫ মি.লি. স্প্রে করতে হবে।

জাব বা (মোড়ি) পোকা

এরাই সরষের প্রধান কীটশত্রু। পোঁষের শেষে ও মাঘের প্রথমদিকে সরষের গাছগুলি যখন ফুল দেওয়া শেষ করে এনেছে এবং শুঁটিও ধরেছে, তখন ডগার দিকে ডাঁটায় ধূসর হলুদ-সবুজে মেশানো রঙের ছোট ছোট অসংখ্য পোকা

গাছে লেপটে থাকে এবং নুঁচের মত মুখ দিয়ে গাছের রস সমানে শুষতে থাকে। এদের বৈশিষ্ট্য হল : এরা ডিম পারে না, নিরবিচ্ছিন্নভাবে খাচ্চা পাড়তে থাকে। যার জন্য কোথাও থেকে পাখাওয়ালা কয়েকটি পোকা উড়ে জমিতে পড়লে অতি অল্প সময়ে বেশ সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলে। আকাশ একটু মেঘলা থাকলে তো কথাই নেই। ফুলের গোড়া থেকে আস্তে আস্তে এরা সমস্ত গাছ ছেয়ে ফেলে। মাঘের মাঝ বরাবর সারা গাছে এই জাব পোকা এমনভাবে ছেয়ে থাকে যে গাছের গায়ে হাত দেওয়া দায়। পোকার আক্রমণে গাছ ধীরে ধীরে শুকোতে শুরু করে, বহু কুঁড়ি ফোটে না ও আক্রান্ত ডাল রসহীন হয়ে গোলাপী রঙের হয়ে যায়। এছাড়া আরও এক উপদ্রব হচ্ছে : এই পোকাগুলির গা থেকে মধুর মত চটচটে আঠালো রস বের হয়, যার উপর এক রকম কাল ছত্রাক বাসা বাঁধে। এ ছত্রাকও আস্তে আস্তে বেড়ে আক্রান্ত জায়গা ছেয়ে ফেলে, যার ফলে গাছটি কালচে হয়ে যায়।

সরষে চাষ থেকে ভাল ফলন পেতে হলে এই জাব পোকা দমনের জন্য ওষুধ স্প্রে করার দিকে নজর দিতে হবে। বিশেষ করে যাদের নানা কারণে বীজ বুনতে দেরি হয়ে যায়। জলে গোলা সর্বাঙ্গবাহী ওষুধ সকাল ১০টার আগে বা বিকেল ৩টার পর হাইড্রল্যুম স্প্রেয়ার (যথা : মারুতি) দিয়ে একরে ৪০০ লিটার জলসহ স্প্রে করতে হবে। ওষুধ নির্বাচন, পরিমাণ, ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য নিচে সারণী দেওয়া হল।

একবার ঠিকমত ওষুধ ছিটিয়ে ছই সপ্তাহ নিশ্চিত হওয়া যায়। চড়া রোদে বা ঝড়ে

হাওয়ায় বা ফসল কাটার ২৫ দিনের মধ্যে ওষুধ ছিটানো উচিত নয়। বিশেষতঃ স্প্রে করলে

আমরা যে ধরনের সরষের জাত চাষ করি তাতে ছইবারের বেশী ওষুধ লাগবার কথা নয়।

ওষুধের নাম	গোত্র	একরে ওষুধের পরিমাণ	বিষাক্ততা (অন্তপ্রাণী)
মেটাসিস্টক্স ২৫ ই.সি.	মিথাইল ডিমিটন	৮০০ মি.লি.	মাঝারি (হলুদ)
হেক্সাসিস্টক্স ২৫ ই.সি.	ঐ	ঐ	ঐ
হুভাক্রন ৩৬ ই.সি.	মনোক্রোটোফস্	৬০০ মি.লি.	উচ্চ (লাল)
মনোসিল ৩৬ ই.সি.	ঐ	ঐ	ঐ
করোফস্ ৩৬ ই.সি.	ঐ	ঐ	ঐ
ইকাটিন ২৫ ই.সি.	থাওমিটন	৮০০ মি.লি.	ঐ
রোগর ৩০ ই.সি.	ডাইমিথোয়েট	৭০০ মি.লি.	মাঝারি (হলুদ)
সাইগন ৩০ ই.সি.	ঐ	ঐ	ঐ
তারি ৯০৯, ৩০ ই.সি.	ঐ	ঐ	ঐ
ডেমিক্রন ৮৫ এস.সি.	ফস্ফামিডন	২৪০ মি.লি.	উচ্চ (লাল)
সুমিডন ৮৫ এস.সি.	ঐ	ঐ	ঐ

ছিদ্রাল লেদা পোকা

ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের লেদা পোকা গাছের ফলস্ব অবস্থায় ফুলের কুঁড়ি ও শূঁটিকে ছিদ্র করতে দেখা যায়। শূঁটিতে ছিদ্র করার দরুণ অপুষ্টি বীজ ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং শূঁটটি কুঁকড়িয়ে যায়। এই পোকা তেমন বেশী সংখ্যায় সচরাচর দেখা যায় না। লেদা পোকাটি খুব ছুটফটে, ধরতে গেলে লাফ দেয়। এদের মুককীট ধূসর পাতলা চাদরের মধ্যে গাছের পাতা, কাণ্ড বা শূঁটিতে দেখা যায়। মথও ছোট, কোথাও বসলে পিঠের উপর হীরার মত চৌকোনা দাগ দেখা যায়, তাই এদের 'ডায়মণ্ড ব্যাক মথ' বলে। জাবপোকা দমনের ওষুধেই এই পোকা দমন হয়।

শূঁটের ছার পোকা

ছার পোকাক মত শুষ্ক খায় এক রকম পোকা। পাকা ফসলে পড়ে শূঁটের গা দিয়ে ভিতরের বীজের রস শুষে খেয়ে নেয়। এতে বীজ ফাঁপা হয়ে যায়। ফসল কেটে জমিতেই জাঁক দেওয়া হলে তখন যদি ফসল ভিজ়ে থাকে বা সে সময় হঠাৎ বৃষ্টি হয় তবে কখনো কখনো এই পোকা মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। যেখানে বাড়াবাড়ি হয়, কাটা ফসল ছড়িয়ে রোদে শুকিয়েও পোকা ছাড়ানো যায় না, সেখানে কারবারিল (যথা : সেভিন ৫০%) লিটারে ২.৫ গ্রাম বা ম্যালাথিয়ন (যথা : সাইথিয়ন ৫০%) লিটারে ২ মি.লি. হারে ফসলের উপর ও আশেপাশে স্প্রে করুন।

উন্নত পদ্ধতিতে গম চাষ করে ফলন বাড়ান

- পশ্চিমবঙ্গের সমতল ও কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে এইচ. পি. ১২০৯, সোনালিকা ও ইউ পি-২৬২ জাতের গম বুনুন।
- প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে থাইরাম বা ইথাইল মারকারি ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকারি এ্যাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন।
- একর প্রতি ৮-১০ গাড়ী গোবর বা আবর্জনা সার দিন। মাটি পরীক্ষা করানো না থাকলে একর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ দিন। পুরো ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন শেষ চাষের সময় দিন, বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের সময় দিন।
- সারিতে বীজ বুনুন। একরে ৪০-৫০ কেজি বীজ লাগবে।
- গমের চারবার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়। বীজ বোনার ১৮-২১ দিন, ৪০-৪৫ দিন, ৭০-৭৫ দিন এবং ৯০-৯৫ দিনের মাথায় সেচ দিন।
- সময়মত শ্রম রক্ষা করুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

পশ্চিমবঙ্গে তৈলবীজ

ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত

ভোজ্যতেলের অভাব পশ্চিমবঙ্গে নতুন কোনও কথা নয়। বছরকাল থেকেই এ অভাব অনুভব করে আসা হচ্ছে। কারণ মুখ্যতঃ সরষের তেলের প্রতি আকর্ষণ। সরষে শীতকাল ছাড়া হয় না, আর এই সময় অশ্রান্ত ফসলের তুলনায় রাই বা সরষের চাষ গত কয়েক বছর আগেও কম অর্থকরী ছিলো। ফলে সরষের জগু অল্প রাজ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্য যাট দশকে সরষের তেলের ঘাটতি বিশেষ প্রকট হয়ে দেখা দেওয়ায় সহরে ও গ্রামাঞ্চলে অল্প বিকল্প, যেমন তিলতেল, বাদাম তেল ইত্যাদির ব্যবহার হচ্ছে। পরবর্তী কালে কুসুম, সূর্যমুখী ইত্যাদি তেলের ব্যবহারও প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু সরষের তেলের তুলনায় এই পরিমাণ নগণ্য এবং এখনও পশ্চিমবঙ্গবাসী রান্নার কাজে প্রধানতঃ সরষের তেলই ব্যবহার করে থাকেন।

সরষে শীতকালেই হয় এবং যতটা ও যতদিন ঠাণ্ডা থাকলে রাই সরষের ফলন ভালো হতে পারে তা পশ্চিমবঙ্গে নেই। ফলে সমস্যার সমাধান দ্রুতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা), কৃষি অধিকার,
পশ্চিমবঙ্গ।

ঘাটতির পরিমাণ

যেসব বিভিন্ন তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয় তার মধ্যে তিল ও সরষেই রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। গত দশ বছরে ফলনের পরিমাণ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে ১৯৮৩-৮৪ সালেই সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হয়েছিল। তিল, সরষে ও অশ্রান্ত তৈলবীজ মিলিয়ে (তিসি ছাড়া) ১৭৭ হাজার টন। এই তথ্য ১নং সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

খাচ্চা বিশারদদের মতে রোজ মাথাপিছু ৫৬ গ্রাম স্নেহপদার্থের প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এই পরিমাণ স্নেহপদার্থ একমাত্র পশ্চিমী ধনী দেশবাসীরাই ব্যবহার করেন। এই সমস্ত দেশে মাথাপিছু ভোজ্যতেলের পরিমাণ দৈনিক ৫৪ গ্রাম হিসেবে বছরে ২০ কেজি। অবশ্য এই হিসেবে সমস্ত স্নেহজাত পদার্থই ধরা আছে, যেমন দুধ, মাখন ইত্যাদি।

আমাদের দেশে দুধ, মাখন, ঘি ইত্যাদি স্নেহজাত পদার্থেরও যথেষ্ট অভাব আছে। আর পশ্চিমী ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যতটা স্নেহজাত পদার্থ সহজপাচ্য, এদেশে ততটা নয়। অভাব হলেও

কিছু কিছু দুধ, ঘি, মাখন অনেকেই খান। তাই মাথাপিছু রোজ ১৬ গ্রাম হিসেবে বছরে ৬ কেজি ভোজ্য তেলের প্রয়োজন বলে ধরা হয়।

তৈলবীজের (তিল ও রাই সরষে) ১৭৭ হাজার টন হলে, মোট তেলের পরিমাণ হবে ৫৯০০০ টন। এইভাবে মাথাপিছু মাত্র ১'৩ কেজি তেলের সংস্থান হয়। অর্থাৎ প্রয়োজনের শতকরা ২০ ভাগ মাত্র এ রাজ্যে উৎপাদিত হয়।

একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না যে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাকী শতকরা ৮০ ভাগ ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব। তবে প্রচেষ্টা যদি সর্বাঙ্গিক হয় তবে এই ঘাটতি অনেকাংশেই মেটানো যেতে পারে।

সারণী নং ১ এ পরিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যাবে তুলনামূলক ভাবে তিল ও সরষের মধ্যে তিলেরই হেক্টর প্রতি ফলন বেশী। অথচ এমন একটি তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পছন্দ করেন যার হেক্টর প্রতি ফলন, বেশ কয়েকটি কারণে এ রাজ্যে কম। এই কারণগুলোর কয়েকটা অবশ্য যত্ন সহকারে চাষ করলে দূর করা যায়। কিন্তু বাকী কয়েকটা প্রকৃতির খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভরশীল।

নিম্নফলনের কারণ ও তা দূর করার উপায়

পশ্চিমবঙ্গে যতটা আয়তনে তৈলবীজের চাষ হয় তার শতকরা ৫০ ভাগই সরষে। তাই সরষের চাষে যেসব কারণে ফলন কম হয় তার আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ :

(১) হেক্টর প্রতি পূর্ণাপ্ত সংখ্যক গাছের অভাব—

সরষের চাষে ভালভাবে জমি তৈরী না করা,

বোনার সময় মাটিতে যথেষ্ট রসের অভাব ও সর্বত্র ভালো গুণমানের ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার না করার ফলে ফসলে যথেষ্ট সংখ্যক গাছ থাকে না। সেজন্য ফলনও কম হয়। মাটি বুঝিয়ে করে তৈরী করে যথেষ্ট রস থাকাকালীন বা প্রয়োজনবোধে একটি হাক্কা সেচ প্রয়োগ করে ভালো অংকুরোদগমকম বীজ ব্যবহার করে নিম্নফলনের এই কারণ দূর হবে।

(২) শস্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা—

সরষের প্রধান কীটশত্রু 'জাবপোকা'। সাধারণতঃ এই পোকার আক্রমণ যখন ফসলে ছড়িয়ে পড়ে তখনই আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। 'জাব' এমনই একটি পোকা যা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কাজেই আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তখনই নিতে হবে যখন ফসলের বেশী সংখ্যক গাছে কয়েকটি করে ডানাওয়ালা পোকা দেখা যাবে। এই অবস্থায় প্রথম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলে আক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে না, বা আক্রমণ সার্থকভাবে দমন করা অসম্ভব হবে না।

(৩) পূর্ণাপ্ত পরিমাণ সার ও সেচের ব্যবহার—

সরষের চাষ, রবি মরসুমে অল্প ফসল চাষের চেয়ে কোনও অংশে কম অর্থকরী নয়। উন্নত চাষ পদ্ধতির প্রয়োগে খরচের প্রতি টাকায় ১'৫০ থেকে ২'০০ টাকার পরিমাণ ফলন পাওয়া অসম্ভব নয়।

ফুল আসার মুখে একটি ও দানা বাঁধার সময় আর একটি—কমপক্ষে এই দুটি সেচ অবশ্য প্রয়োগ করতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে

বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯১

পরিমাণমত সার প্রয়োগও অবশ্য করণীয়।

মুখ্যতঃ এই তিনটি কারণেই ফলন কম হয়। এই তিনটি কারণই যত্ন সহকারে চাষে সহজেই দূর করা সম্ভব ও ফলন বৃদ্ধিও সম্ভব।

কম ঠাণ্ডা, ফসল পাকবার সময় অতিরিক্তি ও ফুল ফোটান সময় ক্রমাগত মেঘলা আবহাওয়া—এই কারণগুলি দূর করা মানুষের হাত নেই। কিন্তু উপরোক্ত তিনটি কারণ দূর করতে সচেষ্ট হলে কম ফলনজনিত ক্ষতির অনেকটাই বেশী ফলনের মাধ্যমে পুষিয়ে যাবে।

এসব কারণ ছাড়াও বলাই বাহুল্য অধিক ফলনশীল উন্নত জাতের ব্যবহারে মোট ফলন বৃদ্ধি পাবে। পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে শুধুমাত্র উন্নত জাতের ব্যবহারে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী ফলন পাওয়া যেতে পারে। রাই ও সরষের বেশ কয়েকটি উন্নত জাতই আছে যা থেকে সঠিক জাত বেছে নেওয়া যেতে পারে।

১নং সারণী থেকে দেখা যাবে তিল চাষ অনেক বেড়েছে এবং প্রায় প্রতি বছরই বেড়ে চলেছে। এর প্রধান কারণ যে মরসুমে তিল চাষ হয়, সে সময়টায় প্রাকৃতিক দুর্ভোগের আশংকা অনেকটা কম। এই ফসলের হেক্টর প্রতি ফলনের হারও সরষের চেয়ে বেশী। আরও বেশী হওয়া সম্ভব যদি উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা হয় ও হেক্টর প্রতি পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ রাখার বিষয়ে সযত্ন হওয়া যায়। সাধারণতঃ দক্ষিণবঙ্গে আলু চাষের পরই তিল চাষ হয়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে অম্মাছ সাধারণ জমিতেও

তিলের চাষ শুরু হয়েছে। জমিতে অল্প ভাবের জন্ম দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে তিলের ফলন কম কেননা গাছের স্বাভাবিক ষাড় হয় না। তবে ব্যাপক হারে চাষ করলে মোট তৈলবীজের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ঘাটতির পরিমাণও কমে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের তৈলচিত্রে তিল ও সরষের একটি প্রধান ভূমিকা। একমাত্র যত্ন সহকারে চাষই বর্তমান ঘাটতি অনেকাংশে কমাতে পারে।

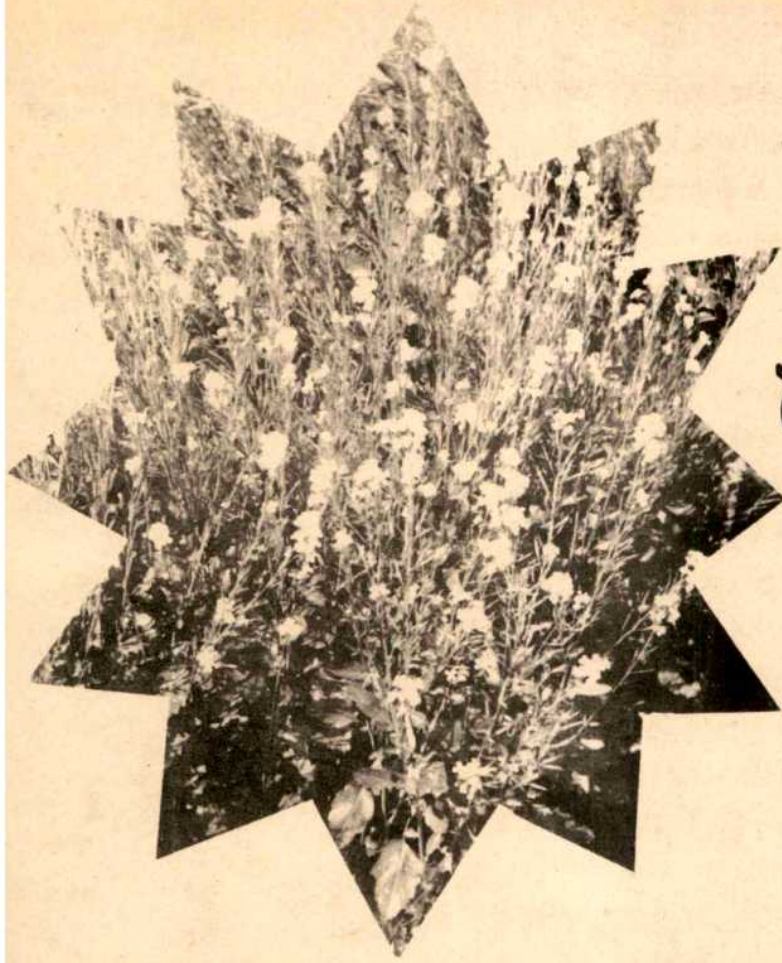
সারণী নং ১

১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮৩-৮৪ সাল পর্যন্ত
পশ্চিমবঙ্গে মোট তৈলবীজের আয়তন
উৎপাদন ও ফলনের হার

মোট (তিসি ছাড়া)

বছর	আয়তন	উৎপাদন	ফলন
১৯৭৪-৭৫	১৯৬'০০	৭৬'১	৩৮৮
১৯৭৫-৭৬	১৯৯'০০	৭৩'২	৩৬৮
১৯৭৬-৭৭	১৫৩'৫	৬৩'৫	৪১৪
১৯৭৭-৭৮	২১৪'৬	৯৬'৬	৪৫০
১৯৭৮-৭৯	২৩৯'৪	৯৮'০	৪০৯
১৯৭৯-৮০	২২৭'৪	৯৯'১	৪৩৬
১৯৮০-৮১	৩১৪'৭	১৬০'২	৫০৯
১৯৮১-৮২	৩৪৭'০	১৭৫'৬	৫০৬
১৯৮২-৮৩	৩৭৮'৯	১৭৫'০	৪৮৮
১৯৮৩-৮৪	৩৫৯'৬	১৯৫'৫	৫৪৪
গড়	—	—	—

আয়তন ১০০০ হেক্টর, উৎপাদন ১০০০ মে: টন,
ফলন হেক্টর প্রতি কেজি।



তৈলবীজের রোগ ও তার দমন

বীরেন্দ্র নাথ বাগচী

পশ্চিমবঙ্গ তৈলবীজে ঘাটতি রাজ্য। এই ঘাটতি পূরনের জন্তু প্রতি বছরই বাইরে থেকে তৈলবীজ আমদানি করতে হয়। বর্তমানে এই চাহিদা মেটাবার জন্তু তৈলবীজের উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এজন্তু নানাবিধ কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে যার অগ্রতম হলো রোগের হাত থেকে তৈলবীজের রক্ষা।

প্রধান কয়েকটি তৈলবীজের ক্ষতিকারক রোগের বিবরণ ও তার প্রতিকারের উপায় এই কৃষি রোগতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রীয় ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র, বহরমপুর।

প্রবন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) সরষে (টোরি, রাই সরষে, হলদে সরষে)

সরষের ধসা রোগ (Alternaria blight), সাদা মরচে রোগ (White rust) ও ডাউনি মিলডিউ (Downy mildew) রোগই প্রধান।

(ক) ধসা রোগ (Alternaria blight—*Alternaria brassicae*)

রাই এবং হলদে সরষে এই রোগের

আক্রমণ খুব বেশী দেখা যায়। টোরিয়ায় এই রোগের আক্রমণ খুব বেশী দেখা যায় না। কারণ টোরিয়া আগে বোনা হয় ও তাড়াতাড়ি পাকার জন্য এই রোগ এড়াতে পারে। এই মারাত্মক রোগ ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে দেখা যায় ও জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এর প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়ে। আর্দ্র ও গরম আবহাওয়া, মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও রোদ এই রোগের প্রকোপ বিস্তারে সাহায্য করে। সরষের চারায় এই রোগ দেখা দিলে চারাগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায় এবং পরের দিকে পাতায় ও ফলে এই রোগের আক্রমণে ফলনের খুবই ক্ষতি হয়। সরষে গাছের প্রতিটি সবুজ অংশ এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগের আক্রমণে, বীজপত্র (Cotyledonary leaves) ছোট ছোট ফিকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় যা ক্রমশঃ কালচে রং ধারণ করে। কালচে দাগের ওপর অবস্থিত জীবাণু ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে ও গাছের অগ্রাঙ্গ অংশ আক্রান্ত হয়। বয়স্ক গাছের পাতার উপরের দাগগুলি কালচে বাদামী রঙের হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় অনুরূপ দাগ ডাঁটায় ও ফলের গায়ে দেখা যায়।

এই রোগ কিছুটা বীজবাহিত। তাই বীজ শোধন করে অবশ্যই বোনা উচিত। বীজশোধক ওষুধ যেমন ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) অথবা পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান দিয়ে (১ কেজি বীজ প্রতি ৩ গ্রাম ওষুধের জন্য) শোধন করতে হবে। সুস্থ ও নীরোগ গাছের বীজ ব্যবহার করা উচিত। পরিচ্ছন্ন চাষের

প্রতি নজর দেওয়া দরকার। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগেই অথবা সাথে সাথেই ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) এক (১) লিটার জলে আড়াই (২২) গ্রাম গুলে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজনে ১৫—২০ দিন অন্তর আরও ছবার স্প্রে করতে হবে। রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির ব্যবহার রোগ দমনের পক্ষে সাহায্যকর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের বহরমপুরে অবস্থিত তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রে রাই এবং হলদে সরষের বিভিন্ন জাতের মধ্যে কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধক/সহনশীল জাত নির্বাচন করা সম্ভব হয়েছে। যথা রাই সরষে আর-সি ৭৮১, ওয়াই-আর-টি ৩ ও হলদে সরষে ওয়াই-এস-আই-কে ৪, ডি-ওয়াই-এস ১, আই-বি ১৯৪৮, আই-বি ১৯৩১ ইত্যাদি।

(খ) সাদা মরচে রোগ (White rust—*Albugo candida*)

টোরি ও হলদে সরষের চেয়ে রাই সরষেতে এই রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ বেশী। সরষে গাছ বিভিন্ন বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হয়। ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এই রোগ সাধারণতঃ দেখা দিতে শুরু করে। ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া এই রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। গাছের শিকড় ছাড়া সর্বত্রই এই রোগ দেখা দেয়। প্রথম অবস্থায় এই রোগের আক্রমণে পাতার তলার দিকে ঘিয়ে রঙের বিভিন্ন আকারের দাগ দেখা যায় যা পরে একে অপরের সঙ্গে মিশে বড় আকার ধারণ করে। এই দাগগুলি প্রথম অবস্থায় পাতার epidermis

বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯১

এর তলায় থাকে যা পরে epidermis কেটে যাওয়ার সাথে পাতার গায়ে ছোট ছোট গোলাকার সাদা তুলোর মত দেখায়। রোগের প্রকোপ বেশী হলে পাতার আকার ছোট হয়ে যায়। এই রোগের দ্বারা ফুলও আক্রান্ত হয়। যার জন্য ফুল সম্পূর্ণ বিকৃত আকার ধারণ করে। চারা অবস্থায় এই রোগ দেখা দিলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে ও ফুল আক্রান্ত হলে ফলনের খুবই ক্ষতি হয়।

এই রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে সরষে ওঠার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশ জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগের প্রকোপ বেশী হলে শস্য পর্যায়ে একই জমিতে অন্ততঃ তিন বছর সরষে লাগান উচিত নয়। রোগাক্রান্ত গাছের বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে বীজ শোধক ওষুধ যথা ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) অথবা পারাঘটিত ওষুধ যথা মনোসান দিয়ে (১ কেজি বীজ প্রতি ৩ গ্রাম ওষুধ) বীজ শোধন করতে হবে। রোগের আক্রমণ শুরু হওয়ার মুখে কপার অস্লিক্রোরাইড (ব্রাইটস্ক, কুপরাসল) ১ লিটার জলে ৪ (চার) গ্রাম গুলে স্প্রে করতে হবে অথবা ডাইথেন এম-৪৫, ১ (এক) লিটার জলে ২৫ (আড়াই) গ্রাম মিশ্রণ স্প্রে করা উচিত।

(গ) ডাউনি মিলডিউ (Downy mildew—*Perenospora brassicae*)

পশ্চিমবঙ্গে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশী নয় তবুও প্রতি বছর চারা অবস্থায় সরষে গাছ এই রোগে অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এই রোগ ও সাদা মরচে রোগ একই সময় আক্রান্ত গাছের পাতায় দেখা যায় ও যার ফলে চারা গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর্জ ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। রোগের আক্রমণে গাছের পাতার তলায় ছোট ছোট ফিকে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ঐ জায়গায় পাতার ওপরের দিকে তলপেটে সাদা দাগ দেখা যায়। অনুকূল আবহাওয়ায় পাতার তলার দাগ একে অপরের সাথে মিশে বড় আকার ধারণ করে, যার ফলে পাতা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়। শুকনো গরম আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ কমে যায়। এই রোগের জীবাণু (oospore) মাটিতে বেশ কিছুকাল জীবিত থাকতে পারে ও বীজের গায়েও রোগের জীবাণু থাকা সম্ভব।

এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে পরিচ্ছন্ন চাষের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। ফসল তোলার পর গাছের পাতা ও অগাছ অংশ জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা ও আগাছা দমন করা দরকার। শস্য পর্যায়ে রোগের প্রকোপ দমন করা সম্ভব। সুস্থ ও নীরোগ গাছের বীজ ব্যবহার করা উচিত। বীজ বোনার আগে বীজ শোধন অবশ্যই করণীয়। প্রয়োজনে কপার অস্লিক্রোরাইড (ব্রাইটস্ক, ফাইটোলন, কুপরাসল) এক (১) লিটার জলে চার (৪) গ্রাম গুলে স্প্রে করা যেতে পারে।

(২) তিল

তিলের কয়েকটি ক্ষতিকারক রোগের মধ্যে গোড়া ও শিকড় পচা, ফাইলোডী ও বাদামী দাগ ধরা রোগই প্রধান।

(ক) গোড়া ও শিকড় পচা রোগ (Root rot & stem rot—*Macrophomina phaseolina*)

এই রোগের ছত্রাক মাটির তলায় বেশ কয়েক বছর জীবিত থাকতে পারে। অগ্ন্যাণ্ড রোগের তুলনায় ভিলের এটি সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। চারা ও বয়স্ক গাছেও এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণে চারাগাছগুলি দুর্বল হয়ে যায় ও অবশেষে মারা যায়। বয়স্ক গাছের শিকড় পচে যায় ও গাছের মাটি সংলগ্ন অংশে কাল দাগ দেখা দেয়, পরে ঐ অংশ পচে যায় ও আক্রান্ত গাছ গোড়া থেকে ভেঙ্গে পড়ে। গরম, স্রুঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এই রোগের লক্ষণ গোড়া থেকে ক্রমশঃ উগার দিকে এগিয়ে যায় এবং অবশেষে ফল আক্রান্ত হতে পারে, যার ফলে ফলন কমে যায়। আক্রান্ত গাছের বীজও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

এই রোগ বীজবাহিত তাই বীজ বোনার আগে অবশ্যই বীজ শোধন করা উচিত। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য তিন (৩) গ্রাম পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান অথবা কুইনটোজিন (ব্রাসিকল ৭৫) ব্যবহার করা যেতে পারে। রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির ব্যবহারে এই রোগ দমন করা সম্ভব। বি-৬৭ নামে প্রজাতির এই রোগ প্রতিরোধ করার কিছু ক্ষমতা আছে।

(খ) ফাইলোডী (Phyllody)

ফাইলোডী এক ধরনের কুটে রোগ যা শ্যামা পোকাকার (*Deltocephalus sp.*) মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রামক পোকা সারা বছরই কোন না

কোন গাছে থাকে। তাই তিল ছাড়া অগ্ন্যাণ্ড গাছেও এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ ফুল আসার মুখে অর্থাৎ জুন মাস থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে দেখা যায় যখন ফুলের বদলে ফুলের জায়গায় ছোট ছোট পাতা বার হয়। কাণ্ড চ্যাপটা হয়ে যায় ও কাণ্ড পর্বগুলি (internode) ছোট হয়ে যায়।

সংক্রামক পোকা দমনের মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার কিছুটা দমন করা সম্ভব। এরজন্য মেটাসিসটক্স এক (১) মিলিলিটার, এক (১) লিটার জলে অথবা দেড় (১২) মিলিলিটার থায়োডান ৩৫ ইসি এক (১) লিটার জলে মিশ্রণ করে স্প্রে করা যেতে পারে। আক্রান্ত গাছ ও মাঠে আগাছা দেখা মাত্র তুল নষ্ট করে ফেলা উচিত।

(গ) বাদামী দাগ ধরা রোগ (Leaf spot —*Cucospora sesami*)

ফুল ধরার মুখে এই রোগ সাধারণতঃ চোখে পড়ে। এই রোগের আক্রমণে প্রথমদিকে পাতার ওপর ছোট ছোট ফিকে বাদামী রঙের দাগ দেখতে পাওয়া যায়, যা ক্রমশঃ আকারে বড় ও গাঢ় বাদামী রঙে পরিবর্তিত হয়। পরে এই দাগ একে অপরের সাথে মিশে যায় যার ফলে পাতার অনেকখানি অংশ শুকিয়ে যায়। ফল এবং বীজও এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।

এই রোগ বীজ বাহিত। তাই বীজ বোনার আগে বীজ শোধন করা প্রয়োজন। বীজ শোধনের জন্য বীজ শোধক ওষুধ যথা মনোসান দিয়ে (১ কেজি বীজ প্রতি তিন গ্রাম ওষুধ)

বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯১

শোধন করতে হবে। পাতায় দাগ দেখা দিলে ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) (০.২% মিশ্রণ) অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড (০.৪% মিশ্রণ) স্প্রে করা উচিত।

(৩) তিসি

তিসির মরিচা রোগ, বাদামী দাগ ধরা ও ঢলে পড়া রোগই প্রধান।

(ক) মরিচা রোগ (Rust—*Melampsora lini*)

বয়স্ক গাছ এই রোগের দ্বারা সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়ে থাকে। জালুয়ারী মাসের শেষে ও ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমদিকে এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতায় অজস্র মরিচা রঙের গুটি দাগ দেখতে পাওয়া যায় যা ক্রমশঃ গোটা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। ডাঁটার উপরেও লম্বা কাল দাগ পড়তে পারে। রোগের আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে ও ফলন কমে যায়।

রোগ প্রতিরোধক / সহনশীল প্রজাতির ব্যবহারই এই রোগ দমনের সহজ উপায়। এই রোগ সহনশীল উন্নত জাতের প্রজাতি 'মুক্তা'। রোগ দমনের জন্য বেনলেট ৫০ (১ লিটার জলে ১ গ্রাম) স্প্রে করা যেতে পারে।

(খ) বাদামী দাগ ধরা রোগ (Leaf spot—*Alternaria lini*)

এই রোগের আক্রমণে প্রথমে কচি পাতায় বাদামী রঙের দাগ পড়ে যা পরে কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এবং ফুলেও এই রোগের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা শুকিয়ে গুটিয়ে যায় ও শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত কুঁড়িও সহজেই ঝরে পড়ে।

এই রোগ বীজ বাহিত তাই শোধন করে বোনা উচিত। শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজ তিন (৩) গ্রাম পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান দিয়ে শোধন করতে হবে। অল্পকাল মাত্রায় ডাইথেন এম-৪৫ ব্যবহার করা যেতে পারে। জালুয়ারী মাসের গোড়াতেই ম্যানকোজেব (ডাইথেন এম-৪৫) (০.২% মিশ্রণ) স্প্রে করা উচিত ও ১৫—২০ দিন পরে আর একবার স্প্রে করলে এই রোগ কিছুটা দমন করা সম্ভব।

(গ) ঢলে পড়া রোগ (Wilt—*Fusarium lini*)

এই রোগের ছত্রাক মাটির তলায় বেশ কিছু বছর সজীব থাকে ও গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে। আক্রমণের কয়েকদিন পরেই এই রোগের লক্ষণ চোখে পড়ে। এই রোগ দেখা দিলে গাছ ঢলে পড়ে ও অবশেষে শুকিয়ে যায়। ফুল ধরার মুখেই গাছ সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়।

এই রোগ দমনের প্রকৃষ্ট উপায় সহনশীল জাতের ব্যবহার।

(৪) কুসুম

কুসুমের বাদামী দাগ ধরা ও মরিচা রোগই প্রধান।

(ক) বাদামী দাগ ধরা রোগ (Leaf spot—*Alternaria carthami*)

এই রোগের আক্রমণে পাতায় গোলাকার বাদামী রঙের দাগ পড়ে যা ক্রমশঃ অগাছ পাতাতেও ছড়িয়ে পড়ে। অল্পকাল আবহাওয়ায় এই বাদামী দাগগুলি একে অপরের সাথে মিশে যায় যার ফলে পাতা শুকিয়ে যায়। এই রোগের

ব্যাপক আক্রমণে কাণ্ড ও ফুল আক্রান্ত হতে পারে ও ফুল শুকিয়ে যায়।

এই রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে বীজ শোধন করে বোনা উচিত। পারাঘটিত ওষুধ যথা মনোসান অথবা ম্যানকো-জেব যথা ডাইথেন এম-৪৫ দিয়ে (১ কেজি বীজ প্রতি ৩ গ্রাম ওষুধ) শোধন করা দরকার। রোগ শুরু হওয়ার মুখে কপার অক্সিক্লোরাইড (ব্রাইটক্স, ফাইটোলন, কুপরাসল) এক লিটার জলে চার গ্রাম গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। ১৫—২০ দিন পরে আর একবার স্প্রে করা উচিত।

(খ) মরিচা রোগ (Rust—*Puccinia carthami*)

অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এই রোগের আক্রমণ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগের প্রকোপ ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাস নাগাদ বাড়ে। এই রোগের আক্রমণে পাতায় বাদামী রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো দাগ পড়ে যা ক্রমশঃ বাড়ে ও শেষের দিকে কালচে হয়ে যায়। গাছের প্রতিটি অংশ এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। চারা অবস্থায় এই রোগ দেখা দিলে চারাগাছ মরে যায়। এই রোগ বীজবাহিত তাই বীজ বোনার আগে ব্যাভিষ্টিন বা বেনলেট দিয়ে (১ কিলোগ্রাম বীজে ৩ গ্রাম ওষুধ) শোধন করা উচিত। অগ্ণথায় পারাঘটিত ওষুধ যথা মনোসান ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৫) চীনাবাদাম

চীনাবাদামের কয়েকটি মারাত্মক রোগ হয় যেমন টিক্কা, মরচে রোগ, শিকড় ও গোড়া পচা

রোগ, গুচ্ছ রোগ (ভাইরাস)।

(ক) টিক্কা রোগ (Tikka—*Cucospora pusonata, cucospora arachidicola*)

খরিফ মরসুমেই এই রোগ সাধারণতঃ দেখা যায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় এই রোগ ভাড়াভাড়া ছড়িয়ে পড়ে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস থেকে ফুল আসার সময় এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়। এই রোগের আক্রমণে প্রথমদিকে পাতার উপর বাদামী রঙের দাগ পড়ে। এই দাগগুলি ক্রমশঃ আয়তনে বাড়ে ও রঙের পরিবর্তন চোখে পড়ে। বাদামী রঙের দাগগুলি কালচে হয়ে যায়। কোন কোন কালচে বাদামী দাগ গোলাকার হয় ও কিছু দাগ অসমান, গোল ও আকারে বড় হয়। এই রোগের আক্রমণে পাতা দুর্বল হয়ে ঝরে পড়ে। পাতার ডাঁটায় ও কাণ্ডেও এই দাগ দেখতে পাওয়া যায়। ফসলকে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে চীনাবাদাম গুঁঠার পর আক্রান্ত গাছের পাতা, ডাঁটা ইত্যাদি জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। পরিচ্ছন্ন চাষের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। বীজের গায়ে এই রোগের বীজাণু লেগে থাকতে পারে তাই বীজ শোধন করে বোনা উচিত। এক্ষণে ১ (এক) কিলোগ্রাম বীজ প্রতি ৩ (তিন) গ্রাম মনোসান দিয়ে শোধন করতে হবে। রোগ দেখা দেওয়ার আগেই অর্থাৎ আগষ্ট মাসের শেষ দিকে প্রতি লিটার জলে দুই (২) গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা চার (৪) গ্রাম ব্রাইটক্স অথবা এক (১) গ্রাম ব্যাভিষ্টিন গুলে স্প্রে করা দরকার।

(খ) মরচে রোগ (Rust—*Puccinia arachidicola*)

এই রোগের আক্রমণে পাতার তলার দিকে মরিচা রঙের গুঁড়ো গুঁড়ো গোলাকার দাগ দেখতে পাওয়া যায়। এই দাগ পাতার উপরেও দেখা যায়। এই দাগ একে অপরের সাথে মিশে আকারে বড় হতে পারে। অমুকুল আবহাওয়ায় এই রোগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে ফলন কমে যায়। এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করতে হলে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৫—২০ দিন অন্তর ক্যালিক্সিন (প্রতি তিন লিটার জলে এক মিলিলিটার হিসাবে) অথবা ব্যাভিষ্টিন ৫০ (প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম হিসাবে) ছব্বার স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

(গ) শিকড় ও গোড়া পচা রোগ (Dry root rot and foot rot—*Macrophomina phaseolina*)

খরিক মরসুমে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণে শিকড় পচে যায় ও মাটি সংলগ্ন স্থানে গাছের গায়ে কালচে দাগ দেখা যায় যা পরে একে অপরের সাথে মিশে যায় ও

আক্রান্ত স্থান পচে যায়। গাছ ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে শুকিয়ে যায়।

রোগের প্রতিকার হিসাবে বীজ শোধন করে বোনা উচিত। এজম্বা প্রতি কেজি বীজ তিন (৩) গ্রাম পারাঘটিত ওষুধ যেমন মনোসান অথবা কুইনটোজিন (ব্রাসিকল ৭৫) দিয়ে শোধন করা প্রয়োজন। নীরোগ গাছের বীজ ব্যবহার করা উচিত। পরিচ্ছন্ন চাষের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) গুচ্ছ রোগ (Virus)

এই রোগের আক্রমণে পাতায় হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ পড়ে ও অনেক শাখা প্রশাখা বার হয়, গাছের ডগায় অনেক শাখা প্রশাখা জড়ো হয় এবং শাখায় অনেক হলুদ রঙের বিকৃত পাতা ধরে। ফলে সমস্ত ডগাটা গুচ্ছের আকার ধারণ করে। এই রোগ জাব পোকায় মাধ্যমে এক গাছ থেকে আর এক গাছে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রমণকারি—পোকা দমনের মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার কিছুটা দমন করা সম্ভব বলে মনে হয়।

আমাদের এই রাজ্যে প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন তৈলবীজ এর চাষ হয়ে থাকে এবং প্রায় ২ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হয়। এতে গড় ফলন দাঁড়াচ্ছে ৫০০ কেজির মতো। অথচ রাজ্যের বর্তমান লোকসংখ্যা অনুসারে প্রয়োজন অনেক,—প্রায় ১২—১৩ লক্ষ টন তৈলবীজ। কাজেই দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ও চাহিদার মাঝে বিরাট ঘাটতি রয়েছে। ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যের কোষাগার থেকে প্রচুর টাকা তৈলবীজ আমদানি করতে চলে যাচ্ছে।

যে সমস্ত তৈলবীজ পশ্চিম বাংলায় হয়ে থাকে তাদের মধ্যে রাই ও সরষে প্রধান। এর পরই তিল, তিসি, বাদাম, সূর্যামুখী ও কুসুম ইত্যাদি। সারণী-১এ বিগত দশ বছরের তৈলবীজের মোট আয়তন, ফলন ও ফলনের হার দেখান হ'ল।

“সারণী—১”

সাল	আয়তন (০০০'হে:)	ফলন (০০০'টন)	ফলনের হার (কেজি)
১৯৭৪-৭৫	১৯৬'১	৭৬'১	৩৩৮
১৯৭৫-৭৬	১৯৯'১	৭৮'৭	৩৯৪
১৯৭৬-৭৭	১৫৩'৪	৬১'১	৩৯৮
১৯৭৭-৭৮	২১৪'৩	৯৭'৭	৪৫৬
১৯৭৮-৭৯	২৩৯'৪	৯৪'০	৩৯০
১৯৭৯-৮০	২৩১'২	৯৮'৮	৪২৭
১৯৮০-৮১	৩১৭'৪	১৫০'৪	৩৮০
১৯৮১-৮২	৩৪০'৯	১৭২'১	৫০৫
১৯৮২-৮৩	৩৫৭'৩	১৫৩'৩	৪২৯
১৯৮৩-৮৪	৪০০'০	২০৫'৫	৫১৩

সহকারী উদ্ভিদবিদ (তৈলবীজ), ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ গবেষণাকেন্দ্র, বহরমপুর।

তৈলবীজের উন্নত ব্যবস্থাপনা

সমীর রঞ্জন পাল

১৯৮০-৮১ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে তৈলবীজের এলাকা ক্রমবর্ধমান। এই আয়তন বৃদ্ধির ফলে মোট ফলন যদিও বাড়ছে কিন্তু ফলনের হার খুব একটা বাড়েনি। চাষযোগ্য জমির যা অবস্থা তাতে তৈলবীজের এলাকা আর বেশী বাড়ানোর সম্ভাবনা খুব নেই। কাজেই আমাদের নজর দিতে হবে ফলনের হার বাড়ানোর দিকে। যে সমস্ত কারণে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ানো যায় সেগুলো হ'ল

- উন্নত জাতের ব্যবহার
- সময়মতো বোনা
- উপযুক্ত সংখ্যক গাছ প্রতি একর জমিতে রাখা
- পরিমিত সার ও সেচের ব্যবহার
- রোগ ও পোকাকার দমন
- উপযুক্ত তদারকি (management)

বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯১

বিগত কয়েক দশকের নিরলস পবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে তৈলবীজের বেশ কয়েকটি জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। “সারণী—২” এ বিভিন্ন তৈলবীজের উন্নত জাত, উপযুক্ত বোনার

“সারণী

ফসলের নাম	উন্নত জাত	বীজের হার কেজি/হে:	বীজ শোধন গ্রাঃ/কেজি	দূরত্ব সে:মি:	বপনের সময়
টোরি	বি-৫৪	৭.৫	৩ গ্রাঃ ব্রাসি- কল অথবা ম্যানকোজেব	৩০×৮—১০	সেপ্টেম্বরের শেষ থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ
খেত সরিষা রাই	সি-২*	”	”	”	”
	ওয়াই,	”	”	৩×১০	অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ
	এস বি-৯	”	”	”	পুরো অক্টোবর
	বি-৮৫	”	”	”	অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ
	বরুণা	”	”	”	অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ
তিসি	পুষা বোল্ড	”	”	”	”
	আর ডব্লিউ-৩৫১*	”	”	”	”
	আর ডব্লিউ ৮৫-৫৯	”	”	”	”
	বি-৬৭	১৫	”	৩০×২.৫	অক্টোবরে শেষ হইতে নভেম্বরের মাঝামাঝি
	মুক্তা	”	”	”	”
অথবা এল,এস-২	এল, জি-৫	”	”	”	”
	অথবা এল,এস-২	”	”	”	”

বঙ্গবন্ধু : কার্তিক : ১৩৯১

সময়, বীজের হার, সারির দূরত্ব, সারের মাত্রা, সেচের পরিমাণ, তেলের শতকরা হার, ফলন কমতা ইত্যাদি দেওয়া হ'ল।

—২—

না: ফ: প:	সেচের সংখ্যা	পাকার সময় (দিন)	তৈলাংশ (শতকরা)	হাজার বীজের ওজন (গ্রা:)	গড় ফলন কেজি/হে:
৪০ : ২০ : ২০	১***	৭০—৭৫	৪০	২'৫—৩'৫	৮০০—১০০০
"	"	৭৫—৮০	৪০—৪২	"	১২০০—১৪০০
৫০ : ২৫ : ২৫	২****	৯০—৯৫	৪৬'৫	৩'০—৩'৫	১৪০০—১৫০০
৮০ : ৪০ : ৪০	২****	৯৫—১০০	৩৮—৪০	২'৫—৩'০	১২০০—১৪০০
"	৩****	১১৫—১২০	৩৭	৪'৫—৫'০	১৬০০—১৮০০
"	"	১২০—১২৫	৩৮	৫'০—৫'৫	১৮০০—২০০০
"	"	১০৫—১১০	৩৮—৪০	৪'০—৪'৫	১৬০০—২০০০
"	"	১০৫—১১০	৩৮—৩৯	৪'০—৪'৫	১৬০০—২০০০
৫০ : ২৫ : ২৫ (সেচযুক্ত)	২**	১২৫—১৩০	৪০—৪১	৫'০—৫'৫	১৪০০—১৫০০
২৫:১২'৫:১২'৫ (সেচবিহীন)	—	১২০—১২৫	৪০—৪১	৭'০—৭'৬	৮০০—১০০০
"	—	১২০—১২৫	৪০—৪১	৭'০	৮০০—১০০০



ফসলের নাম	উন্নত জাত	বীজের হার কেজি/হে:	বীজ শোধন গ্রা:/কেজি	দূরত্ব সে:মি:	বপনের সময়
তিল	বি-৬৭	৭.৫	"	৩০ X ১৫	ফেব্রুয়ারী—মার্চ জুন—জুলাই
	বি-১৪	"	"	"	আগষ্ট—সেপ্টেম্বর জুন—জুলাই
	এইচ, টি—১*	"	"	"	আগষ্ট—সেপ্টেম্বর
সূর্যামুখী	ই,সি, ৬৮৪১৪	১০	৩গ্রা: ব্রাসিকল অথবা ম্যানকোজেব	৬০ X ৩০	ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারীর মাঝামাঝি
	ই,সি,-৬৮৪১৫	"	"	"	"
	মরডেন	"	"	৪০ X ৩০	"
কুসুম	সি, টি, এম-৭৪০১ (কাঁটাবিহীন)	১৫	"	৪০ X ২০	ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি
	এন-১৩৩ (কাঁটাবিহীন)	"	"	"	"
	নং ১৬৮ (কাঁটায়ুক্ত)	"	"	"	"
বাদাম	পোলাচি-১	১৫০	৩গ্রা: থাইরাম অথবা ম্যানকোজেব	৩০ X ১৫	ফেব্রুয়ারী—জুলাই

নাঃ কঃ পঃ	সেচের সংখ্যা	পাকার সময় (দিন)	তৈলাংশ (শতকরা)	হাজার বীজের ওজন (গ্রাঃ)	গড় ফলন কেজি/হেঃ
৫০ : ২৫ : ২৫ আলুর জমিতে সারের প্রয়োজন নেই	২##	৭৫—৮০	৪০	২'০—২'২	৮০০—১০০০
"	"	৮০—৮৫	৩৯	"	৬০০—৮০০
"	১##	৭০—৭৫	৪৫—৫০	২'০	৫০০—৬০০
৬০ : ৪০ : ৪০	২##	১২০—১২৫ (রবি)	৪০—৪৫	৪০—৬০	১৫০০—১৬০০
"	"	৯৫—১০৫ (খরিফ)	৪৪—৪৫	৪০—৬০	১৫০০—১৬০০
"	"	"	৪০—৪৫	৪০—৫০	১২০০—১৩০০
৫০ : ২৫ : ২৫ (সেচযুক্ত)	ফুল আসার আগে দুইটি	১৪৫—১৫০	৩০—৩৫	৪০—৪৫	১২০০—১৪০০
২৫:১২'৫:১২'৫ (সেচবিহীন)	"	১৪০—১৫০	৩০—৩৫	৫০—৫৫	১০০০—১২০০
	"	১৪০—১৫০ ১১৫—১২০ (সেচবিহীন)	৩০—৩৫	৫০—৬০	১২০০—১৪০০
১৫ : ৩০ : ৪৫	২ খরিফে	প্রি-খরিফ ১৩০—১৩৫ খরিফ ১১০—১১৫	৫০—৫১	৪৫০—৫০০	প্রি-খরিফ ১৮০০—১৯০০ খরিফ ১৫০০—১৬০০

বহুক্রম : কাতিক : ১৩৯১

ফসলের নাম	উন্নত জাত	বীজের হার কেজি/হে:	বীজ শোধন গ্রা:/কেজি	দূরত্ব সে:মি:	বপনের সময়
	জে-১১	১২৫	"	"	"
	এম, এইচ-২*	২০০	"	১৫×১৫ ২০×১০	"

* নতুন জাত বেরুনোর অপেক্ষায়

** ফুল আসার মুখে একটা সেচ

*** ছোটো সেচ—একটা ফুল আসার মুখে আর একটা ধরার পর

*** বি-৮৫ এবং আর ডব্লিউ-৮৫-৫৯ এর জন্য ছোটো সেচ—একটা ফুল আসার মুখে আর একটা ফল ধরার পর

**** বরুণা ও অগ্রাঙ্গ জাতের জন্য তিনটি সেচ—একটা ফুল আসার আগে, একটা ফুল ফোটা অবস্থায় আর একটা ফল ধরার পর

রাই সরিষার উপযুক্ত তদারকির উপর “সারগী-৩” এ উপযুক্ত তদারকি ও তদারকি ফলনের প্রভাব খুব বেশী। পরীক্ষার দ্বারা ছাড়া রাই-এর ফলনের প্রভাব দেখানো হল। দেখা গেছে যে উপযুক্ত তদারকির অভাবে ৩নং সারগী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ফলনের যে ক্ষতি হয় পূর্বমাত্রায় সার প্রয়োগ ঠিকমতো পরিচর্যা করলে সার প্রয়োগ না করেও করেও সেই ক্ষতি পূরণ করা যায় না। ফলন ২-৩ গুণ বাড়ানো সম্ভব।

বহুস্রা : কাৰ্তিক : ১৩২১

নাঃ ফঃ পঃ	সেচের সংখ্যা	পাকার সময় (দিন)	ভৈলাংশ (শতকরা)	হাকার বীজের ওজন (গ্রাঃ)	গড় ফলন কেজি/হে:
"	"	প্রি-খরিক ১৩০—১৩৫ খরিক	৫০—৫১	৫৫০—৮০০	প্রি-খরিক ১২০০—২১০০ খরিক
"	"	১১০—১১৫ প্রি-খরিক ১৩০—১৩৫ খরিক ১০০—১০৫	৪৯—৫০	৩৫০—৮০০	১৪০০—১৫০০ প্রি-খরিক ২৫০০—২৭০০ খরিক ২০০০—২৩০০

“সারগী—৩”

সারের মাত্রা			ফলন	কেজি/হে:
কেজি/হে:			উপযুক্ত তদারকি	তদারকি ছাড়া
নাঃ	ফঃ	পঃ		
.	.	.	১৩৮৬	৩২৭
২৫	১২.৫	১২.৫	১৭৩২	৪৬৪
৫০	২৫	২৫	১৮৯০	৫৯৩

উপযুক্ত সময়ে বপনের নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, রাই ও টোরি সরিষার ফলন ঠিক সময়ে না বুনলে অনেক কমে যায়। কাজেই অধিক ফলন পাবার জন্য বীজ ঠিক সময়ে বোনা অত্যন্ত প্রয়োজন। “সারগী—৪” এ বিভিন্ন সময়ে বপনের উপর রাই ও সরিষার ফলনের প্রভাব দেখানো হয়েছে। এই সারগী থেকে এটা স্পষ্ট যে রাই ও সরিষার ভাল ফলন পেতে হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের

বসুন্ধরা : কার্তিক : ১৩৯১

মধ্যে অবশ্যই বুনতে হবে। এর পর লাগানো কিছুটা নাবি বোনা সহ্য করতে পারে। মনে হলে ফলন কমে যাবে, যদিও রাই-এর বেলায় রাখবেন, নাবি বোনার বেলায় জলদি জাত নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত যাওয়া যায় যেমন বি-৮৫ (সীতা) ব্যবহার করবেন না। তবে সেক্ষেত্রে মাঝারি জাত ব্যবহার করা সারের ব্যবহারে ফলনের উপর প্রভাব খুব প্রয়োজন, যেমন:—আর. ডব্লিউ—৮৫-৫৯, বেশী দেখা যায়। “সারগী—৫” এ বিভিন্ন আর. ডব্লিউ—৩৫১ বা পুষা বোল্ড ইত্যাদি। মাত্রায় সার ব্যবহারের ফলে রাই-এর ফলনের সরিষার বেলায় স্বৈতসরিষা বিনয় (বি-৯) উপর প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে।

“সারগী—৪”

বপনের সময়	১৫/১০	২৫/১০	৫/১১	১৫/১১	২৫/১১	৫/১২	১৫/১২
সরিষা	৯১৫	৯৮৯	১১৯১	৬১২	৪৫৪	২০৭	১২৪
রাই	১৬২২	১৬৭০	১৬৯০	১২৯৩	৯৩৮	৬৫৭	৩৭৮

“সারগী—৫”

সারের মাত্রা কেজি/হে:	ফলন কেজি/হে:	প্রতি কেজি সারে অতিরিক্ত ফলন
না: ০	৭৩৬	—
না: ৬০	১১৯৭	৭'৬৮
না: ১২০	১৬৫৮	৭'৬৮
না: ১৮০	১৮৩২	৬'০৮
না: ২৪০	১৮৪২	৪'৬০
না: ৩০০	১৭৪৫	৩'৩৬

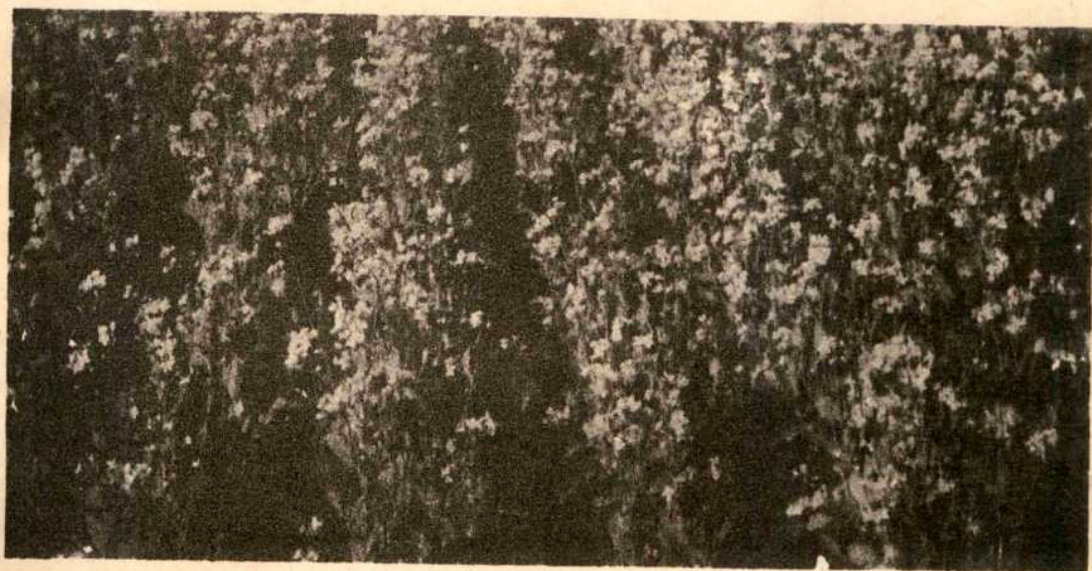
উপরোক্ত সারগীতে দেখা যায় যে হেক্টর ৫ টাকা বেশী খরচ করলে প্রায় ৩০-৩৫ প্রতি ৬০ থেকে ১২০ কেজি নাইট্রোজেন সার টাকার ফসল বেশী পাওয়া সম্ভব। সরিষার ব্যবহার করলে প্রতি কেজি সারের জন্য ৭'৫ বেলায়ও অল্পরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কেজি বীজ অতিরিক্ত পাওয়া যায়, অর্থাৎ মাত্র কাজেই রাই ও সরিষার চাষে সারের ব্যবহার

অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও চাষীভাইদের ক্রয় ক্ষমতার কথা চিন্তা করে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ২৫ কেজি ফস্ফেট ও ২৫ কেজি পটাশ দেবার সুপারিশ করা হয়েছে রাই ও খেত সরিষা চাষের বেলায় এবং ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফস্ফেট ও ২০ কেজি পটাশ টোরি সরিষার ক্ষেত্রে; কিন্তু এই মাত্রার চেয়ে বেশী সার ব্যবহার করলে ফলন আরও বেশী পাওয়া সম্ভব। উল্লিখিত সারের মাত্রা সেচ-সেবিত এলাকার জ্ঞাত করা হয়েছে। বিনা সেচের চাষে এই মাত্রা হবে অর্ধেক।

সেচ প্রয়োগেও ফলন বাড়ানো সম্ভব। মাঝারি ও নাবি জাতের রাই চাষে তিনটি সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। প্রথম সেচ ফুল আসার আগে, দ্বিতীয় সেচ সম্পূর্ণ ফুল ফোটার সময় এবং তৃতীয় সেচ দানা পুষ্ট হবার সময় দেওয়া প্রয়োজন। মাটিতে রসের ঘাটতি, এর কোন একটি সময়ে হলে দানা পুষ্ট হবে না এবং

ফলন কমে যাবে। জলদি জাতের রাই ও খেত সরিষার বেলায় দু'টি সেচেই ফসল তুলে নেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ফুল ফোটার সময় একটি ও তার চার সপ্তাহ পরে আর একটি সেচ প্রয়োজন। টোরি সরিষায় সাধারণতঃ সেচ প্রয়োজন হয় না, তবে ফুল ফোটার সময় একটি সেচ দিলে ফলন বেশী পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতির নিরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উন্নত জাত ব্যবহার করলে ফলন শতকরা ২০ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। উন্নত জাত ও সম্পূর্ণ পরিচর্যার প্রয়োগে ফলন সব থেকে বেশী পাওয়া যায় (২৩৫%)। স্থানীয় জাতে বিভিন্ন পরিচর্যার প্রয়োগে ফলন বাড়ানো যায় শতকরা প্রায় ১৭৭ ভাগ। উন্নত জাত এবং রোগ পোকা দমনে ফলন বাড়ে শতকরা ১৭৬ ভাগ। এবং এককভাবে সারের ব্যবহারে ফলন বাড়ে শতকরা ৭৩ ভাগ।



“সারগী-৬”

রাই-এর ফলনের উপর বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতির প্রভাব

বিশেষক	ফলন কেজি/হে:	শতকরা বৃদ্ধি
(১) স্থানীয় জাত	২৯৫	—
(২) উন্নত জাত	৩৫৫	২০
(৩) উন্নত জাত + সার	৬১৪	৭৩
(৪) উন্নত জাত + সেচ	৩৮১	৭
(৫) উন্নত জাত + পোকা দমন	৫১৮	১৬
(৬) উন্নত জাত + রোগ দমন	৫৫২	৫৭
(৭) উন্নত জাত + রোগ ও পোকা দমন	৯৮১	১৭৬
(৮) উন্নত জাত + সেচ + সার	৫৪২	৫৫
(৯) উন্নত জাত + সার + রোগ পোকা দমন	৮১২	১২৯
(১০) স্থানীয় জাত + সম্পূর্ণ পরিচর্যা	৯৮২	১৭৭
(১১) উন্নত জাত + সম্পূর্ণ পরিচর্যা	১১৯০	২৩৫

শস্য পর্যায় ও অন্তর্বর্তী ফসলের নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গমের সাথে রাই অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে অনেক বেশী আর্থিক লাভ হয়। ৬-৯ লাইন গমের পর ১ লাইন রাই বেশী লাভজনক, তবে রাই-এর জাত নির্বাচন ঠিকমতো করতে হবে। লম্বা জাতের চেয়ে বেঁটে জাতের রাই অন্তর্বর্তী ফসল হিসাবে উপযুক্ত। পাট-গম-মুগ এই শস্য পর্যায় বেশী লাভজনক, হেক্টর প্রতি ৫২০০ টাকা। এরপরই ভুট্টা-গম-মুগ, হেক্টর প্রতি ৪৩০০ বা পাট-টোরি-মুগ, হেক্টর প্রতি ৩২০০ টাকা।

বোনার সময়ের হেরফের করে রোগ-পোকা দমনের ওষুধের খরচ কম করা যায়। অক্টোবরের মাঝামাঝি রাই ফসল চাষ করলে

নাবি বোনা রাই-এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ করা যায়।

ভিল, ভিসি, বাদাম, সূর্যমুখী ও কুম্ভীর চাষেও দেখা গেছে বোনার সময়, সারের ব্যবহার ও পরিচর্যার উপর ফলনের হার নির্ভর করে। এইসব ফসলের ফলন বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন যাতে রাজ্যের তৈলবীজ উৎপাদন বাড়ানো যায়।

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে গবেষণা-লব্ধ ফলাফলগুলি যত দ্রুত রাজ্যের দূরদূরান্তের চাষীভাইদের কাছে পৌঁছানো যাবে তত শীঘ্র তৈলবীজের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে এবং জনপ্রতি ভোজ্য তেলের যোগানও বৃদ্ধি করা যাবে অনেকটা।

কৃষিক্ষেত্র

নিয়মান্বলী

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রযোজক, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিক্ষেত্র, কৃষি বিপণন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্মতাবহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জন্ম সন্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সন্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রেসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস’ দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/অনুশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাক, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২৫% কমিশন বাদে) অগ্রিম প্রদায় দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি শিল্প নিগমের যত্ন ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রণায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

- | | |
|---|---|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারজাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “সুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রে শার |
| ৬। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য | ৬। হস্তচালিত ছইলহো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি |
| | ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরলা পাম্প |

তদুপরি,

(ক) কৃচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্র্যাণ্ডো-ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

টেলিফোন : ২২-২৩১৪

২৩-৩১২২

ସୁନା

ଅଗ୍ରହାୟଣ : ୧୭



ଶ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ

সূচী

সম্পাদকীয়	...	...	৩-৪
অধিক ফলনশীল গমের চাষ	...	...	৫-৮
লক্ষ্য দেখে রোগ নির্ণয় ও	...	...	৯-১৩
প্রতিকার	...	...	১০-১৩
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়	...	...	১০-১২
পান চাষ	...	...	১০-১২
সুধীর চন্দ্র পাল	...	...	১০-১২
গমবীজ বোনার আগে জলে কিংবা	...	...	১০-১২
জ্বলে ভিজিয়ে শুকনো করে	...	...	১০-১২
বৃন্দন	...	...	১০-১২
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও	...	...	১০-১২
সুজিত কুমার রায়	...	...	১০-১২
বনপাড়ার কাহিনী	...	...	১০-১২
অনিল সরকার	...	...	১০-১২
নিবিড় রবিশঙ্কর উৎপাদন কার্যক্রম :	...	...	১০-১২
একটি আলোচনা সভা	...	...	১০-১২
ডিম সংরক্ষণ	...	...	১০-১২
পোষে কৃষকের করণীয়	...	...	১০-১২
কৃষি সংবাদ	...	...	১০-১২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্বদ	...	...	১০-১২
বিশ্বপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ	...	...	১০-১২
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা	...	...	১০-১২
(সাধারণ)	...	...	১০-১২
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা	...	...	১০-১২
(গবেষণা)	...	...	১০-১২
বুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)	...	...	১০-১২
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ	...	...	১০-১২
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ	...	...	১০-১২
আধিকারিক, কৃষি অধিকার	...	...	১০-১২
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক	...	...	১০-১২
(সদর)	...	...	১০-১২
সুলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা	...	...	১০-১২
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক	...	...	১০-১২
প্রধান সম্পাদক	...	...	১০-১২
বিশ্বপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ	...	...	১০-১২

বহুকারী

অগ্রহায়ণ-১৩৯১

কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা।
কর্তৃক প্রকাশিত



শক্তিশালী কীটনাশক থাইমেট ১০-জি আপনার ধানের ফসলকে ক্রমাগত বহুদিন সুরক্ষিত রাখে তিন প্রকারের বিভিন্ন উপায়ে

মেহরস, ম্পর্শ ও ধোয়ার অধিতীয় সমাবেশ থাইমেট ১০-জি সহজে দমন করা যায় না এমন পোকামাকড় বিনাশ করে। এমনকি পোকামাকড়ের অক্রমণের আগেই তাদের প্রতিহত করার আত্মসমরীণ শক্তি কার্যকরী ভাবে গড়ে তোলেন। তাছাড়া, ফসল সম্পূর্ণরূপে পাকলে তাতে থাইমেট ১০-জি'র অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে না আর প্রয়োগের পর বহুদিন পর্যন্ত পোকামাকড় দমন করে বলে সাধারণ কীটনাশকের মত বারবার প্রয়োগের অপেক্ষা থাইমেট ১০-জি একবার প্রয়োগ করলেই ফসল পাওয়া যায়। যেসমস্ত চাষীরা লাভ করতে চান তাঁরা এই ওষুধ ব্যবহার করে ফসলকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিতরূপে বেশী সকল পল তুলে মুনাফা করতে পারেন।

CYANAMID

সায়নামিড ইন্ডিয়া লিমিটেড
কৃষি বিভাগ

পো: ধ: ন: ২১০২, বোম্বাই ৪০০ ১২৬

সায়নামিড প্রতিষ্ঠা চাষীর নির্ভরযোগ্য সহায়

Registered Trademark of American Cyanamid Company, Wayne, New Jersey, U.S.A.



CIL 385 BEN

সম্পাদক



অগ্রহায়ণ ফসল কাটার মাস। কৃষক তার শ্রমের ফসল আমন ধান কেটে ঘরে আনে এই সময়। গত বছর এ রাজ্যে ধানের রেকর্ড ফলন হয়েছিল। খাটোৎপাদনের আগেকার সমস্ত নজীর ভেঙ্গে নতুন নজীর তৈরী হয়েছে। এ বছরও কৃষকের ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন এবং কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সাহায্য ও সহায়তায় ধানের ফলন ভাল হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই নতুন ধানে কৃষক যেমন নবান্ন উৎসব পালন করবেন সেইসঙ্গে রবি ফসল চাষের চিন্তাভাবনাও তাঁর মনে থাকবে।

রবি মরশুমের অগ্রতম ফসল গম। এর চাষ এখন শুরু হচ্ছে। মাঝে কয়েক বছর গমের ফলন কমের দিকে ছিল। এই অবস্থার উন্নতির জন্তু কৃষি বিভাগ এ সম্পর্কে এক বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির সুপারিশমত গমের ফলন বৃদ্ধির জন্তু প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়। এর ফলে গত বছরই গমের উৎপাদন ভাল হয় এবং ফলন হার এ রাজ্যের আগের সমস্ত ফলন হারের রেকর্ড ভেঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

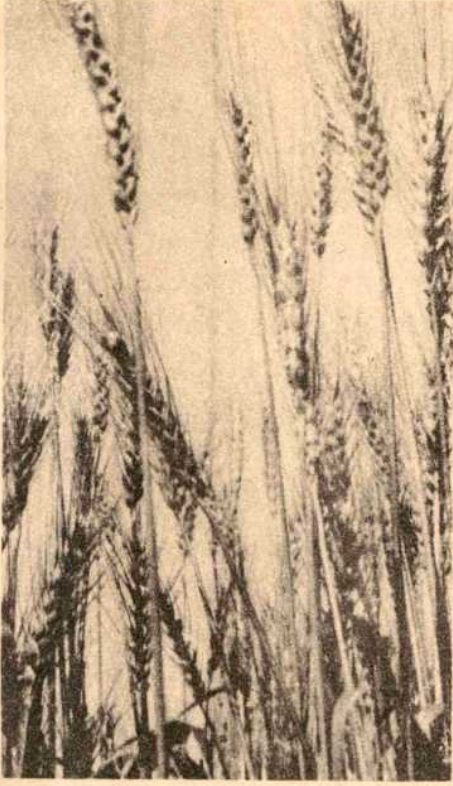
শুধু কৃষক নয়, খাটোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় যারা নিযুক্ত আছেন সকলেরই এটি আশা ও উৎসাহের বিষয়। এই ফলন হার যাতে এ বছরও অব্যাহত থাকে তারজন্তু গম চাষে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। প্রথমেই হলো বীজ। গত বছরের মত এ বছরও চলতি সোনালিকা বীজের বদলে যত বেশী সম্ভব শংসিত বীজ ব্যবহার করতে কৃষকদের উৎসাহিত করা। শংসিত বীজ কৃষকরা যাতে সময়মত পান সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। তারপরই গুরুত্ব থাকবে শংসিত অধিক ফলনশীল জাতের বীজ সময়ে বোনা। শীত এ রাজ্যে স্বল্পকালীন। কাজেই বোনার কাজ সময়মত অবশ্যই শেষ করতে হবে। না হলে ফলন আশাহীন হবে না। অগ্রাগ্র প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও সময় মত নিতে হবে।

গমের বীজের সঙ্গে অনেক সময় ক্ষতিকর অগ্র আগাছার বীজ মেশানো থাকে। যেমন ফ্যালাঘাস, করাত ঘাস, বুনো যাই ইত্যাদি। ক্ষেতে করাত ঘাস, ফ্যালাঘাস ইত্যাদি আগাছা দেখলে তা গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। যারা বোরো ধানের

চাষ করছেন এ মাসের মধ্যে তাঁদের বীজতলায় বোরো ধানের বীজ ফেলার কাজ শেষ করতে হবে।

গম ও বোরো ধান ছাড়া এটি ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ চাষেরও মরসুম। এই সব শস্তের ফলন বাড়ানোর জন্য আমাদের চেষ্টা থাকবে। খাদ্যশস্ত্রের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করে রবি ফসলের সার্থক ফলনের উপর। কাজেই রবি চাষে সফলতা লাভের জন্য আমাদের বিশেষ সচেতন হতে হবে।





অধিক ফলনশীল গমের চাষ

গম রবি মরশুমের একটি অতি উল্লেখযোগ্য ফসল। খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন বাড়াতে গমের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক বছরে গমের উৎপাদন কমে গিয়েছিল। ফলন বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তিগত ও ব্যবহারিক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে গত বছর ফলন হারের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা যায়। এই ফলন হার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও ১৯৮৩-৮৪ সালে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। এ বছরও গমের ফলন বাড়ানোর জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তার জন্য উন্নত প্রণালী চাষ করা প্রয়োজন। এখানে গমের উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

জমি ও মাটি

দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, পলি দো-আঁশ ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতে গম চাষ ভাল হয়। উত্তরবঙ্গ এবং অম্বাঙ্গ এলাকার অল্প জমিতে গমের ভাল ফলন পেতে হলে মাটি পরীক্ষা করিয়ে সুপারিশমত চুন বা ডলোমাইট গম বোনার মাস খানেক আগে দিয়ে ভালভাবে চাষ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন বা ডলো-মাইট দেবার এক মাসের মধ্যে ঐ জমিতে কোন রাসায়নিক সার দেবেন না।

জাত

পশ্চিম বাংলার সমভূমি ও কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে সোনালিকা ও ইউ পি-২৬২ জাতের গম

বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

বুহন। তরাই অঞ্চলের জম্মা শুধু সোনালিকা উপযুক্ত।

বীজের মান

শংসিত (সারটিফায়েড) বীজ ব্যবহার করুন। নিজের জমির ভাল বীজও ব্যবহার করতে পারেন। যে জমিতে গমের ভূসো রোগ হয় নি সেরকম জমির বীজই ব্যবহার করবেন। বোনার আগে মোটা চালুনিতে চেলে নিয়ে অপূষ্ট ও ছোট বীজ এবং আগাছার বীজগুলো বাদ দিয়ে দেবেন।

গমের বীজ ৩-৪ বছর অন্তর পাল্টে নেওয়া প্রয়োজন, অগ্রথায় বীজের ফলন ক্ষমতা কমে যায়।

বীজ শোধন

বীজ-বাহিত গোড়া পচা ও চারা ধসা রোগ দমন করতে বোনার আগে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে থাইরাম বা ইথাইল মারকারি ক্লোরাইড বা ফিনাইল মারকারি এ্যাসিটেট মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন।

অনেক জায়গায় কৃমি পোকার (Nematode) আক্রমণে শীষ বিকৃত হয়ে যায়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ লবণ-জলে ডুবিয়ে নিয়ে যে সমস্ত গুটি-ধরা বীজ ভেসে উঠবে সেগুলি বাদ দিয়ে বাকী বীজগুলি তুলে নিয়ে শুকিয়ে পরে শোধন করে লাগান।

মাটি আশ্রিত কীটশত্রু দমন

উই বা কাটুই পোকার উপদ্রব থাকলে একর পিছু ১২ কেজি বি-এইচ-সি (১০%) বা অলড্রিন (৫%) বা হেপ্টাক্লোর (৫%) বা ক্লোরডেন (৫%) ওঁড়ো শেষ চাষের আগে জমিতে ছড়িয়ে দিন।

জমি তৈরি

বারে বারে চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙে খুরঝুরে করে ভালভাবে মাটি তৈরি করুন। জমি যতটা সম্ভব সমান করুন। সেচের সুবিধার জম্মা জমির মধ্যে ৬ থেকে ৮ হাত অন্তর সরু আল তুলে লম্বা লম্বা ফালিতে ভাগ করে দিন। জমিতে রস কম থাকলে বোনার আগে প্রয়োজন মত সেচ দিয়ে জমি তৈরি করুন। জমি সরস থাকলে বীজ ভালভাবে গজায়, তাতে ফলনও বাড়ে।

বোনার সময়

সময়মত বীজ বোনার উপর গমের ফলন অনেকখানি নির্ভর করে। সমতল জমিতে গমের ভাল ফলন পেতে হলে সোনালিকা ও ইউপি-২৬২ কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে অজ্ঞানের মাঝামাঝি (পুরো নভেম্বর মাসে) বুহন। অজ্ঞানের শেষ পর্যন্তও গম বোনা যায়, তবে ফলন কম হবে; কারণ, গম শীতের ফসল। এ রাজ্যে শীতের স্থায়িত্ব ও প্রকোপ কম। শীতের প্রকোপ বেশী (১৫°—২০° সে:) না থাকলে ভালভাবে বিয়ান ছাড়ে না, আবার বিয়ান ছাড়ার সময়ও কম। ধানের মত গমের চারা এক নাগাড়ে ৩-৪ বায় বিয়ান ছাড়ে না। কাজেই বিয়ান ছাড়ার সময় (বোনার ৬ সপ্তাহ পর) যদি সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পাওয়া যায় তবে তা ফলন বৃদ্ধির সহায়ক হবে। সময়ে বুনলেই গাছ বিয়ান ছাড়ার উপযুক্ত ও অমুকুল আবহাওয়া পেয়ে যাবে।

বীজের পরিমাণ

একর প্রতি ৪০ থেকে ৪৫ কেজি বীজ লাগবে। যদি কোন কারণে দেরীতে বুনতে

হয় তাহলে একর প্রতি আরও ৫ কেজির মত বীজ বেশী ব্যবহার করুন।

বীজ বোন

বীজ বোনার সময় জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা দরকার কেননা বীজের ভালভাবে কল বেরানোর উপর গমের ফলন অনেকাংশ নির্ভর করে। অনেক সময় নাবি চাষে শুকনো জমি জল দিয়ে ভিজিয়ে আবার চাষে গম বুনতে গেলে কমপক্ষে আরও ৬ থেকে ৭ দিন দেরী হয়ে যায়, এতে ফলন কম হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মাটি খুরখুরে করে তৈরি শুকনো জমিতেই গম বুনে তারপর সরু নালা কেটে জল এনে হালকা ভাষে ঝাপটা দিন। এতে কল সমান ভাবে বেরাবে এবং ফলনও ভাল হবে। বোনার যন্ত্র দিয়ে বীজ বোনাই সবচেয়ে ভাল। বীজ মাটির ৪ থেকে ৫ সে.মি (দেড় থেকে দুই ইঞ্চি) গভীরে বুনুন। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০ থেকে ২২ সে.মি (৮ থেকে ৯ ইঞ্চি)। জমির 'জো' ভাল থাকলে লাঙ্গলের পেছনে বীজ বুনেও ভাল ফলন পাবেন। জমির সবজায়গায় সমানভাবে চারা থাকলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। একত্রে প্রতি বর্গহাতে ২০—২৫টি চারা থাকা দরকার। সার প্রয়োগ

মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে কতটা সার দিতে হবে তা ঠিক করাই সবচেয়ে ভাল। যদি মাটি পরীক্ষা করানো না হয়ে থাকে, তাহলে ভাল ফলন পেতে একর প্রতি ৪০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ দিন। কোন কারণে এই পরিমাণ সার দেওয়া সম্ভব না হলে প্রতি একরে অন্ততঃ ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ

দিন। জমিতে ফসফেটের অভাব থাকলে দানা ভাল পুষ্ট হয় না, এতে ফলনও কমে যায়। উত্তরবঙ্গের অল্প মাটিতে এবং লাল কঁকুরে মাটিতে গম বোনার ১ মাস আগে একরে ৮ কুইন্টাল রক ফসফেট ছড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ফলন ভাল হয়। এক্ষেত্রে মাটির অল্প কমানোর জগু ডলোমাইট বা চুন প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। পুরো ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন শেষ চাষের সময় দিন, বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন বোনার ৩ সপ্তাহ পরে প্রথম সেচের সময় দিন।

সেচ

গম চাষে ৪টি সেচ দরকার। প্রথম সেচ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় যখন মুকুট শেকড় বের হয় তখন, দ্বিতীয় সেচ সবচেয়ে বেশী পাশ-কাঠি হওয়ার সময় (বোনার ৬ সপ্তাহ পরে), তৃতীয় সেচ গাড়ে ফুল আসার সময় এবং চতুর্থ সেচ দানা নরম থাকা অবস্থায় দিন।

সেচের জল কম থাকলে এমন সময় সেচ দেওয়া দরকার যাতে সেই সীমিত সেচ সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে। সেচের সুযোগ অনুযায়ী তার প্রয়োগ সময় এখানে দেওয়া হলো।

(১) একটি সেচ দেবার মত জল থাকলে তা মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় দিন। গমের প্রাথমিক শিকড়গুলো এই সময়ে মরে যায়, নতুন শিকড় গজায়। এই নতুন শিকড়ের মাধ্যমেই পরবর্তীকালে গাছেরা খাবার সংগ্রহ করে। অতএব নতুন শিকড় গজানোর জগু এই সময় সেচ অপরিহার্য।

(২) দুটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট

বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথমবার এবং ফুল আসার সময় দ্বিতীয়বার সেচ দিন। সাধারণত: ধানের জাত অনুসারে দানার ওজন নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু গমের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম হয় না। দানা বৃদ্ধির সময় যদি রসের অভাব হয় তবে দানা অত্যন্ত অপুষ্ট হয়, ওজন কমে যায়, ফলন হ্রাস পায়। কাজেই ফুল আসার আগে দ্বিতীয় সেচ দিলে গাছে ভাল ফুল হবে এবং দানা পুষ্ট হবে ও ফলন বাড়বে।

(৩) তিনটি সেচ দেবার মত জল থাকলে মুকুট শেকড় বের হওয়ার সময় প্রথম, সবচেয়ে বেশী পানিশক্তি বের হওয়ার সময় অর্থাৎ বীজ বোনার ৬ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় এবং ফুল আসার সময় তৃতীয় সেচ দিন।

ফালিতে এমনভাবে সেচ দেবেন যেন জমিতে জল না দাঁড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে গাছ হলদে হয়ে যাবে, এতে গমের ফলন কম হবে। সেচের জলও নষ্ট হবে। উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত জমিতে শীষ মাস পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে রস থাকে সেখানে গাছে ফুল আসার সময় এবং দানা নরম থাকা অবস্থায় সম্ভব হলে দুবার সেচ দিন।

উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে যেসব জায়গায় ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাটির নিচে জল থাকে এবং জমিতে রসের জোগান হয়, সেখানে বিনা সেচে গম চাষ সম্ভব।

আগাছা দমন

বোনার ২০ দিন পরে নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিন। প্রয়োজনে আরও ২০ দিন পরে দ্বিতীয় সেচের আগে আর একবার নিড়েন দিন।

‘ফ্যালাঘাস’ গমের একটি মারাত্মক আগাছা। এই আগাছা দেখতে গম গাছের মত। তবে শীষ গমের মত নয়। এর শীষ আঙ্গুলের মত মোটা, তিন ইঞ্চি লম্বা। ‘ফ্যালাঘাস’ ছাড়াও গমের ক্ষেত্রে ‘করাত ঘাস’-এর উপদ্রব দেখা যায়। এই ঘাসও শীষ আসার আগে পর্যন্ত গম গাছের মত দেখতে, তবে কিছুটা শক্ত ও সরু। এর শীষ গমের শীষ আসার পরে বের হয়। শীষের প্রতিটি গাঁটে ৮-৯টি ফুল কয়েকটি স্তরে থাকে, যার ফলে শীষটি করাতে মত দেখতে হয়। শীষ প্রায় ফুট খানেক লম্বা এবং শক্ত ও গমগাছ ছাড়িয়ে উপরে ওঠে ও ঝুঁকে পড়ে। শীষ প্রথমে সবুজ ও পরে কালচে হয়। এই আগাছা দেখলেই গোড়া সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলুন।

এ ছাড়াও আগাছা হিসাবে বুনো ‘জৈ’ গম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এই গাছ শীষ আসার পর চিনতে সুবিধা হয় কারণ এর শীষে দানায় গুঁয়ো থাকে, দানার রং কালো ও খড়ের রংয়ের মত হয়। শীষ গমগাছ ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়।

গাছের যেমন অনেক কীটশত্রু আছে, সেইরকম অনেক রোগের দ্বারাও গাছ আক্রান্ত হয়। তার ফলে ফসলের ক্ষতি হয়। আমরা পোকাকার আক্রমণের সঙ্গে যেমন সাধারণভাবে পরিচিত, রোগের সম্বন্ধে ধারণা অনেকেরই সুস্পষ্ট নয়, যদিও রোগের মারাত্মক আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয় খুবই বেশী যেমন ধানের বাদামী চিটা রোগ যা ১৯৪৩ বা বাংলা ১৩৫০ সনে ছ'ভিক্ষের অন্যতম কারণ হয়েছিল। ধানের টুংরো রোগ যা ১৯৮১ সালে কম ফলনের জঘা আংশিকভাবে দায়ী ছিল। আলুর ধসা রোগ, ট্যাডসের পাতা হলদে হয়ে যাওয়া বা কুটে রোগ, বেগুনের ঢলে পড়া রোগ প্রভৃতি।

পোকাকার আক্রমণ সহজে বোঝার কারণ এর আক্রমণ সহজেই নজরে পড়ে, পোকা দেখতে পাওয়া যায় কিংবা পোকাকার দরুণ ক্ষতির চিহ্ন

সহজে বুঝতে বা ধরতে পারা যায়। যখন কোনও গাছের বাড় বা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে না, উপরন্তু স্বাভাবিক না হওয়ার দরুণ কোনও চিহ্ন বা লক্ষণ দেখা যায় তখনই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে রোগের আক্রমণ হতে পারে বা হয়েছে। রোগের আক্রমণ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও মাইকোপ্লাসমা দ্বারা মূলতঃ হয়ে থাকে। এছাড়া অশ্রু কারণও থাকতে পারে। এর মধ্যে ছত্রাকের দরুণ আক্রমণের সংখ্যাই বেশী। সেজন্য প্রথমে ছত্রাকের দরুণ আক্রমণের লক্ষণ ও সেই লক্ষণ থেকে রোগ নিরূপণ এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা আলোচনা করা হচ্ছে। লক্ষণগুলি বিবেচনা করা হয়েছে গাছের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় কি ধরনের বাধা সৃষ্টি করছে, কিংবা কি ধরনের ক্রিয়ার মাধ্যমে গাছে প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।

ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

লক্ষণ দেখে রোগনির্ণয় ও প্রতিকার

(১) পচন (Soft rot and death of seedlings)

অনেক ছত্রাকের আক্রমণে পচনের সৃষ্টি হয়, সেই পচন গাছের খুব ছোট চারা অবস্থায় দেখা দিতে পারে—যখন চারা মূল জমি (যদি ছিটিয়ে বোনা হয়) কিংবা বীজতলায় ঢলে পড়ে মারা যায় (damping off), কিংবা মাটির তলায় কন্দের পচন দেখা দিতে পারে যেমন আদার কন্দের পচন (soft rot of rhizome), হলুদের কন্দের পচন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে গুদামজাত অবস্থায় পচন দেখা যায়, সেক্ষেত্রে আক্রমণ মাঠে ফসল তোলার আগেই শুরু হয়, গুদামে অস্থায়ীকর পরিবেশ (অতিরিক্ত গরম, আর্দ্র, কিংবা গাঙ্গাগাদি করে রাখার ফলে) পচন শুরু হয়। তার মূল কারণ কন্দগুলি জীবিত অবস্থায় থাকে, একত্র ঠাসাঠাসি করে রাখলে জীবিত কন্দের শ্বাসপ্রশ্বাসে তাপ ও জল নির্গত হয় এবং পচনের আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই ধরনের পচন সৃষ্টিকারী ছত্রাক মাটিতে থাকে এবং কোনও গাছকে আক্রমণ করার সুযোগ না থাকলেও জীবিত থাকতে পারে। এইসব আক্রমণকারী ছত্রাক প্রচুর পরিমাণে পেকটিন ধ্বংসকারী উৎসেচক (pectolytic enzyme) সৃজন করবার ক্ষমতা রাখে—এর ফলে গাছের কোষের প্রাচীরের (cell wall) সিমেন্ট জাতীয় বস্তু বা কোষগুলিকে একত্রিত করে রাখে, তার বিনাশ হয়, ফলে কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং শেষে মারা যায়। অত্যন্ত দ্রুতভাবে এই ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার দরুন কোষের মধ্যের জল বার হয় এবং পচনের সৃষ্টি করে। আক্রমণকারী ছত্রাক আক্রান্ত গাছের ব্যাপারে বিশেষ বাছাই করে

না। বীজতলায় বা মূল মাঠে খুব ছোট অবস্থায় চারার মৃত্যু রোধ করতে গেলে বীজ শোধন করে, বিশেষ করে জৈব পারাঘটিত রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে শোধন করে বোনা উচিত। বীজের গায়ে যে সামান্য পরিমাণ ওষুধ লেগে থাকে তা বীজ মাটিতে বোনার পর, বীজের চারপাশের মাটিকে মোটামুটি ছত্রাকমুক্ত রাখতে পারে। ফলে খুব ছোট অবস্থায় আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। চারা একটু বড় হ'লে আক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। যে সব ছত্রাক এই রোগ সৃষ্টি করে, তাদের কার্যক্ষমতা জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে—জমিতে বেশী জল থাকলে পচন খুব দ্রুত হয়। সেজন্য জমিতে জল বার করার সুবন্দোবস্ত থাকা উচিত। সবজির চারা যে বীজতলায় তোলা হবে সেই বীজতলার মাটি যেন বেলে দোআঁশ হয় এবং সহজে জল বার হতে পারে। বর্ষায় শীতকালীন সবজির চারা তোলার জন্য সেজন্য অনেক সময় ছাউনির ব্যবস্থা করা হয় বৃষ্টির জলে জমি অতিরিক্ত ভেজার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। চারা বাঁচানোর জন্য ০.১% জৈব পারা দ্রবণ (এমিসান-৬—১ লিটার জলে ১ গ্রাম) কিংবা ০.৪% তামা ঘটিত ওষুধ যথা ব্রাইটস্ক, ফাইটো-ল্যান, ব্লু কপার প্রভৃতি দ্রবণ বীজতলার মাটিতে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। বিকল্পে ০.২৫% (এক লিটার জলে ২.৫ গ্রাম) জিনেব, ম্যানেব, ম্যানকোজেব (ডাইথেন জেড-৭৮, ডাইথেন এম-২২, ডাইথেন এম-৪৫) প্রয়োগ করাও চলে। তবে যে জাতীয় ছত্রাক সাধারণতঃ আক্রমণ সৃষ্টি করে, তাদের উপর তামাঘটিত ওষুধের ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী কার্যকরী।

মাটির নীচের কন্দ মাঠে পচনের জন্ম একই ধরনের ব্যবস্থা নিলে সুফল পাওয়া যাবে। তবে এই ধরনের ফসলে অনেক প্রজাতির আক্রমণ প্রতিরোধের কিছুটা ক্ষমতা থাকে, যেমন আদার কন্দ পচনে 'নাদিয়া', গরুবাধান (সাম্বিয়াং), প্রজাতির মধ্যে কম পচন দেখা যায়। এক্ষেত্রে ০.১% জৈব পারা দ্রবণে কন্দখণ্ড যা মাটিতে লাগান হবে সেগুলি ৩—৪ মিনিট রেখে শোধন করতে হবে।

গুদামজাত অবস্থায় পচন প্রতিরোধ করার জন্ম গুদামজাত করার আগে যে সব কন্দে মাটি থেকে তোলার সময় ক্ষত থাকবে সেগুলি বাদ দিতে হবে। ভালভাবে পরিকার করে ০.২৫% জিনেব, ম্যানেব বা ম্যানকোজেব বা ০.৪% তামাঘটিত ওষুধে ৩—৪ মিনিট রেখে শোধন করে গুদামজাত করলে পচন কম হবে। তাছাড়া গুদামে রাখার পরিবেশ যেন স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

(২) গাছের জল গ্রহণে বাধা (Prevention of absorption of water)

মাটিতে অবস্থানকারী ছত্রাক বিশেষ করে রাইজোকটোনিয়া (Rhizoctonia), ফিউসেইরিয়াম (Fusarium), স্ক্লেসোরিয়াম (Sclerotium) অনেক সময় শিকড় আক্রমণ করে শিকড়ের বিনাশ ঘটায় অস্তুতঃ আংশিকভাবে। ফলে গাছ মাটি থেকে জল ও দ্রবণীয় খাদ্য নিতে পারে না, গাছ কমজোরী হয়ে পারে তাতে ফলন কম হয়। অনেক সময় গাছ মারা যেতেও পারে। এই রোগ বিভিন্ন জাতীয় গাছে দেখা যায়, কেননা এই সব ছত্রাকের অনেক গাছকে আক্রমণের ক্ষমতা থাকে। সাধারণতঃ

মাটি মাঝারি রকম ভিজে থাকলে এই ধরনের ছত্রাকের আক্রমণ বেশী হয়। মাটিতে জল জমলে বা জলের অভাব ঘটলে শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা কিছু শাখা শিকড় মারা গেলে সেই মৃত শিকড়কে আশ্রয় করে এই জাতীয় ছত্রাক যে সব শিকড় জীবিত ও সুস্থ আছে তাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণ অনেক সময় মাটির সংলগ্ন শিকড় ও কাণ্ডের সংযোগস্থলেও গাঢ় বাদামী বা কাল দাগ হিসাবে দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে আক্রান্ত জায়গায় পচনও ধরে। এক্ষেত্রে 'গোড়া পচা' রোগ বলা হয়। সাধারণতঃ মাটির উপরের কাণ্ডে বা পাতায় কোন দাগ দেখতে পাওয়া যায় না। এই রোগে আক্রান্ত গাছে পচনের জায়গায় অনেক সময় ছোট সরিষার দানার আকারে স্ক্লেসোরিয়া (Sclerotia) দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্তকারী ছত্রাকগুলি বিভিন্ন জাতীয় গাছ আক্রমণ করে বলে শস্ত পর্ষায়ের মাধ্যমে রোগ দমন করা সম্ভব নয়। মাঠের ফসলে এই রোগ দেখা দিলে ব্রাসিকল ২০% গুঁড়ো (Brassicol 20 dust) প্রতি একরে ১০—১২ কেজি পরিমাণ মাটিতে প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। হস্তচালিত ডাষ্টিং যন্ত্রের সাহায্যে ওষুধ প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়, কেননা এতে ওষুধের অপচয় হয় না এবং প্রয়োগ সুষ্ঠু হয়। অনেক সময় ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট (DAP) আক্রান্ত জমিতে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় কেননা এতে নতুন শিকড় গজাতে সাহায্য করে—তার ফলে গাছের জল ও জলে দ্রবীভূত খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া অনেকটা স্বাভাবিক হয়।

ফলের বাগানে নজর দেওয়া উচিত, যাতে

জল না জমে বা জলের অভাব না ঘটে। উভয় ক্ষেত্রেই এই ধরনের রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। প্রচুর পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করা উচিত। কলমের চারা হলে, এমন প্রজাতির উপর কলম বাঁধতে হবে, যা শিকড় বা গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

(৩) ঢলে পড়া (Wilt)

এই রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়াম ছোট শিকড় বা মূল রোমে প্রথম আক্রমণ করে মূল শিকড়ের মধ্যে জল বহনকারী নালিকার (Xylemvessels) মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে জল বহনকারী নালিকাগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং গাছের শিকড় থেকে উপরে জলপ্রবাহ হয় না, ফলে গাছে জলাভাব ঘটে এবং আক্রান্ত গাছটি ঢলে পড়ে এবং মারা যায়। আক্রান্ত গাছের চেহারা অনেকটা জলাভাবগ্রস্ত গাছের মতন হয়, শিকড় পচা বা গোড়া পচার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ঢলে পড়া সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত আকস্মিকভাবে ঘটে এবং খুব ছোট অবস্থায় দেখা যায় না—গাছ কিছুটা বড় হয়ে উঠলে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। ঢলে পড়া রোগ আংশিক বা সম্পূর্ণ হতে পারে।

ঢলে পড়া রোগে আক্রান্ত গাছকে সুস্থ করা যায় না বা ঢলে পড়া রোগ জমিতে দেখা দিলে সেই মরসুমে রোগ দমন করা সম্ভব নয়। ঢলে পড়া রোগের প্রতিকারের জন্ম দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যথা—(ক) শস্য পরীয়া, (খ) রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির চাষ। ঢলে পড়া রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়াম মৃত্তিকাশ্রয়ী, কিন্তু কোনও বিশেষ ছত্রাক বা

ব্যাকটেরিয়াম একটি বা খুবই সীমিত সংখ্যার গাছকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেই গাছের জীবিত বা মৃত অংশ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। পরিচর্যাও সেই জন্ম এই রোগে প্রয়োজন। জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটিতে জীবাণুর সংখ্যা বাড়ে এবং যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি খাদ্য ও অক্সিজেনকে কেন্দ্র করে সেই প্রতিযোগিতায় রোগ সৃষ্টিকারী অল্প জীবাণুর সঙ্গে পেরে ওঠে না, ফলে তাদের সংখ্যা কমে যায় এবং রোগের তীব্রতা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) নতুন কোষ তৈরী হওয়ার দ্রুত বিভিন্ন লক্ষণ (Increased meristematic activity)

সাধারণতঃ ক্লাবরুট (clubroot), গুটি ধরা (gall formation), পাতা কৌঁচকান (leaf curl), দীর্ঘদিন স্থায়ী কলের বা বনের গাছের ক্ষত (canker) প্রভৃতি এই প্রক্রিয়ার দ্রুত সৃষ্টি হয়। কিছু ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, এমন কি ভাইরাস গাছের মধ্যে প্রবেশ করে গাছের নতুন কোষ সৃষ্টি বা কোষের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরমোন অতিরিক্ত পরিমাণে সৃষ্টি করে, কিংবা কিছুটা বিনাশ করে গাছের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফলে গাছের অতিরিক্ত সংখ্যায় নতুন কোষ সৃষ্টি হয় এবং কোষের আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় যার ফলে এই ধরনের বিভিন্ন লক্ষণ গাছে দেখা যায়। এই ধরনের রোগে সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা (sanitary methods) এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বিনাশের দিকে জোর দেওয়া হয়।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, ওলকপি

প্রভৃতি ফসলে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এলাকায় যথা হিমালয়স্থিত পার্বত্য অঞ্চলে শিকড়-মূল এবং শাখা প্রশাখাগুলি ক্ষীত হয় এবং তুলনামূলকভাবে অস্বাভাবিক আয়তনের হয়—ফলে খাচ্চ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয় এবং গাছ কমজোরী হয়। এই রোগ ক্লাবরুট নামে পরিচিত। অল্প মাটিতেই এই রোগ হয়। মাটি পরীক্ষা করে হিসাব মত চুন প্রয়োগ করে অল্পস্থ বা পি. এইচ. ৬.৫ বা তার কাছাকাছি আনলে এই রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকের বৃদ্ধি ও কার্যক্রম প্রচণ্ডভাবে বাহত হয়, ফলে রোগের প্রকোপ কমে।

আলুর দেদো রোগ (scab) আক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ামের এই ধরনের সীমিত প্রতিক্রিয়ার ফল। এই রোগ দমনে জৈব সার অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করলে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়।

কুমি জাতীয় প্রাণীর আক্রমণে বিভিন্ন জাতীয় গুটি (gall) আক্রান্ত গাছে দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের গুটি সৃষ্টিকারী কুমির আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পৃথক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন। যেমন শিকড়ে গুটি সৃষ্টিকারী কুমির দমনের জন্য (Root knot nematode) কারবোফুরান (যথা ফুরাডান ওজি) একরে ১২ কেজি হিসাবে প্রয়োগ করার সুপারিশ করা হয়। এই ওষুধ দানাদার, মাটিতে শিকড়ের কাছে দেওয়া উচিত—যাতে মূল্যবান ওষুধের অপচয় না ঘটে এবং প্রয়োগের সময় মাঠ ভিজ়ে থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেননা কার্যকরী হওয়ার জন্য দানাদার ওষুধ জলে দ্রবীভূত হয়ে শিকড়ের

মাধ্যমে গাছে প্রবেশ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রীষ্মকালে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে ফেলে রাখলে কুমির সংখ্যা কমে যায়, ফলে আক্রমণও কম হয়।

অনেক সময় গমের ক্ষেতে এমন শিষ দেখা যায়, যেগুলি সোজা না হয়ে বাঁকা হয়ে থাকে এবং শিষে দানা থাকে না—থাকলেও আয়তনে বড় হয়—এটি গমের গুটি রোগ, কুমির আক্রমণের দরুণ এই রোগ সৃষ্টি হয়। বীজবাহিত এই রোগের প্রতিকারের জন্য গম বোনার আগে গমবীজ ১০% লবণ দ্রবণে (এক লিটারে ১০০ গ্রাম সাধারণ নুন) রাখলে গুটি রোগাক্রান্ত বীজগুলি ভেসে ওঠে এবং সেগুলিকে সহজে বাদ দেওয়া যায়। তারপর বীজ শোধন করে বুনলে রোগমুক্ত গমের ফসল পাওয়া যায়।

বর্তমানে অনেকে মসলার জন্য ধনে চাষে আগ্রহী। ধনে গাছের ফলে এবং কাণ্ডে এই ধরনের গুটির আকারে ফল বা কাণ্ডে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা ফুলে যাওয়া লক্ষ করা যায়। একই উপায়ে রোগ দমন করা সম্ভব। বর্তমানে সরিষা গাছের শিকড়ে যে গুটি দেখা যাচ্ছে তা ভুসা রোগের আক্রমণে। বীজ শোধন করে বোনাই রোগ দমনের সহজ উপায়।

গাছে ক্যানকার, বিশেষ করে লেবু গাছের কাণ্ডে দেখতে পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে গাছের আক্রান্ত ডাল কেটে বাদ দিয়ে তামা ছটিত ওষুধ যথা ব্রাইটজ, ফাইটোল্যান, ব্লুপার প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম পরিমাণ হিসাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

[বাকী অংশ পরের সংখ্যায়]

শীতের সবজি চাষে সার কথা

শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পুষ্টি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক লোকের দৈনিক প্রায় ৩০০ গ্রাম শাক-সবজি খাওয়া দরকার। শাক-সবজি আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও লবণ জাতীয় খাদ্যের সহজলভ্য উৎস। অর্থকরী ফসল হিসেবেও শাক-সবজির চাষ লাভজনক।

সবজি চাষের জমি তৈরীর সময় প্রতি দশ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে ১০—১২ মন গোবর বা আবর্জনা সার এবং ১৫ কেজি পাঁচ শতাংশ হেপ্টাক্লোর বা অলড্রিন মিশিয়ে নিন। শেষ চাষের আগে নিচের তালিকা অনুসারে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ঘটিত সার প্রয়োগ করুন।

সবজির নাম	উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ একর প্রতি কেজিতে			একর পিছু সার প্রয়োগের পরিমাণ (কেজি)			
	নাঃ	ফঃ	পঃ	জমি তৈরীর সময় ইউরিয়া সিঙ্গল মিউরেট সুপার অফ ফসফেট পটাশ			ইউরিয়া চাপান দেবার সময়
১। ফুলকপি ও বাঁধাকপি	৪৮	২৪	২৪	৫২	১৫০	৪০	২৬ কেজি ১৫ দিন পরে ২৬ " ৩৫ " " "
২। বেগুন (শীতকালীন)	৪৮	২৪	২৪	৫২	১৫০	৪০	২৬ কেজি ২১ দিন পরে ২৬ " ৪২ " " "
৩। পেঁয়াজ	৪৮	২৪	৪৮	৫২	১৫০	৮০	৫২ কেজি ৩০ দিন পরে
৪। ওলকপি, মূলা, পালং	২৮	১২	১২	৩০	৭৫	২০	৩১ কেজি ২১ দিন পরে
৫। মটরশুঁটি	২০	২০	২০	৪৪	১২৫	৩৩	—
৬। বাট, গাজর, টমেটো	৩২	১৬	১৬	৩৫	১০০	২৭	১৭ কেজি ২১ দিন পরে ১৭ " ৪২ " " "

চাপান সার চারার গোড়া থেকে কিছুটা দূরে ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিন। শস্যরক্ষার দিকে নজর রাখুন।



ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

(শেষ অংশ)

পানের রোগ

আগেই বলা হয়েছে যে পানের রোগ সম্বন্ধে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ একটু অসতর্ক থাকলে পরে রোগের আক্রমণে পুরো বরজটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রোগ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকার জন্ত কুসংস্কার বশতঃ মহিলাদের বরজে কাজ করতে দেয়া হয় না।

পানের তিনটি প্রধান রোগ হ'ল

- (১) গোড়া পচা বা ঢলে পড়া রোগ
- (২) পাতা পচা রোগ
- (৩) পাতায় দাগ ধরা রোগ।

গোড়া পচা বা ঢলে পড়া রোগ

এই রোগের আক্রমণ সর্বত্রই দেখা যায়। ছুটি আলাদা আলাদা ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং কোন কোন সময়ে এই রোগের আক্রমণে ৮০ ভাগ গাছ মরে যেতে পারে।

রোগের লক্ষণ

প্রথমে লতার গাঁটে বা ডাঁটাতে কালো রঙের দাগ দেখা যায়। বর্ষাকালে এই কালো দাগটি ডাঁটার চারদিক ঘিরে ফেলে। এতে ডাঁটা পচে যায় এবং উপরের দিকটা শুকিয়ে যায়। অনেক সময় এ ধরনের দাগওয়ালা লতা বা ডাঁটা পচতে দেখা যায় না। লতা সতেজীকরণ করার জন্ত নামিয়ে এনে মাটি চাপা দেবার পর আক্রান্ত অংশ পচতে আরম্ভ করলে লতা মরে যায়। আর বৃষ্টি হলে তো খুব তাড়াতাড়ি পচতে শুরু করে লতা মরে যায়।

প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), পঃ বঃ ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, কলিকাতা-১১।



পান চাষ

স্থায়ী চন্দ্র পাল

ডাঁটা পচা রোগ ও পাতা পচা রোগের জীবাণু একই প্রকারের। কেবল রোগের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হয় বলেই বিভিন্ন নাম দেয়া হয়ে থাকে।

এ সব রোগই ফাইটোপথোরা জমিত রোগ। এ রোগের দ্বারা বর্ষাকালের প্রথমদিকের আক্রমণে পুরো বরজটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রোগ দমন (ফাইটোপথোরা জনিত গোড়া পচা, ডাঁটা পচা ইত্যাদি)

যে সব এলাকাতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সে সব এলাকাতে গ্রীষ্মের পর বর্ষা শুরু হবার সময়ে বছরের প্রথম সতেজীকরণ করার অন্তত ১৫ দিন আগে গাছের পান তুলে নিতে হবে এবং তারপর লিটার প্রতি চার গ্রাম তামাঘটিত ওষুধ যেমন ব্রাইটস্ক, ফাইটোলান বা ব্লু কপার মিশিয়ে স্প্রেয়ার দিয়ে ভালভাবে ছেঁটাতে হবে গাছের ডাঁটাতে। লতা নামানোর পর মাটিতে গুটিয়ে রাখা লতার উপরে আবার একইভাবে ওষুধ স্প্রে করে তার ২১ দিন বাদে মাটি চাপা দিতে হবে সতেজীকরণ করার জন্য। এ ছাড়া মাসে দুবার করে বোর্দো মিশ্রণ ১ কেজি তুঁতে, ১২ কেজি চুন ও ১০০ লিটার বা সাড়ে পাঁচ টিন জল ও তিনটি মাটির অথবা কাঠের গামলা নিতে হবে। আলাদা আলাদা ভাবে রাতে তুঁতে ও চুন ভিজিয়ে রাখুন—আগে গুঁড়ো করে নিয়ে। সবটা ভালভাবে গুলে গেল কিনা তা সকালে দেখে নিতে হবে। এবারে তৃতীয় পাত্রে একই সঙ্গে তুঁতে গোলা এবং চুন গোলা ঢেলে ১০০ লিটারের বাকি জলটা মিশিয়ে দিতে হবে। কাঠের বা বাঁশের হাতা দিয়ে ভালভাবে নেড়ে পাতলা কাপড় দিয়ে ছেকে দিয়ে দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্প্রে না করলে তৈরী করা ওষুধের গুণ অনেকটাই কমে যাবে। অনেকে বলে থাকেন যে বাংলা পানে এ রোগ কম দেখা যায়।

স্ক্রেরিসিয়াম জনিত গোড়া পচা রোগ

এ প্রদেশের প্রায় সব জায়গাতেই এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এ রোগকে অনেকে মহুয়া রোগ বা গেদি রোগ বলে থাকেন।

রোগের লক্ষণ

এই রোগের আক্রমণের সাথে সাথে পাতার চকচকে ভাবটা নষ্ট হয়ে যায় এবং পাতা ক্যাকাশে হলদে হয়ে চলে পড়ে ও পাতা ঝরে পড়ে এবং গাছ শুকিয়ে যায়। মাটির কাছাকাছি অংশের রং বাদামী থেকে কালো হতে শুরু করে। মাটিতে লেগে থাকা অংশ ও মাটির ভেতরের ডাঁটার অংশ ভেজা ভেজা হয়ে পচে যায় এবং পচা জায়গার উপর সাদা সাদা তুলোর মত দেখায়। আবার অনেক সময় মাটির উপরের অংশে খুব ছোট ছোট অসংখ্য সাদা সাদা বা বাদামী রংয়ের ছত্রাক দানা দেখতে পাওয়া যায়।

রোগ দমন

এ রোগের জীবাণু আক্রান্ত গাছের ডাঁটায় এবং মাটিতে থাকে। রোগের লক্ষণ দেখার সাথে সাথেই গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলা দরকার অথবা বরজের বাইরে গর্ত করে পুঁতে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছত্রাক দানাগুলি ছড়িয়ে না পড়ে। এই দানাগুলি ছড়ানো মানেই রোগ ছড়ানো।

এই রোগের লক্ষণ দেখার সাথে সাথেই বিছা প্রতি ৭—১০ কেজি ত্রাসিকল শতকরা ২০ ভাগ গুঁড়ো বরজের সব পানিগাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দিতে হবে। ওষুধ ছড়াবার পর সামান্য জল ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে করে ওষুধ সহজেই মাটির সাথে মিশে যেতে পারে। আর যদি প্রয়োজন মত ওষুধ সংগ্রহ করতে না পারা যায় তাহলে আগে বলা পদ্ধতি অনুযায়ী গাছ পুড়িয়ে ফেলতে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আর গাছের গোড়ার চারদিকে ত্রাসিকল ছড়িয়ে দিতে হবে।

পাতা পচা রোগ

সর্বত্রই এই রোগ দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে এই রোগের জীবাণু ফাইটোপথোরা দ্বারা পানের গোড়া পচা রোগও হয়ে থাকে। তবে গোড়া পচা রোগ সব এলাকাতে দেখা যায় না বা এই রোগ গাছের নিচের দিকের পাতার বিশেষ ক্ষতি করে না। উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিলে পরে শতকরা ২৫ ভাগ পর্যন্ত পানের পাতার ক্ষতি হতে পারে, ফলে বাজারে পাতার দাম কমে যায়।

রোগের লক্ষণ

এই রোগের আক্রমণে পাতার যে কোনও জায়গায় বাদামী বা কালো রঙের ভেজা ভেজা পচা দাগ দেখা যায় আর এই দাগ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে বাড়তে পাতার অর্ধেক বা তারও বেশী জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষার আবহাওয়ায় অর্থাৎ মাঝে মাঝে বৃষ্টি এবং মাঝে মাঝে শুকনো এরকম পরিবেশে পানপাতার আক্রান্ত অংশের মাঝে চক্কাকার, ঢেউ খেলানো, হালকা রংয়ের দাগ দেখা যায়। এই রোগে পাতার পচা অংশের চারদিকে হলদে দাগ থাকে না পাতার দাগ ধরা রোগের মতো।

রোগ দমন

গোড়া পচা রোগ বা চলে পড়া রোগের মতই বর্ষার আগে প্রতি লিটার জলে ৪ গ্রাম হিসাবে তামাষটিত ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান বা ব্লু কপার ইত্যাদির যে কোনও একটি মিশিয়ে সমস্ত গাছটিকে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে স্প্রেয়ারের সাহায্যে। প্রথমবার স্প্রে করার পর ১৫ দিন বাদে আরেকবার স্প্রে করতে হবে এবং তারপর দরকার মত আরও

২-৩ বার ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

পাতায় দাগ ধরা রোগ

কলিটোটি কাস ক্যাপমিসি-ছত্রাক জীবাণু জনিত এ রোগ সর্বত্রই দেখা যায়। কোথাও কোথাও এ রোগকে বলা হয় আঙ্গারী বা চিত্রা। রোগের লক্ষণ

এ রোগের আক্রমণে পানের পাতায় কালো বা বাদামী রঙের ভেজা ভেজা দাগ দেখা যায়। এ দাগ পাতার যে কোন জায়গায় হতে পারে এবং যে কোন আকারেরও হতে পারে। প্রতিটি বাদামী বা কালো দাগের চারপাশের কিছুটা জায়গা হলদে রঙের হয়ে থাকে। একটি পাতাতে এ ধরনের অনেকগুলি দাগ থাকতে পারে। পাতাতে কালো বা বাদামী দাগের চারদিকে হলদে রঙের দাগ দিয়ে ঘেরা মানেই পাতার দাগ ধরা রোগ। আর এ রোগের আক্রমণে লতার নিচ দিকের পাতা আক্রান্ত হয়ে ক্রমশঃ উপরের দিকের পাতা আক্রমণ করে। এ রোগের আক্রমণে পাতার খুবই ক্ষতি হয় এবং গরম ঋতুসেতে আবহাওয়াতে দাগগুলি বড় হতে হতে ডাঁটার চারদিক ঘিরে ফেলে এবং আক্রান্ত জায়গার উপরের লতার অংশটি শুকিয়ে যায়।

রোগের আক্রমণ

সারা বছরই এই রোগ পান বরজে দেখা গেলেও বর্ষার শুরু থেকে রোগের প্রকোপ বাড়ে এবং শীতকালে তা কমে যায়।

রোগ দমন

বর্ষা শুরু হবার আগে থেকেই এ রোগ প্রতিরোধ করার জন্ম প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম ডাইফোলাটান বা ২ গ্রাম জাইরাম শতকরা ৮০

বহুদ্রা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

ভাগ জলে গোলা গুঁড়ো অথবা ৩ মিলি লিটার হিসাবে কুমান এল বা ১ গ্রাম হিসাবে ব্যাভিষ্টিন মিশিয়ে গাছের পাতা ডাঁটা সব জায়গাতে খুব ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। প্রথমবার ওষুধ দেবার ২০—২১ দিন বাদে আবার একইভাবে ওষুধ স্প্রে করতে হবে। দরকার হলে আরও ২-৩ বার ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

পানের কীটশত্রু

পানে পোকাকার আক্রমণ খুবই কম। তবে কোথাও কোথাও কিছু কিছু সাদা মাছি, চিরুনি পোকা, লাল-থয়েরি রঙের গন্ধি পোকা বা কোথাও জাব পোকা বা মেরি পোকা এবং রস চোসা পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়। এ সব পোকাকার আক্রমণ সাধারণতঃ বর্ষাকালেই হয়।

প্রতিকার হিসেবে তামাক পাতার সাথে সাবান গোলা জল ব্যবহার করে অনেক সময়েই সফল পাওয়া যায়। আর তাছাড়া প্রতি লিটার জলে সাইথিয়ন ২ মিলি লিটার মিশিয়ে প্রতিবার পান তোলার পরে গাছে স্প্রে করলে পোকাকার আক্রমণ সাধারণতঃ হয় না। এ সব সত্ত্বেও যদি পোকাকার আক্রমণ দেখা যায় তাহলে তা দমনের জন্তু নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(১) রস চোসা পোকা দমনের জন্তু শতকরা ০.০৫ ভাগ ম্যালাথিয়ন ব্যবহার করা প্রয়োজন। কোথাও আবার এ সব পোকা দমনের জন্তু প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম শতকরা ৫০ ভাগ বি-এইচ-সি মিশিয়ে গাছে দিয়ে ভাল ফল পাওয়া গেছে। আবার কোথাও বি-এইচ-সি শতকরা ১০ ভাগ গুঁড়ো পাতার উপরে ছড়িয়েও ফল পাওয়া গেছে।

(২) তামাক-সাবান জল তৈরী করার জন্তু

১০০ গ্রাম তামাক ডাঁটা এক লিটার জলে সারা রাত্রি ভিজিয়ে রেখে ৪০ গ্রাম সাবান সাবানের গুঁড়ো ১ লিটার জলে আধ ঘণ্টা ফুটিয়ে আরও ৮ লিটার জলে ছটিকে মিশিয়ে নিয়ে আক্রমণ অনুযায়ী ১ মাস বা ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করবেন।

মনে রাখা দরকার যে রাসায়নিক ওষুধ পানে ব্যবহার করলে পরে ২০ দিনের মধ্যে সেই পান না তোলাই ভাল।

পানের রোগ কমানোর জন্তু কিছু সাবধানতা

১। নতুন বরজ করার সময় রোগমুক্ত বরজ থেকে লতা সংগ্রহ করবেন।

২। ওষুধ প্রয়োগের অন্তত ২০ দিন বাদে বিক্রির জন্তু পান তুলতে হবে।

৩। নীচ থেকে দেড় হাত মত লতা বাদ দিয়ে চারা সংগ্রহ করতে হবে এবং রোগ প্রতিরোধ করার ওষুধ স্প্রে করতে হবে এবং এর ১৫ দিন বাদে পাতা পচা রোগের ওষুধ স্প্রে করতে হবে। তারপর ১৫ দিন বাদে বরজ থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ লতা সংগ্রহের অনেক আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। ডাঁটায় বা পাতায় দাগ থাকলে লতাটি বাদ দিতে হবে।

৫। রোগের আক্রমণে যে বরজ নষ্ট হয়ে গেছে সেই বরজে পান লাগান ঠিক নয়। ২—৩ বছর সেখানে ধান গম লাগিয়ে পরে ঐ জমিতে আবার পান চাষ চলতে পারে।

৬। বর্ষা শুরু হবার আগে থেকেই প্রয়োজন মত ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে।

৭। বর্ষাকালে মাটি থেকে হাতখানেক লতা থেকে পান তুলে নিয়ে গাছের গোড়া

খালি করে দিলে পরে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়।

৮। বর্ষাকালে প্রতিদিন পান বরজে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থার দিকে নজর রাখবেন।

৯। লতা নামাবার আগে তামাঘটিত ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

১০। রাসায়নিক সার ব্যবহার না করাই ভাল। সরষের খোলার পরিবর্তে বাদাম ও তিল খোল ব্যবহার করা দরকার।

১১। শীতকালে পানের দাম বেশী হয়। সেজন্ত বর্ষাকালে লতা থেকে পান না তুলে শীতকালে বিক্রীর জন্ত রাখুন এবং ঐ পান যাতে নষ্ট না হয় তারজন্ত পাতায় দাগ রোগ প্রতিরোধ করার জন্ত মাঝে মাঝে ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

১২। পান বরজের ভিতর বা বাইরে কচু, পুঁই, পটল ইত্যাদি চাষ না করাই শ্রেয়।

১৩। খড়ি বা শর জাতীয় গাছ ব্যবহারের আগে ভালভাবে আগে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। শুকানোর পর খড়ির গোড়ার দিকের ১ হাতের মত জায়গা ১ লিটার জলে ৫ গ্রাম হিসেবে ত্রাসিকল গোলা ওষুধে ভিজিয়ে নিতে হবে। অনেক সময় খড়ির গোড়ায় পানের গোড়া পচা রোগের জীবাণু থাকে। এ ভাবে ত্রাসিকল ব্যবহার করলে সেই রোগ দমন হবে।

১৪। স্প্রেয়ার মেশিন দ্বারা ওষুধ ছেটাতে বা স্প্রে করতে হবে। খড় বা খেজুর পাতা দিয়ে ওষুধ ছেটালে কোনও কাজ হবে না। পরিমাণ মত ওষুধ দিয়ে গাছের ডাঁটা ও পাতার ছদিক বেশ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

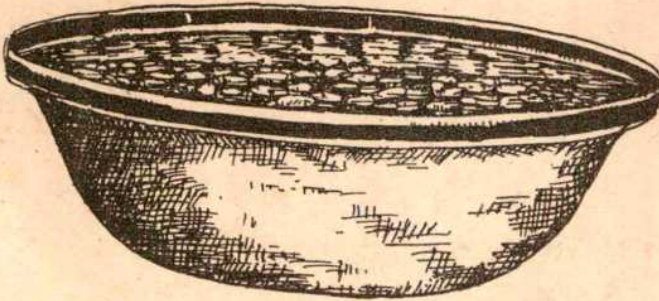
বিশেষ সাবধানতা

পান কাঁচা খাওয়া হয়। আর তাই ওষুধ পত্র-পত্রিকা ও বই পড়ে দেখা হয়েছে।

প্রয়োগে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। ওষুধ দেবার ২০ দিন বাদেই বিক্রির জন্ত পান তুলতে হবে তার আগে নয়। আর তাই কবে পান তুলতে হবে তা হিসেব করে ওষুধ দিন। প্রয়োজন হলে তবেই পানে ওষুধ দেবেন। মনে রাখতে হবে রাসায়নিক সব ওষুধই মানুষের পক্ষে ওষুধ প্রয়োগের ১৫—২০ দিন পর্যন্ত বিষাক্ত।
নজিরাদি রূপে গ্রন্থাদির উল্লেখ

- ১। বসুন্ধরা—ভাত্র-আশ্বিন — ১৩৮৪
- ২। বসুন্ধরা—মাঘ — ১৩৯০
- ৩। পানের রোগ ও তার প্রতিকার—
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় — ১৯৮১
- ৪। পান—
জেলা কৃষি করণ, হাওড়া — ১৯৮৪
- ৫। Plant diseases
R. S. Mathur — 1969
- ৬। Plant Protection—
P. R. Mehta
&
B. K. Varma — 1968
- ৭। Principles and
procedures of Plant
Protection—
S. B. Chattopadhyay — 1980
- ৮। Summary report on
Betelvine cultivation in
West Bengal, Govt. of
West Bengal — 1978

এই প্রবন্ধ লিখবার সময়ে উপরে লিখিত



অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

স্বজিত কুমার রায়

আমাদের দেশে কোন কোন শস্তবীজ মাঠে বোনার আগে জলে ভিজিয়ে বোনার যে রীতি চালু আছে গমবীজের ক্ষেত্রেও তার কোন লাভজনক উপযোগিতা আছে কিনা তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই পরীক্ষা করছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি কলেজের খ্যাতনামা থয়রা অধ্যাপক রথীন্দ্রনারায়ণ বসু। তিনি এই কাজে পরিকার জল এবং আরও বেশ কিছু দ্রবণের ব্যবহার করেন। আমাদের কৃষি বিভাগের রাজ্য বীজ পরীক্ষাগারে বীজের ফসলোত্তর সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং শ্রাক বপন বীজ শোধন পদ্ধতির উপর দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপক বসুর উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলির বাস্তব নিয়োগ চাবীভাইদের ক্ষেত্রে কতটা উপযোগী হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এর আগে আমরা রাজ্য বীজ পরীক্ষাগার, বর্ধমান ও টালিগঞ্জ।

**গমবীজ বোনার
আগে
জলে কিংবা
দ্রবণে ভিজিয়ে
শুকনো করে
বুনুন**



অভিমত। আধা নোনা জলে সেচ দিয়েও একরে ২০ টন উৎপাদন হয় সুগার বীট। সাগরদ্বীপ, কাকদ্বীপ, রাঙাবেলিয়া, মথুরাপুর-২, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এর চাষ করে কৃষকরা নিজেদের দরকার মেটাবার ঝোলাগুড় তৈরি করেছেন। প্রতি ২০ টনের জন্ম কৃষকদের ২৪০০ টাকা দিতে তিনি প্রস্তুত বলে ডঃ সরকার বলেন। 'ভবিষ্যতে কৃষি মানচিত্রে ২৪ পরগণা তার নোনা জমি-পীড়িত একফসলী এলাকার কলঙ্ক ঘুচিয়ে গৌরবময় স্থান লাভ করতে পারবে বলে আমি মনে করি।' ডঃ সরকারের এইটি ছিল উপসংহার মন্তব্য।

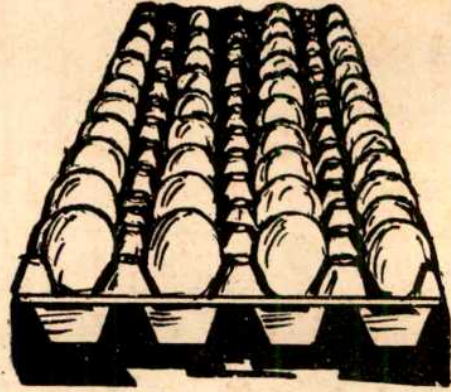
শস্য রক্ষা বিষয়ক যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রী দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সুরসংহত রোগ দমন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। প্রথম থেকেই রাসায়নিক ওষুধ দিয়ে রোগ

দমনের পদক্ষেপ না নিয়ে প্রাথমিক দায়িত্ব এমনভাবে নিতে হবে যাতে রোগের কারণগুলো বন্ধ হয়। ভালো বীজের ব্যবহার, বীজ শোধন, জমির পরিচ্ছন্ন চাষ, ঠিকমতো জমি কাদানো, জ্বির তদারকি, রোগের আক্রমণ বোকা ও লক্ষণ নির্ণয়, যন্ত্রের মাধ্যমে ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে ঠিক জায়গায় ঠিক মাত্রার ওষুধ দেয়া প্রভৃতির ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।

শ্রী লালমোহন প্রামাণিক ও ডঃ ভরতেন্দু শর্মা রোগপোকা বিষয়ে কৃষকদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দেন।

আলোচনাসভায় সভাপতি এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে আলিপুর বিভাগের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রী সুবোধ পাল ও বারুইপুরের বিধায়ক শ্রী হেমেন মজুমদার।

ডিম সংরক্ষণ



ডিম অত্যন্ত ভঙ্গুর ও সহজেই পচনশীল। সুতরাং ডিম যাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয়ে যায় অথবা শীঘ্রই পচে না যায় তার জ্ঞাত কতগুলি উপায় আছে যা ঠিকমত গ্রহণ করলে ডিমকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত টাটকা রাখা যায়। ডিমকে বেশীদিন তাজা রাখার জ্ঞাত শীতাহুকলিত (Refrigeration) রাখা, তেল প্রয়োগ করা, মোমের প্রলেপ দেওয়া, চুন প্রলেপ দেওয়া এবং থার্মোস্টাবিলাইজেশন (Thermostabilisation) করা প্রভৃতির কোন একটি উপায় গ্রহণ করা দরকার।

রেফ্রিজারেটরে ডিম সংরক্ষণের সময় ডিমের চওড়া দিক ওপরের দিকে রাখতে হবে। এইভাবে ডিম রাখলে ফ্রিজে অন্ততঃ তিন সপ্তাহ ডিম তাজা রাখা যায়।

তেলের প্রলেপ দ্বারা ডিম সংরক্ষণ করতে হলে ডিমগুলি হালকা ওজনের বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন খনিজ তেলে ডুবিয়ে তুলে নিতে হবে। অথবা স্প্রেয়ার দ্বারা এই তেলের একটি হালকা প্রলেপ ডিমগুলির ওপর স্প্রে করে দিতে হবে। এইভাবে তেলপ্রযুক্ত ডিম তিন সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। ব্যবহারের আগে ডিমগুলি

ধুয়ে ও শুকিয়ে নিতে হবে। সেদ্ধ করার সময় ডিমগুলি যাতে ফেটে না যায় তার জ্ঞাত সিদ্ধ করার প্রাকালে ডিমের চওড়া দিকগুলি ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে দিতে হবে।

মোম দ্বারা ডিম শোধন করার জ্ঞাত ডিমগুলি শতকরা ৪০ ভাগ মোম ও ট্রাইক্লোরোথিলিন মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখতে হবে। ডোবানোর আগে ডিমগুলি ৩৫° থেকে ৪০° উত্তাপে পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ড গরম করে নিতে হবে। এইভাবে শোধিত ডিম তিন-চার মাস সংরক্ষণ করা যায়।

চুন দ্বারাও ডিম সংরক্ষণ করা যায়। Calcium oxide মিশ্রিত মিশ্রণ ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে এবং এক রাত পরে সেই জলে ডিমগুলি ১৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবং তার পরে ডিমগুলি তুলে নিয়ে রুম টেম্পারেচারে রাখতে হবে। এইভাবে ডিম তিন সপ্তাহ ভালো থাকে। সব থেকে সস্তা ও সোজা উপায় হলো মাটির পাত্রে ডিমগুলি খড়কুটো দিয়ে ঢেকে রাখা। এছাড়া বায়ুহীন পলিথিন ব্যাগের ভিতর ডিমগুলি রেখে, সেটির মুখ বন্ধ করে জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

(এফ. আই. ইউ.)



পৌষে কৃষকের করণীয়

আমন ধান কৃষকের ঘরে উঠেছে এই পৌষে। এ বছর আমনের ফলনও ভাল। জলের সুবিধা অল্প বছরের তুলনায় এ বছর বেশী। বোরো ধানের চাড়ে খুঁকবেন অনেক কৃষকই।

বোরো ধানে এ মাসে কৃষকের করণীয়, লাঠিশাল ও কলমা-২২২ যারা চাষ করছেন তাদের রোয়ার কাজ শেষ করতে হবে। অগ্নাগ্ন সুপারিশমত জাতের চারা সারা পৌষ মাস রোয়া করা চলবে। রোয়ার সময় সঠিক সংখ্যক গুছি সঠিক ব্যবধানে রোয়া করুন। অধিক ফলনশীল জাতের চারা ২০ সেমি X ১০ সেমি এবং কলমা ও লাঠিশালের চারা ২০ সেমি X ১৫ সেমি দূরত্বে লাগান। রোয়ার গভীরতা যেন ৫ সেমি-র বেশী না হয়।

জমি তৈরির জন্ম ৮—১০ গাড়ী জৈব সার দিন। মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে রাসায়নিক সার দিন।

গম

নাবি বোনা গমে চাপান সার দিন, আগাছা

দমন করুন ও সুপারিশমত সেচ দিন।

আলু

নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন। রোগপোকার আক্রমণ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। সাধারণতঃ পৌষ মাসের মাঝামাঝি থেকে ধসা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এ বিষয়ে সতর্ক হোন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ম্যানকোজেব বা জিনেব অথবা ৪ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড গুলে পাতার ছ-পিঠে ও ডাঁটায় ভালভাবে স্প্রে করুন। রোগের প্রকোপ বুঝে ১০—১৫ দিন অন্তর আরও ২-৩ বার ওষুধ দিন।

সরিষা

ফুল আসার আগে প্রয়োজনবোধে সেচ দিন। জাব পোকার আক্রমণ দমনে ব্যবস্থা নিন।

আখ

৪০—৪৫ দিন বয়সের চারায় নাইট্রোজেন চাপান দিয়ে ভাল বেঁধে দিন, এর ৪০—৪৫ দিন পরে আর একবার চাপান দেবেন।

সংবাদ

আগামী খরিফ মরসুমের চাষের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় ধানবীজ বিশেষ করে স্বল্পমোয়াদী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানবীজ নিজেই রাখুন।

আপনার জমির যে অংশে সবচেয়ে ভাল ফসল হয়েছে, পুষ্ট দান। হয়েছে, সে জায়গাটি বীজের জন্য বেছে নিন। এই অংশে যেন কোন রোগাক্রান্ত গাছ না থাকে। নির্দিষ্ট অংশে অল্প জাতের গাছ বা আগাছা থাকলে তুলে ফেলে দিন। এই অংশের ফসল আলাদাভাবে কেটে ঝাড়াই-মাড়াই করুন। আগাছার বীজ, মাটির টুকরো, খড়কুটো ইত্যাদি থাকলে বেছে আলাদা করুন। সংগৃহীত বীজ কয়েকবার কড়া রোদে সারাদিন রেখে ভালভাবে শুকিয়ে নিন। রোদে দেওয়া বীজ ছায়ায় মেলে ঠাণ্ডা করে নিন। পরে ঠাণ্ডা করা বীজ সংরক্ষণ করুন।

পরামর্শের জন্য স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আগামী খরিফ
মরসুমের জন্য
প্রয়োজনীয়
ধানবীজ
নিজেই রাখুন

অধ্যাপক বসুর উদ্ভাবিত ফসলোত্তর বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি যে কতটা কার্যকরী হতে পারে তা বসুন্ধরা ১৩৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যার ৯—১১ পাতা এবং ১৩৮৯ সালের চৈত্র সংখ্যার ১১—১৫ পাতায় জানান হয়েছে। এইবার এই প্রাক বপন বীজ শোধন পদ্ধতিও যে চাষীভাইদের ক্ষেত্রে কতটা লাভজনক তা আলোচনা করা হবে।

এই পরীক্ষার জন্ম সোনালিকা গমের বীজ ব্যবহার করা হয় এবং বীজ ভেজানোর জন্ম পরিষ্কার জল ও ডাই-সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। ফসল চাষের জন্ম বেছে নেওয়া হয় বর্ধমান জেলা কৃষিক্ষেত্র এবং সিঙ্গুর গবেষণা কৃষিক্ষেত্র। ফসল কাটার পর ভাল ও পুষ্ট গমবীজ বেধ করে ঝাড়াই-মাড়াই করার পর খুব ভাল করে রোদে শুকিয়ে যখন বীজের আর্জতার পরিমাণ ১০ শতাংশের মত তখন পলিথিনের কোঁটো বা বীজ আধারে খুব ভালভাবে সীল করে রেখে দেওয়া হয়। ফসল মাঠে বোনার ঠিক আগের দিন বীজগুলি পাত্র থেকে বার করে নিয়ে পরিষ্কার জলে কিংবা ডাই-সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণে (এক্ষেত্রে প্রতি কেজি বীজে ১ লিটার জল এবং প্রতি লিটার জলে ৭০০ মিলিগ্রাম ফসফেট এই হারে) উচ্চ জীবনীশক্তি সম্পন্ন বীজের ক্ষেত্রে (High vigour seed অর্থাৎ যার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৯০—১০০ ভাগ) ৬ ঘণ্টা এবং একটু কম জীবনীশক্তি সম্পন্ন বীজের ক্ষেত্রে (Medium vigour seed অর্থাৎ যার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৯০ এর কম) ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিতে হবে। উচ্চ জীবনীশক্তি সম্পন্ন বীজ

(High vigour seed) এর জন্ম সরাসরি জলে ভেজানোর আগে জলে খুব অল্প সময় (১ মিঃ) ডুবিয়ে তারপর তুলে কিছুক্ষণ ভেজা অবস্থায় রেখে সইয়ে নিয়ে (১২ ঘঃ) তারপর জলে ভেজালে (১ ঘঃ) ফল যে আরও ভাল হয় তা আমরা ২ নম্বর সারণির ৩ এবং ৪ ক্রমিক সংখ্যার বীজের উৎপাদনের দিকে দেখলে বুঝতে পারব। এই ভেজা বীজ এরপর ছায়াতে খুব ভাল করে মেলে দিয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে এবং তারপর মাঠে বুনতে হবে।

এই প্রাক বপন বীজ শোধন পদ্ধতির ব্যবহার বর্ধমান এবং সিঙ্গুর এই দুই ক্ষেত্রেই খুব ভাল ফল দিয়েছে। এই কাজে রাগোমাইজড ব্লক ডিজাইন (Randomised Block Design) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং জমির পরিমাণ বর্ধমানের জন্ম ২০ বর্গমিটার ও সিঙ্গুরের জন্ম ১০ বর্গমিটার নেওয়া হয়। প্রত্যেক পরীক্ষার জন্ম চারটি পৌনঃপুনিক আবৃত্তি (Replication) গ্রহণ করা হয়। আমাদের রাজ্যে অল্পস্বত প্রণালী অনুযায়ী চাষ করা হয় এবং ফসল বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই পদ্ধতিতে বীজ শোধনের ক্ষেত্রে খরচ অতি সামান্য হয় (প্রতি কুইণ্টাল বীজ শোধনের জন্ম ৭৫ পয়সা দামের ডাই-সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেটই যথেষ্ট)।

শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ যে কতদূর সাফল্যলাভ করতে পারে তা আমরা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া ১ এবং ২ নং সারণি থেকে জানতে পারব। বর্ধমান এবং সিঙ্গুরের ফলাফল আলাদা করে যথাক্রমে ১ এবং ২ নং সারণিতে দেওয়া হ'ল।

বছর : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

১ নং সারণি

বর্তমান জেলা কৃষিক্ষেত্রে শোধিত ও অশোধিত গমবীজের ক্ষেত্রোদগম ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতা

শোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি	প্রতি বর্গ- মিটারে চারার সংখ্যা	প্রতি বর্গ- মিটারে উপযুক্ত বিয়ানের সংখ্যা	প্রতি শীষে দানার সংখ্যা	১০০০ দানার ওজন	ক্ষেত্রোৎপাদিত বীজের পরিমাণ (কেজিতে)	উৎপাদন বৃদ্ধির হার (শতকরা)
অশোধিত বীজ	১৫২	৩৪৬	২২	৩৬	৩'৫০	০
জলে শোধিত বীজ	১৬৫	৩৫৮	২৪	৩৯	৪'০৪	১৭
ফসফেট দ্রবণে						
শোধিত বীজ	১৬৯	৩৭০	২৪	৩৯	৪'২৫	২১

২ নং সারণি

সিঙ্গুর কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রে শোধিত ও অশোধিত গমবীজের ক্ষেত্রোদগম ও শস্য উৎপাদন ক্ষমতা

শোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি	প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রোদগমের পরিমাণ	প্রতি মিটারে উপযুক্ত বিয়ানের সংখ্যা	প্রতি শীষে দানার সংখ্যা	প্রতি ক্ষেত্রে উৎপাদিত বীজের পরিমাণ (কেজিতে)	উৎপাদন বৃদ্ধির হার (শতকরা)
অশোধিত বীজ	৩৯	১০৩	৩৮	২'৮৫৮	০
জলে শোধিত বীজ	৫১	১১৫	৩৭	৩'২১৫	১২
ফসফেট দ্রবণে শোধিত বীজ	৫৩	১১৭	৪০	৩'২৩৬	১৩
জলে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে ভেজা					
অবস্থায় তুলে ১২ ঘণ্টা রেখে					
তারপর শুকনো করা	৫১	১১৪	৩৯	৩'৩৮০	১৮
ফসফেট দ্রবণে ১ মিঃ + ভিজি					
অবস্থায় ১২ ঘণ্টা রাখা + দ্রবণে					
১ ঘণ্টা ডুবিয়ে তারপর শুকনো করা	৪৫	১২১	৩৬	৩'৫৬০	১৭

বনপাড়ার কাহিনী

অনিল সরকার

ধিন্...ধিন্...ধি...ধান...ধিন্, ধিন...ধিন...
ধি...ধান...ধিন্। ধামসা আর মাদলের শব্দে
বনপাড়া, চরণপাড়া, মোলডাঙ্গা ভরে উঠেছে।
বাতাসে ভেসে আসছে আদিবাসী মেয়েদের
নাকি সুরে গান। মোলডাঙ্গার মাঠে জড়ো
হয়েছে তিন পাড়ার যোয়ান মেয়ে মরদগুলি।
মেয়েগুলি হাতে হাত ধরে গোল হয়ে মাদলের
তালে তালে নাচছে। আজ ওদের “এ্যারো
পরব”। যার ঘরে যত রকমের বীজ আছে—
শ্রাকরায় বেঁধে মাঝখানে রেখেছে। মাঝে মধ্যে
তার উপর জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। এ্যারো শেষ
হলো। মঙ্গলা শ্রাকরা খুলে দেখছে তার দানা-
গুলি কেমন আছে। ওর ছিল বাদাম বীজ।
বীজগুলি দেখে ওর মন খারাপ হয়ে গেল।
—কিরে মঙ্গলা তুর মনটা এ্যাত ভার ক্যানে?
—আমার বীজটা খারাব হইয়া গিছেরে
কবিরাজ।
—ক্যানে! আমার বীজ তো ভালই আছে।
ও তুই খোসা সমিত বীজ দিয়েছিস্। খোসা
ছাড়িয়ে দিতি হবে। গেল সন তুই দিখিস নাই
দিকুরা (বাঙ্গালীবাবু) ছাড়িয়ে বীজ বসিয়ে
কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, আউসগ্রাম ১নং ব্লক,
বর্ধমান।

দিল। তু ঐ দানা বসাবি দেখবি গাছ ঠিক
হবে।

কয়েকদিন পরই দেখা গেল বনপাড়ার মাঠে
কলের লাজল নেমেছে। প্রধান—শ্রী সদানন্দ
মণ্ডল সঙ্গে আছে। বনেশ্বর সরেন ওদের মধ্যে
কিছুটা লেখাপড়া জানে। দেখিয়ে দিচ্ছে কার
কতটা জমি। কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হয়ে
গেল বাদাম চাষ। নতুন বহু এসেছে টেবল
মুয়ুর ঘরে। সে জানে না ডাঙ্গামাঠে টেবল
কি করছে। তাই তার চোখে প্রশ্ন।

—মরদগুলি দিকুদের জমিতে খাটতে না গিয়ে
ডাঙ্গা জমিতে কি চাষ করছে, এ্যারফেল
(নন্দ)?

—ক্যানে গো সুন্দরী—তোমার বাপের বাড়ীর
দিশে এ চাষ নাই?

—কই না! আমাদের গাঁয়ে তো এরকম বড়
ডাঙ্গা আছে। সেখানে কোন ফসল হয় না।
জঙ্গলের ধার। কেবল দিকুদের গরু মোষ চরে।

—আমাদের এখানেও আগে কিছু হতো না।
আজ ৪-৫ সাল যাবৎ এই চাষ হচ্ছে। তাইতো
গাঁয়ের যোয়ান মরদগুলি দিকুদের জমিতে না

বন্ধুরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

গিয়ে ডাঙ্গা জমিতে এঠে নতুন ফসল চাষ করছে।

—বল না এয়ারফেল—মরদগুলি কি বুনছে?

—বুলপুরের মেলায় বাদামভাজা খাস নাই! এ সেই বাদাম। ওরা বাদাম বুনছে।

—এবার আমাদের গাঁয়ে গিয়ে বুলতে হবে ডাঙ্গা জমিতে বাদাম চাষ করতে। তা এর বীজ কুথায় পাওয়া যাবে? কিভাবে চাষ করতে হবে?

—আমাদের গাঁয়ে প্রায়ই হুজন চাষবাবু আসে। ওরাই মরদগুলিকে ডেকে ফুসফুস করে কি বলে। প্রধানবাবুকে দিয়ে যায় বীজ, সার। আমরা প্রধানবাবুর কাছ থেকে লিই।

—তাই নাকি! তবে তো সরকারী বাবুরা বড় ভাল লোক। আমরা জানি সরকারী লোক খুব খারাপ হয়। আমাদের গাঁয়ে এসে নানা অছিলায় আমাদের দিকে তাকায়। মনে হয় চোখ দিয়ে খেয়ে ফেলবে।

—আমাদের এখানে যে হুজন আসে তারাও খুব ভাল লোক নয়। আমাদের দিকে তাকায় না বটে তবে মরদগুলিকে খুব শমকায়।

—ক্যানে—ক্যানে!

—গেল সন মঙ্গলা বাদামগাছের গোড়ায় মাটি দেয় নাই। দিকুরা যখন দেখতে আসলো—মঙ্গলাকে ডেকে খুব শমকালো।

—তারপর!

—ফসল তুলে মঙ্গলা দেখলো এক একটা ঝাড়ে ৩—৪ টের বেশী বাদাম হয়নি। সেই থেকে দিকুদের ভয়ে মঙ্গলা লুকিয়ে থাকে।

—তবে তুই ওদের খারাপ বলছিস্ ক্যানে? ওরা তো আমাদের ভালর জগাই বকে।

—কেবল তাই না। দিকু ছটা খুব চালাক। ওদের কথা মরদগুলি শুনতে চায় না। তাই ওরা প্রধানকে সঙ্গে লয়ে আসে। প্রধানটা খুব পাগলা লোক আছে।

—ক্যানে—ক্যানে!

—সব সময় এই ডাঙ্গাটা লিয়ে পড়ে আছে। গোটা ডাঙ্গাটা ভেঙ্গে চাষ করাচ্ছে। একটা আদিবাসী স্থল করেছে। একটা পুকুর কেটেছে।

—তবে তো প্রধানটা ভালই আছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা স্থলে পড়বে।

—শুধু তাই নয়। মরদগুলিও পড়ে। ঐ সরকারী দিকু ছটা মাঝেমাঝেই মরদগুলিকে নিয়ে স্থলে পড়ায়। চাষের কথা বলে।

এই কথাবার্তাগুলি হচ্ছিল বনপাড়ার একটি কুঁড়ে ঘরে। ননদ (এয়ারফেল) ও নতুন বৌয়ের (বহু) মধ্যে।

গ্রামের নাম যাদবগঞ্জ। জেলা—বর্ধমান। পাড়া—বনপাড়া, চরণপাড়া ও মোলডাঙ্গা। এই তিন পাড়ার মাঝে এক বিশাল ডাঙ্গা। একলপ্তে ১৫০—২০০ একর ডাঙ্গা। লালমাটি, বালি ও মোরাম। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ডি, ভি, সির ক্যানেল। ক্যানেলের দক্ষিণ দিকে ধান চাষ হয়। উত্তর দিকে এই ডাঙ্গা। পাশে জল। কিন্তু জল উঠে না। কচ্ছপের পিঠের মত উচু ডাঙ্গা। বহু বছর অনাবাদি পড়ে ছিল। ১৯৭৮ সালে কৃষি বিভাগ থেকে ১ বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলক ভাবে বাদাম চাষ করানো হয়। ধীরে ধীরে চাষ বাড়তে থাকে। এবছর (১৯৮৪) বর্ষাতে প্রায় ১০০ একর জমিতে বাদাম চাষ হয়েছে।

বর্ধমান জেলার গুসকরা থেকে ১৫ কিমি পশ্চিমে এই গ্রাম। ৬ কিমি পাকা রাস্তা। বাকী রাস্তা কাঁচা। এই তিন পাড়াতে ১৫০ থেকে ১৬০ ঘর লোকের বাস। সবাই আদিবাসী। এদের চোখের মণি—শ্রী সদানন্দ মণ্ডল—প্রধান। খুবই পরিশ্রমী। রোদে পুড়ে গায়ের রং হয়ে গেছে তামাটে। এর অক্লান্ত পরিশ্রমে সার্থক হয়ে উঠেছে—এই বাদাম চাষ।

এবছর ২৬শে জ্যৈষ্ঠ থেকে শুরু হয়েছে বাদাম চাষ। ছবার লাঙ্গল দিয়ে সার ছিটিয়ে আর একবার লাঙ্গল দেয়, মই দেয়। ১২"—১৮" দূরে দূরে আঙুরো (হাত লাঙ্গল) দিয়ে নালী কাটে।

২৪শে আষাঢ় গিয়েছিলাম বনপাড়া চাব দেখতে। মাঠে ছিলেন সদানন্দবাবু। সঙ্গে ছিলেন রূপলাল, ফাগু, কবিরাজ ও মঙ্গলার। দেখলাম অনেকে গাছের গোড়ায় মাটি দিচ্ছে। সদানন্দবাবু বললেন—কোথায় যেন তাদের ভুল হচ্ছে। সব রকম নিয়ম মেনে চলেও ভাল ফলন হচ্ছে না। আমি বললাম—চলুন আদিবাসী স্কুলে বসা যাক। সকলকে ডাকুন। আলোচনা করা যাক কোথায় ভুল হচ্ছে। কবিরাজ মুমু বললেন, তিনি এবছর ২ বিঘা বাদাম চাব করেছেন, কিছু কিছু গাছ ফুল আসার আগে ঢলে পড়ছে। মাটির উপর কাণ্ডে কালো দাগ হয়। গাছ মরে যায়। ফাগু বললো সে লাঙ্গলের পিছনে বীজ বুনেছে। তাই সারি থেকে সারির দূরত্ব কোথাও ১৮" কোথাও ৩০" হয়েছে। সদানন্দবাবু বললেন—তারা বাদামের দাম ভাল পাচ্ছেন না। কারণ তাঁদের উৎপন্ন

বাদামে শতকরা ২৫ ভাগ বাদামের মধ্যে শাঁস বাদানো হয় না। প্রথম প্রথম তাঁরা একরে ৩৫০ থেকে ৪০০ কেজি ফলন পেয়েছেন। কিন্তু গত বছর ২০০ থেকে ২৫০ কেজি ফলন পেয়েছেন। তবে তিনি একথাও জানানলেন এ-কে ১২-২৪ জাতের ফলন কম হলেও খরা সহ্য করতে পারে। এ বছর প্রায়ই বৃষ্টি হওয়ার জন্য বাত পাওয়া যাচ্ছে না। গাছে ফুল হয়েছে। কিন্তু মাটি দিতে পারেনি। সময়মত তেলি তৈরী না করলে ফলন কম হয় কিনা সদানন্দবাবু জানতে চাইলেন। ফাগু জানালো তার জমিতে গত বছর বাদাম তোলার সময় মনে হয় কই (উইপোকা) লেগেছিল। কারণ বাদামের খোলার উপর জাল জাল হয়েছিল।

আমি বললাম—ভুল দেখছি অনেক জায়গায়ই হয়েছে। কবিরাজকে বললাম সে যেন খোসা থেকে বীজগুলি বের করে প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম ত্রাসিকল বা থাইরাম মিশিয়ে শোধন করে নেয়। শোধন করা বীজ বসালে ঢলে পড়া রোগ বন্ধ করা যায়। তাছাড়া অপুষ্ট ও কালো দাগ ধরা বীজ বসাতে নেই।

ফাগুকে জানালাম—সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ১২" মাত্র এবং বাঁহ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৪" থেকে ৬" মাত্র। এর থেকে দূরত্ব বেশী হলে প্রতি একরে গাছের সংখ্যা কমে যাবে এবং ফলন কম হবে।

সদানন্দবাবুকে জানালাম—বাদাম গুটি জাতীয় গাছ। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিতে পারে। মাটিতে বিশেষ এক ধরনের জীবাণু প্রয়োগ করে গাছের নাইট্রোজেন নেওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বীজ বসাবার আগে

বহুধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

প্রতি কেজি খোসা ছাড়ানো বীজে ৩০ গ্রাম এই জীবানুসার মাথিয়ে বীজ বসাতে হয়। এখানকার মাটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে মাটির অম্লত্ব ৪.৭ থেকে ৫.১। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ খুব কম। প্রতি একর বাদাম চাষ করতে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও ১৮ কেজি পটাশ দিতে হবে। এছাড়া ১০ থেকে ১২ গাড়ী গোবর সার দিতে হবে। মাটির অম্লত্ব কমাবার জন্ত বেসিক স্লাগ দেওয়া যায়। কৃষি বিভাগ থেকে বিনামূল্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই সমস্ত লাল কাঁকুরে মাটি শোধন করার জন্ত প্রতি একরে ৮ কুইন্টাল বেসিক স্লাগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি যেন এবছর যে বেসিক স্লাগ আসবে তা এই ডাঙ্গাতে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রয়োগ করেন। বেসিক স্লাগ ও ঠিকমত সার দিলে শতকরা ২৫ ভাগ বাদাম আর ভুয়া হবে না।

বাদাম গাছে প্রথম ফুল আসে বীজ বসাবার ৩৫ থেকে ৫০ দিন পর। পরাগ মিলন মাটির উপর হয়। তারপর বৃন্তটি লম্বা হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। এই বৃন্তের আগায় গর্ভাশয় থেকে বাদাম হয়। এই গর্ভাশয়টি যাতে সহজে মাটির ভিতর ঢুকতে পারে সেইজন্ত গোড়ার মাটি সর্বদা আলগা রাখা দরকার। তাই তিন সপ্তাহ পরে একবার মাটি আলগা করতে হয়। ৬ সপ্তাহ পরে আর একবার গোড়ার মাটি আলগা করে কানিমাটি ধরাতে হয়। বাদাম গাছে সময়মত গোড়ায় মাটি দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ফাগুর প্রাশ্নের উত্তরে জানালাম—বাদামের

খোসার উপর জাল জাল হওয়া উইপোকার আক্রমণের জন্ত নয়। মাটিতে চুন জাতীয় খাবায় কম থাকলে এরকম হয়। একরে ৮ কুইন্টাল চুন বা বেসিক স্লাগ বাদাম বসাবার ১ মাস আগে দিয়ে মাটি চষে রাখতে হয়। পরের বছর থেকে আর জাল জাল হবে না।

সদানন্দবাবু এম-এইচ-২ জাত ১ বিঘায় লাগিয়েছেন। সারি থেকে সারির দূরত্ব দিয়েছেন ১২ ইঞ্চি। আমি তাঁকে বললাম এই জাতের বাদামে মাটি দিতে হয় না। গোড়ার মাটি কেবল আলগা করে দিতে হয়। সুতরাং এর দূরত্ব সারি থেকে সারি ৬ ইঞ্চি, গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪ ইঞ্চি হবে। সদানন্দবাবু বুঝতে পারলেন তাঁদের ভুল কোথায় হচ্ছিল। তাই তিনি উপস্থিত সমস্ত চাষীভাইদের আহ্বান জানালেন ভুলগুলি শুধরে নিয়ে সঠিকভাবে বাদাম চাষ করতে। তাঁকে বললাম—চলুন মাঠে যাওয়া যাক। মাঠ ঘুরে কবিরাজরা কিছু পাতা নিয়ে এল। বাদাম পাতার নিচের দিকে অসংখ্য ছোট ছোট গুঁয়াপোকা। কবিরাজ জানালো গত বছর এই পোকায় তাদের বাদামগাছ নষ্ট করে দিয়েছিল। সকলকে বললাম ঘুরে ঘুরে আক্রান্ত পাতা তুলে এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলুন। এতেও যদি আক্রমণ বন্ধ না হয় তবে একলাঙ্গ ২৫ ইসি বা থায়োডেন ৩৫ ইসি জলে গুলে গাছের পাতায় প্রয়োগ করে অতি সহজেই গুঁয়াপোকা দমন করা যায়। এই সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চললে তাঁরা পুনরায় একরে ৩৫০ থেকে ৪০০ কেজি ফলন পাবেন।



দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমন একটি আলোচনাসভা যার মূলে ছিল সারা জেলার কৃষিতে একটি যুগান্তর সৃষ্টির মূল্যবান ভাবনা ও উদ্ভোগ। নোনামাটি, নোনাঙ্গল, জলডোবা জমি, জল নিকাশের হস্তর বাধাবিপত্তি, ফসলে রোগপোকার ঝুঁকি, কৃষকের অর্থনৈতিক দৈন্য ইত্যাদির যুগ যুগ প্রবহমান সঙ্কট সমস্যা পীড়িত এ জেলার সবচেয়ে বড় এলাকা সুন্দরবন কৃষিতে সমৃদ্ধির মুখ দেখবে কি করে! কোনো মতে এক ফসলী জমিতে ওই একটাই খরিক ধানের ফসল। আধুনিক কৃষি ধারার স্রোত তাই এখানে বইবে কেমন করে! কৃষকরা ভাবেন, ভাবছেন কৃষিবিদ, কৃষিকর্মী, গবেষক, সরকারের প্রশাসন। মুশকিল—মুশকিল! কিন্তু মুশকিলের তো একটা আসান আছেই। বারুইপুরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আলোচনাসভাটি এইসব সমস্যা সমাধানের আলোক সম্পাতের জগ্রেই।

নিবিড় রবিশম্য উৎপাদন কার্যক্রমঃ একটি আলোচনা সভা

বসুন্ধরা : অগ্রহায়ণ : ১৩৯১

বারুইপুরে রবীন্দ্র হলে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার হরেক অঞ্চল থেকে নবীন প্রবীণ বহু কৃষক। কৃষি কর্মী, কৃষি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ব্যাকের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অধ্যাপক ও গবেষক এবং সরকারী কর্মকর্তারাও ছিলেন। সভামঞ্চে সাজানো ছিল প্রচলিত সমস্তার সমাধানমূলক বিবিধ নির্দেশ নীতিবাক্য সম্বলিত কতক সূদৃশ প্ল্যাকার্ড, পোষ্টার।

এক ফসলে ভাত কাপড়/দুই ফসলে গয়না
তিন ফসলে চাবীর সুখ/মহাজনের সয়না।

•

জৈব সারের অভাব মেটাতে ধৈর্যের চাষ করুন।

•

বোনার আগে বীজ শোধন করুন।

জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিকের আলোচনায় জানা গেল, এ জেলার জমি মোটামুটি এক ফসলী। জল নিকাশী ব্যবস্থার অভাবে খরিফ চাষে অসুবিধা বিস্তর। গভীর নলকূপ থেকে বা নদী থেকে জল তুলে ব্যাপক সেচ দেয়াও সম্ভব নয়। তাই রবি চাষে নির্ভর করেই চাষ বাড়তে হবে। আর তারই জন্তে সমস্তার সমাধানও করতে হবে ব্রহ্ম, মহকুমা ও অঞ্চল স্তরে আলোচনা করে। বিগত বছরে চাষে এ জেলা অনেক এগিয়েছিল। কিন্তু এ বছর জুনের অতিবৃষ্টির ফলে আমন লাগানো যায়নি অনেক জায়গায়। ৩৩ হাজার হেক্টরে গত বছর বোরো চাষ করা গেছে। বাড়বার চেষ্টা হচ্ছে এ বছরও। আসন্ন একটি নির্ধারিত বিশেষ আলোচনাসভায় বিধায়ক ও কৃষি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হবে জল নিকাশের খাল পথ সম্পর্কে, যাতে রবি নির্ভরতাটা নিশ্চিত

হতে পারে। মুখ্য কৃষি আধিকারিক এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির সমৃদ্ধির জন্তে জোর দিলেন লক্ষ্য ও তরমুজের চাষের দিকে এবং গভীর বা অগভীর নলকূপে নির্ভর না করে বৃষ্টির ৩০ ইঞ্চি জল ধরে রেখে সুন্দরবন অঞ্চলে দু'তিনটি ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন।

সুন্দরবন অঞ্চলের মাটির এক বিশেষ সমস্তার কথা বললেন যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (রসায়ন) শ্রী মনোরঞ্জন রায়। বোরো চাষের এলাকাতে খরিফের চাষও হয়। আর সেই জমি অনেক সময়ই জলে আটকে থাকার ফলে মাটি অক্সিজেন-শূন্য হয়ে পড়ে এবং সালফেট টক্সাসিটি বা সালফারের বিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে এ ধরনের জমিতে চাষ করলে গাছের শিকড়ের কাছে কালো হয়ে যায়। ধানের ক্ষতি করে এ জিনিস। তাই বোরো চাষের এ রকম জমিতে যে ভাবেই হোক অক্সিজেন ঢোকাতে হবে মাটি ঘেঁটে দিয়ে। এ অঞ্চলে রবি বা বোরো মরসুমে এ ধরনের সমস্তার কথা তিনি জানানলেন। শ্রীরায়ের বক্তব্য, এ অঞ্চলের মাটিতে লবণ বদ্ধ করা যাবে না, তাই লবণ সহ করতে পারার মতো ফসল অর্থাৎ লক্ষ্য, তরমুজ, সূর্যমুখী, সুগার বীট ইত্যাদি এখান থেকে তুলে নিতে হবে।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অমর সরকার সুন্দরবনে সুগার বীটের চাষ এবং সম্ভাবনার কথা বিস্তৃতভাবে বললেন। এই অঞ্চলে ধানের পরে রবিতে নোনা মছ করতে পারার মতো আর কোনো উপযুক্ত ফসল নেই সুগার বীটের মতো, এ কথা ডঃ সরকারের

প্রকৃতি

নিয়মান্বলী

প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটিকা, সাফাৎকার, নজর, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রদোষন, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল রক্ষণ, সমবায় ও কৃষিঋণ, কৃষি বিপন্নন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং জাতীয় অস্তাব-জসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সত্বাবধান, ভূমিসংস্কার-রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-স্থানের সমস্যাাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

নার জন্তু সম্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উদ্ভাবনমূলক কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ২৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (কনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

না ফুলফেল কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ন্যায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি চান বাবুদ্বীয়। যথাসময় মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রন্থক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত ক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম প্রকাশিত প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা "কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ"-এর নামে লেখা রাখাচিত (ক্রেসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্থ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্থ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস' দ্বারা স্বীকৃত এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

উদ্যোগ একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বৈশিষ্ট্য/ব্যবসায়িত্ব সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন একাউন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির কমে এক্ষেত্রে দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে মাসিক ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে অগ্রিম আদায় লাভ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রণালী চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

- | | |
|---|---|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারন্যাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “সুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রে শার |
| ৬। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য | ৬। হস্তচালিত ছইলহো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল/লোহার লান্ডল ইত্যাদি |
| | ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরলা পাম্প |

তত্পরি,

28 JAN 1965

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের আব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্র্যাংগো-ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

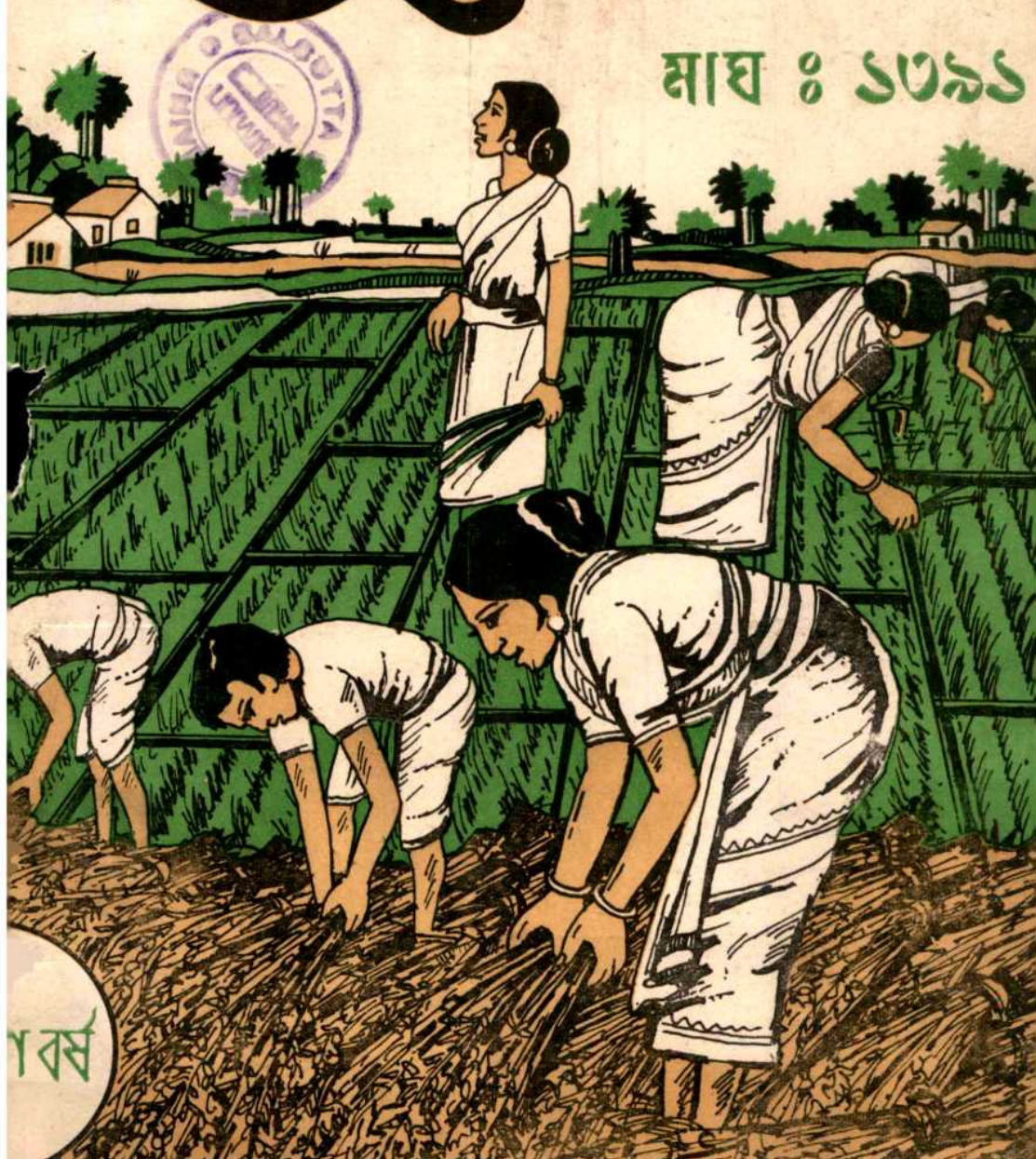
২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

টেলিফোন : ২২-২৩১৪

ସ୍ୱଳ୍ପକା

ମାସ : ୧୭୯୯



ପ୍ରବନ୍ଧ

সূচী

সম্পাদকীয়	৩-৪
রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে	
বোরো ধান রক্ষা করুন	৫-৭
সুগার বীটের চাষ	৮-১০
বৈজ্ঞানিক সেন	
তরমুজের চাষ	১১-১৩
তৈলবীজের অভাব পূরণে	
তিলের চাষ করুন	১৪-১৬
ওরা ডাকে ইশারায় (কবিতা)	১৭
দিলীপ কুমার সাহা	
আবেদন	১৮
বোরো ধান চাষে রাসায়নিক সারের	
কৃষিকা	১৯-২৭
বিকল্প মণ্ডল	
কাকতুন মাসের করণীয়	২৮
আজ্ঞা উত্তান প্রতিযোগিতা	২৯-৩০
সংবাদ	৩১
কৃষি সংবাদ	৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ব
বিকল্প মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(সাধারণ)
ডঃ দেবপ্রভ মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা
(গবেষণা)
মুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক, কৃষি অধিকার
অমির কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক
(সদর)
স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক

বিকল্প মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

মাঘ-১৩৯১

কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা

কর্তৃক প্রকাশিত

খরিফ ফসল তোলা শেষ
খালি জমি থেকে মাটির নমুনা
সংগ্রহ করে মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন।

আজকাল সব চাষীভাই-ই জানেন যে নানাপ্রকার জৈব ও রাসায়নিক সার জমিতে প্রয়োগ করে জমির উর্বরাশক্তি এবং সেই সাথে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অনেক বাড়ান যায়। কিন্তু সার প্রয়োগ করবার আগে জানা দরকার ঐ জমির স্বাভাবিক উর্বরাশক্তি কতখানি অর্থাৎ ঐ জমি থেকে ফসল তার প্রয়োজনীয় কোন খাবার কতখানি পেতে পারে। তাই সার প্রয়োগের যথাযথ সুফল পাবার জ্ঞান চাষের আগেই জমির উর্বরাশক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন খাদ্য উপাদান যোগান দেবার ক্ষমতা জেনে নেওয়া দরকার। আর এইজন্ম প্রধান খাদ্য উপাদানের সঞ্চিত ভাণ্ডার ছাড়াও মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব ও দ্রবণীয় লবনের পরিমাণও জানবার দরকার রয়েছে।

এখন খরিফ মরসুমের ফসল তোলার কাজ শেষ, কাজেই খালি জমিগুলো থেকে মাটির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। মাটির নমুনা সংগ্রহের নিয়মাবলী ও তার সাথে দেয় তথ্যাবলী ও অগ্রাঙ্ক করণীয় বিষয়সমূহের জ্ঞান ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জেলা অফিস, প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত মুখ্যগ্রামে কৃষিবিদ এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের বিভিন্ন অফিসে যোগাযোগ করুন।

এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্পভুক্ত মৃত্তিকা পরীক্ষাগারগুলির সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। বর্তমানে দুর্গাপুর, কৃষ্ণনগর ও মেদিনীপুরে প্রকল্পভুক্ত মৃত্তিকা পরীক্ষাগার রয়েছে।



ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

(হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন)

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

সম্প্রদায়



মাঘ রবিশস্ত চাষের বলতে গেলে পরিচর্যার মাস। শীতের হিমে ও প্রাকৃতিক অমুকুল পরিবেশে রবি ফসল ক্ষেতে ধীরে পুষ্ট হয়ে ওঠে। রবি ফসল এখন পরিণতির মুখে। ভাল ফলনের জন্য এই সময় জলের দরকার থাকে। যেখানে সেচপ্রাপ্ত এলাকায় চাষ হচ্ছে সেখানে প্রয়োজন মত সেচ দেওয়ার অসুবিধা নেই। এ বছর বৃষ্টির পরিমাণ অগ্র বছরের তুলনায় বেশী হওয়ায় জলের স্রবিধা ছিল। এই সঞ্চিত জলের স্রবিধা যেখানে আছে সেখানে প্রয়োজন মত এর ব্যবহার কৃষকরা নিশ্চয়ই করেছেন। তবে সেচবিহীন এলাকায় জমির সঞ্চিত রসে রবিশস্তের চাষ অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। মাঘের শেষে এক পশলা বৃষ্টি এই ফসলের ভাল ফলনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। তাই এই সময় কিছু বর্ষণের জন্য কৃষকদের প্রার্থনা থাকে।

যেসব রবিশস্ত এখন ক্ষেতে রয়েছে তার যত্ন ও পরিচর্যার বিশেষ দরকার। কারণ ঠিকমত যত্ন ও পরিচর্যার উপর ফলনের ভালমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। ক্ষেত ঘুরে দেখতে হবে কোথাও রোগ-পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা। ভাল ফসল হওয়ার পরও রোগ-পোকার আক্রমণে অনেক সময়েই তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই কোথাও আক্রমণ হয়েছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বোরো ধান এই সময়ের একটি বিশেষ শস্ত। সেচপ্রাপ্ত এলাকায় কৃষকরা প্রধানতঃ বোরো চাষের উপরই জোর দেন। যাঁরা বোরো চাষ করছেন তাঁরা আশা করি লক্ষ্য রেখেছেন যে বৈশাখ মাস পর্যন্ত তাঁর ক্ষেতে জলের অভাব যেন না ঘটে। কারণ অনেক সময় কৃষকদের এই সময় জলের ঘাটতির মধ্যে পড়ে ফলনের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। বোরো ধান রোয়ার কাজ শেষ—হলে ১৪ দিন অন্তর ২ বার হাত দিয়ে মাটি ঘেঁটে দেওয়া দরকার। তারপর নিড়েন দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিলে ভাল হয়।

গ্রীষ্মের সবজি হিসাবে এই সময় করলা, বিজে, ফুটি, শশা, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতির চাষ করুন। এইসব সবজির এখন কিছু কিছু উন্নত ও জলদি জাত বার হয়েছে। এইসব উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করে চাষ করুন। সবজি এখন খুবই অর্থকরী ফসল। এর চাষে খরচ যেমন কম, লাভও বেশী এবং অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি

হয়ে যায়—তাই এখন থেকে উন্নত বীজ সংগ্রহ করে চাষের জন্ত তৈরি হোন।

আমগাছে এখন মুকুল এসে গেছে। আম শুধু একটি জনপ্রিয় ফলই নয়। এ রাজ্যে এর অর্থনৈতিক গুরুত্বও যথেষ্ট। এর ফলন যাতে ভাল হয় সেজন্ত সচেষ্ট হওয়া দরকার। আম-গাছের সমস্ত রোগ-পোকার মধ্যে ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে শোষক পোকা। সময়মত এর দমনের ব্যবস্থা করতে পারলে এই রাজ্যের বর্তমান উৎপাদন অনায়াসে কম করে শতকরা দশভাগ বাড়ানো যেতে পারে। শোষক পোকা দমনের জন্ত এই সময় তাই ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত দরকার। এই পোকা দমনের জন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধ মুকুল আসার আগে একবার ও গুটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার, মোট দুবার স্প্রে করতে হবে। তবে মুকুল ফোটা অবস্থায় স্প্রে করা উচিত নয়। এ সম্বন্ধে সাহায্য ও পরামর্শের প্রয়োজন হলে স্থানীয় কৃষিকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ভাল ফলনের জন্ত কৃষকের উৎসাহ ও উত্তমের প্রয়োজন। সারা বছর ধরেই কৃষকদের চেষ্টা ও উত্তম থাকলে আমরা খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিশ্চয়ই সক্ষম হবো।



বোরো ধানের দাঘ

(পৌষের প্রকাশিতের পর)

রোগ ও পোকাকার আক্রমণ থেকে
বোরো ধান রক্ষা করুন

ধান রোয়ার পর ভাল ফলনের জন্য যত্ন ও তদারকির প্রয়োজন। রোগ ও পোকাকার আক্রমণে অনেক সময় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেজন্য ক্ষেত ঘুরে দেখা ও কোথাও রোগ বা পোকাকার আক্রমণ হয়েছে দেখলে তা দমনের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। রোগ বা পোকাকার দমনের জন্য কি করা দরকার সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

রোগ

বলসা রোগ (রাষ্ট): এই রোগ দমনের জন্য ৩০০ লিটার জলে ৩০০ মিলিলিটার হিনোসান মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে করুন। হিনোসানের অভাবে ৩০০ মিলিলিটার কিটাজিন বা ৯০০ মিলিলিটার কুমান-এল স্প্রে করুন।

প্রয়োজন হলে তবে রোগ দমনের ওষুধ ব্যবহার করবেন। এজন্য নিয়মিত মাঠে গিয়ে ফসলের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে এবং রোগের আক্রমণ দেখলে ওষুধ দিন।

বন্ধুরা : মাঘ : ১৩৯১

পোকা

মাকরা পোকা বোরো ধানের প্রধান শত্রু। সাধারণতঃ মাঘের শেষ থেকে এদের আক্রমণ শুরু হয়। তাই নিয়মিতভাবে সপ্তাহে অন্তত দু'বার আপনার ক্ষেত দেখুন।- গাছে মাকরা পোকাক মথ (প্রজাপতি) বা ডিমের গাদা দেখলে বুঝবেন যে ক্ষেতে ঐ পোকাক আক্রমণ শুরু হয়েছে।

সাধারণতঃ শতকরা পাঁচটি বা তার বেশি পাশকাঠি মাকরা পোকাক আক্রান্ত দেখলে অথবা প্রতি ৫০টি গোছে একটি মাকরা পোকাক মথ বা ডিমের গাদা দেখা গেলে কীটনাশক ওষুধ দিন। এছাড়া এখানে নির্দেশিত তালিকায় দেওয়া যে কোন একটি ওষুধ ব্যবহার করুন।

দানাদার ওষুধের
নাম

একর প্রতি
ওষুধের পরিমাণ
(কেজি)

ফোরোট-১০%

(থাইমেট-১০ জি)

৪

কার্বোফুরান-৩%

(ফুরাডান-৩ জি)

১২

দানাদার ওষুধ ছড়ানোর পর থেকে ৫-৭ দিন পর্যন্ত ক্ষেতে ছিপছিপে জল রাখবেন ও মাটি ঘাঁটবেন না। দানাদার ওষুধ কিছু শুকনো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিলে ভালভাবে ছড়ানো যায়। ধানে খোড় আসার পরে আর দানাদার ওষুধ ব্যবহার করবেন না। এর পরে, দরকার হলে তরল ওষুধ ব্যবহার করবেন।

তরল ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)	প্রতি একরের জম ৩০০ লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার)
ফসকোমিডান ৮৫%	৩	১৫০
মিথাইল প্যারাথায়ন ৫০%	১	৩০০
ফেনথায়ন ৫০%	১	৩০০
কুইনালফস ২৫%	১৩	৪৫০
এণ্ডোসালফান ৩৫%	১৩	৪৫০
বি-এইচ-সি ৫০% (জলে গোলা) ৫ গ্রাম		১৩ কেজি

প্রতি একর জমিতে হাতে চালানো স্প্রেয়ারে ভালভাবে ওষুধ স্প্রে করার জন্য সাধারণতঃ ৩০০ লিটার ওষুধ গোলা জল লাগে। তবে গাছের বাড় অল্পযায়ী কম বা বেশি লাগতে পারে। দরকার হলে ১০ থেকে ১৫ দিন বাদে

আবার ঐ পরিমাণ তরল ওষুধ স্প্রে করুন। অগ্রাঙ্গ পোকাক উপজব হলে উপরে বলা যে কোন একটি ওষুধ (তরল) স্প্রে করুন।

আজকাল বোরো ধানে বাদামী শোষক পোকাক আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই শোষক

পোকা গাছের গোড়ার দিকে থাকে। কাজেই পোকা দেখার ক্ষণ গাছের গোড়ার দিকে নজর রাখুন এবং পাতার উপর ওষুধ না ছিটিয়ে গাছের গোড়ার দিকে ভালভাবে স্প্রে করুন। বোরো ধানে ফুল আসার সময় থেকে সাধারণতঃ বাদামী

শোষক পোকাকার আক্রমণ দেখা যায়, তাই সে সময়ে নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন এবং আক্রমণ হলে গুছিতে ৬টি পোকা দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। ফুল আসা ক্ষেতে বিকালের দিকে ওষুধ স্প্রে করুন।

নীচের যে কোন একটি ওষুধ দিন

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার/গ্রাম)	একর প্রতি ৩০০ লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ (মিলিলিটার/গ্রাম)
মনোক্রোটোফস্ ৪০%	১ মিলি	৩০০ মিলি
ম্যালাথিয়ন ৫০%	২ ”	৬০০ ”
ডাইক্লোরডস ৭৬%	১ ”	৩০০ ”
ক্লোরোপাইরিকস্ ২০%	২ ”	৬০০ ”
বি-এইচ-সি ৫০%		
(জলে গোলা)	৫ গ্রাম	১৫০০ গ্রাম
কার্বারিল ৫০%	২২ ”	৭৫০ ”
বি-এইচ-সি ১০% গুঁড়ো	একর	১২ কেজি
মিথাইল প্যারাথিয়ন ২%	”	১০ ”
কার্বারিল ৫%	”	১০ ”
কুইনালফস্ ১.৫%	”	১০ ”

গরু পোকা, লেদা বা শীষ কাটা লেদা পোকাকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ বি-এইচ-সি গুঁড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে ভালভাবে ছড়াবেন।
ফসল তোলা

শিষ বেরুনোর একমাসের মধ্যেই দানা পুষ্ট হয়ে কাটার উপযুক্ত হয়। ধান পেকে গেলেই কেটে সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই করে পরে খড় ও ধান আলাদা করে ভালভাবে শুকিয়ে নিন।

দেয়ি করে কাটলে এবং কাটার পর সঙ্গে

সঙ্গে ঝাড়াই-মাড়াই না করে মাঠে ফেলে রাখলে দানা ঝরে নষ্ট হতে পারে। তাছাড়া ইঁদুরে, পোকা-মাকড়ের দ্বারা এবং ঝড়-বৃষ্টিতে ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া দেয়ি করে কাটলে ধান থেকে চাল করার সময় বেশি খুদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠিক সময়ে ধান কেটে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে ফসল বাঁচান।
ফলন

উন্নত প্রণায় চাষ করলে একর প্রতি

২০—২৫ কুইন্টাল ধান পাওয়া যায়।

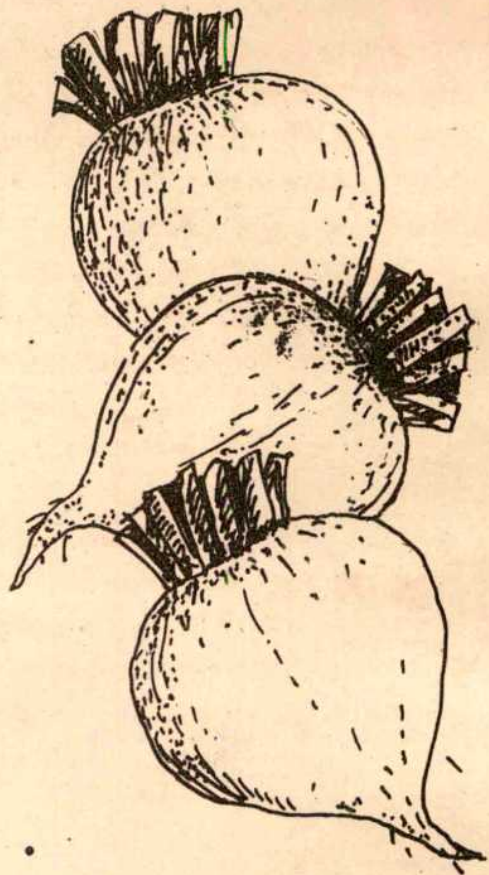
সুন্দরবন অঞ্চল প্রধানত: এক ফসলী।
এখানকার মাটি লবণাক্ত হওয়ায় অল্প কোন
ফসলের চাষও বিশেষ হয় না। সত্তরের দশকে
সুন্দরবন অঞ্চলে এক ফসলী নানা জমিতে
সুগার বীট চাষের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে
দেখা হয়। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে
সুগার বীটের চাষ এখানে শুধু ভালভাবে হতে
পারে তাই নয়, এই চাষের ফলে জমির অল্পও
কিছুটা কমানো যায় এবং পরবর্তী খরিফ
মরসুমে ধান চাষে উপকার পাওয়া যায়। সুগার
বীটের চাষে উৎসাহ নিলে কৃষকরা শুধু একটি
ফসলই পাবে না, এক ফসলী এলাকাকে দোফসলী
করতেও সাহায্য করবে। এখানে সুগার বীটের
উন্নত চাষ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হলো।
আবহাওয়া

এই ফসলের চাষে সাধারণত: একটু ঠাণ্ডা
আবহাওয়া (20° — 25° সে:), মাঝারি বৃষ্টিপাত
বা উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা এবং ভাল সূর্যালোক
দরকার। যেখানে মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত
হালকা ধরনের ঠাণ্ডা থাকে সেইসব অঞ্চলে এর
ফলন সর্বাধিক পাওয়া যায়।

জমি ও মাটি

উর্বর, জল নিকাশের ব্যবস্থা আছে এই
রকম বেলে দো-আঁশ, দো-আঁশ বা এঁটেল
দো-আঁশ মাটি এর চাষের উপযোগী। ভারি
এঁটেল মাটিতেও মাঝারি মানের ফলন পাওয়া
যায়। লবণাক্ত বা ক্ষারযুক্ত জমিতেও এই
ফসলের চাষ করা যায়। তাই সুন্দরবন অঞ্চলের
এক ফসলী জমিতে দ্বিতীয় ফসল হিসাবে সুগার
বীটের চাষ করা যেতে পারে।

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক (ইজু), কৃষি অধিকার, মহাকরণ।



বৈজ্ঞানিক সেন

সুগার বীটের চাষ

জমি তৈরি

সুগার বীটের কন্দমূল মাটির ভিতরে উৎপন্ন হয়। তাই ৪ থেকে ৫ বার বেশ গভীর করে জমিতে চাষ দিয়ে পর্যাপ্ত জৈব সার মিশিয়ে মাটি খুরখুরে করে নেওয়া দরকার।

বীজের জাত

রেমনস্কায়া, ম্যারিবো-ম্যাগনাপোলী, ম্যারিবো-রেজিসটোপা, কয়া ম্যাগাপোলী, কয়া জিগাপোলী ইত্যাদি এই ফসলের কয়েকটি উন্নত জাত। যদিও রেমনস্কায়ার জাত এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভাল ফলন দিয়েছে।

বীজের পরিমাণ

প্রতি হেক্টরে ৮—১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একটি বীজ থেকে ২—৩টি চারাগাছ হয় বলে বাড়তি চারাগাছগুলি খুব ছোট অবস্থাতেই তুলে ফেলতে হবে। কয়েক ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিয়ে বাতাসে শুকিয়ে বীজ বুনলে বেশী চারা পাওয়া যায়। এতে বীজের পরিমাণও কম লাগে।

বীজ শোধন

সুগার বীটের বীজ শক্ত আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে এবং সহজে অঙ্কুর বের হয় না। তাই বীজ ৪ থেকে ৬ ঘন্টা গোবর জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে ভিজে চটের বস্তা চাপা দিয়ে রাখলে ভাল অঙ্কুর বের হবে। রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বোনার আগে ০.২% এ্যাথ্রোসেন বা সেরাসান দিয়ে শোধন করে নেওয়া ভাল।

বীজ বোনার সময়

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে বুনে এখানে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে, যদিও

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এর বীজ বোনা চলতে পারে। বীজ অল্প জায়গায় বুনলে মূল জমিতে চারা রোয়া করা যেতে পারে।

বীজ বোনার পদ্ধতি

জমিতে ৩০ সে,মি, অন্তর নালা কেটে ১০ সে,মি, অন্তর অন্তর খুঁপি করে বীজ নালায় তলায় বসাতে হবে। জলদি বুনলে বীজ মাটির ৩—৪ সে,মি, গভীরে এবং দেরীতে বুনলে ২—৩ সে,মি, গভীরে বসাতে হবে। বীজ বোনার আগে একটা হালকা সেচ দিয়ে নালায় মাটি ভিজিয়ে নেওয়া ভাল এবং বীজ বোনা হলেই মাটি দিয়ে চাপা দিতে হবে।

বীজ ১০ সে,মি, অন্তর বসানো হলেও পরে চারায় ৪টি করে পাতা হয়ে গেলে এই দূরত্ব বাড়িয়ে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সে,মি, রাখতে হবে। লাইনের দূরত্ব অবশ্য ৩০ সে,মি-ই থাকবে।

সেচ

শীতকালে সাধারণত এই রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় না তাই ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজ বোনার পরেই একটা খুব হালকা সেচ দিয়ে জমি ভিজিয়ে রাখতে হবে। নজর রাখা দরকার যেন ঐ সময়ে জমিতে কোথাও জল জমে না থাকে। চারা গজানোর পর জমির অবস্থা বুঝে ১৫ থেকে ২০ দিন অন্তর ৪ থেকে ৫ বার সেচ দেওয়া প্রয়োজন। তবে বীজ বোনার ৫০ থেকে ৬০ দিনের মাঝায় যে সেচ দেওয়া হবে তা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সার প্রয়োগ

জমির এখন অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ১৫—২০

বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৯১

টন হিসাবে যে কোন জৈব সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

জমি তৈরির সময়ে হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট ও ৬০ কেজি পটাশ দিয়ে ভাল করে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বোনার ৪০ দিন পরে আবার হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিয়ে সারিতে ভেলি বেঁধে দিতে হবে। হালকা মাটিতে এই চাপান, সার বোনার ৩ সপ্তাহ পর পর ছুবারেও দেওয়া যায়।

আগাছা পরিষ্কার ও পরিচর্যা

জমির অবস্থা বুঝে ২ থেকে ৩ বার নিড়ান দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। জমিতে চারা কমানোর সময়ে প্রথমবার নিড়ান দিতে হবে। গাছ বড় হয়ে গেলে বীজ বোনার ৪০ দিনের মাথায় গাছের গোড়ায় অবশ্যই মাটি তুলে ভেলি বেঁধে দিতে হবে। চাপান সার দেওয়ার আগে আগাছা পরিষ্কার করা দরকার।

শস্ত্র রক্ষা

রোগ ও পোকা দমনের জন্তু নিচের তালিকা অনুযায়ী ওষুধ প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ক) জমি তৈরির সময়—শেষ চাষের সময়ে হেক্টরক্রোর বা বি-এইচ-সি (দানা) ১০%

জমিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

খ) বীজ শোধন—বোনার আগে ২% সেরেসান দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

গ) বীজ বোনার ৪ সপ্তাহ পরে—মেটাসিসটক্স

বা মেটাসিড ০.২% দ্রবণ ৬০০ লিটার প্রতি হেক্টরে ছেটাতে হবে।

ঘ) বপনের ৮ সপ্তাহ পরে—ব্যাভিস্টিন ০.০১% দ্রবণ বা ত্রাসিকল ১০ কেজি হেক্টর প্রতি প্রয়োগ করতে হবে।

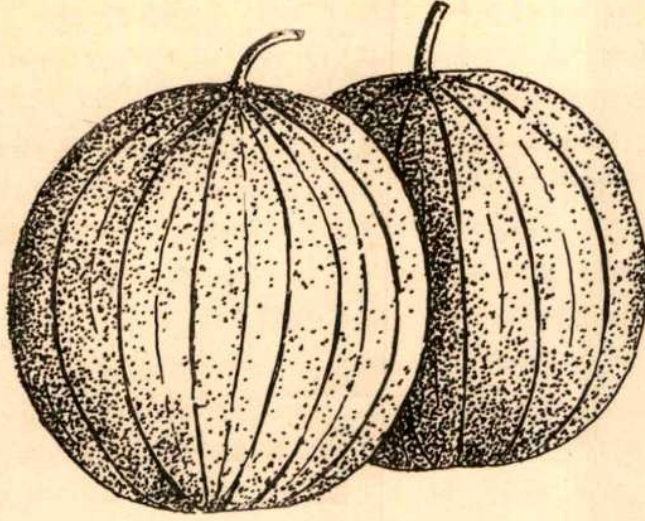
ঙ) বপনের ১২ সপ্তাহ পরে—ম্যালাথিয়ন ০.০২% দ্রবণ (৬০০ লিটার প্রতি হেক্টর) ও ডাইথেন এম-৪৫ হেক্টর প্রতি ২.৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল তোলা

গাছের তলার দিকের পাতা শুকিয়ে আসছে দেখলে বুঝতে হবে ফসল তোলার সময় হয়েছে। মাটি থেকে গাছ তোলার সময়ে জমিতে প্রয়োজনীয় রস আছে কিনা দেখে নেওয়া দরকার। বাট শিকড় বেশী ক্ষতি না করে তোলার জন্তু দেশী লাঙ্গল লাইনের ভিতর চালিয়ে ফসল তোলা যেতে পারে। বৈশাখের মাঝামাঝির মধ্যে ফসল তুলতে পারলে শরীরের পরিমাণ বেশী পাওয়া যাবে। তবে সরবরাহের চাহিদার তারতম্যের প্রয়োজনে তৈরী ফসল ১ মাস পর্যন্ত জমিতে রেখে দেওয়া যায়। এরজন্তু গাছের তলার পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হয় এবং মাটিতে কিছু রস থাকারও প্রয়োজন।

ফলন

সীমিত সেচে আবাদ করলে গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩০ টনের মত, পর্যাপ্ত সেচের সাহায্যে ভালভাবে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৫০ টন ফলনও পাওয়া যেতে পারে।



তরমুজের' চাষ'

দারুণ গ্রীষ্মে তরমুজ একটি অতি প্রিয় ফল। তৃষ্ণা মেটাতে যেমন তরমুজের কদর আবার সুমিষ্ট ফল হিসাবেও এর ব্যবহার গ্রীষ্মকালে ব্যাপক। গরমের হাওয়া বইতে শুরু করলেই তরমুজের আবির্ভাব হয় বাজারে গল্পে। যত গরম পড়তে আরম্ভ করে তরমুজের প্রাচুর্যও হাটে বাজারে চোখে পড়ে। আর দামও সে সময় থাকে প্রায় প্রতিটি মানুষের কেনার ক্ষমতার মধ্যে। ফলে তরমুজের ব্যবহারও যথেষ্ট ব্যাপক।

কয়েক বছর আগেও কিন্তু তরমুজের এত প্রাচুর্য চোখে পড়তো না। বাজারে দেখা যেত বড় বড় তরমুজ। তার দামও ছিল বড় বড়। একটা তরমুজ কিনে তা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষেও যেমন কষ্টকর ছিল আবার এককালীন দামও বেশী দিতে হতো। এখন যে নতুন জাতের চাষ হচ্ছে সেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় দাম ও ব্যবহারের দিক থেকেও সুবিধাজনক।

সুন্দরবন অঞ্চলে এখন তরমুজের চাষে চাষীর

বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৯১

খুবই উৎসাহ। এর এলাকা ক্রমশঃ বাড়ছে। এক খবরে জানা যায় যে গত রবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার হেরথগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১০০ হেক্টর জমিতে তরমুজের চাষ হয়েছিল। অচিন্তনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৬০ হেক্টর, জি প্রট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ১৬০ হেক্টরে তরমুজের চাষ হয়েছিল। এ বছর এর চাষ আরও বাড়বে বলে কৃষকরা জানান। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগণাই নয়, সুন্দরবন অঞ্চলের ব্যাপক এলাকাতেই এর চাষ হচ্ছে।

এই চাষ অর্থকরীও। পাথরপ্রতিমা ব্রকের দক্ষিণ শিবগঞ্জ গ্রামের চাষী শ্রী নিশিকান্ত দলুই জানানেন যে গত বছর তিনি ৫ বিঘা জমিতে সুগার বেবী জাতের তরমুজের চাষ করেন। মোট ফলন পান ২০০ কুইন্টাল। চাষে তাঁর মোট খরচ হয় বিপণন সহ প্রায় সাত হাজার টাকা। বিক্রি হয় গড়ে ৬৫ থেকে ৭০ টাকা কুইন্টাল দরে। লাভের অঙ্ক তাঁর ভালই থাকে। এ বছর জমির পরিমাণ আরও কিছু বাড়াবেন ঠিক করেছেন।

নিশিকান্ত দলুই এর মতই ঐ অঞ্চলের অন্যান্য চাষীরাও তরমুজ চাষে লাভের স্বাদ পেয়েছেন এবং এর চাষেও বখেট্ট আগ্রহী। লাভের মাত্রা বেশী রাখতে গেলে গাছ পিছু শুধু ফলনই বাড়ানো নয়, ফল যাতে সুস্বাদু হয় তার জন্য উপযুক্ত জাতটি বেছে নিয়ে চাষ করতে হবে। দিল্লী সুগার ও সুগার বেবী এই দুটি জাতই ভাল এবং এর চাষও বেশী হচ্ছে। এর চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা হচ্ছে।

১) দিল্লী সুগার আকারে সুগার বেবী থেকে

বড়। রঙ হালকা সবুজ। শাঁস অংশটুকু লাল। খোসা মোটা হবার জন্য পরিবহনের সুবিধা আছে।

২) সুগার বেবী আকারে দিল্লী সুগারের থেকে ছোট। তরমুজের রঙ গাঢ় সবুজ এবং খোসা পাতলা। শাঁস অংশ লাল। দিল্লী সুগারের চেয়ে সুস্বাদু।

মাটি

সাধারণতঃ বেলে দো-আঁশ মাটিতে তরমুজ চাষ হয়। কিন্তু এঁটেল ও এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও তরমুজ চাষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে।

জমি তৈরি

আমন ধান কাটার পর জমিতে জো এলে ৩-৪ বার লাঙ্গল দেওয়ার পর কাঠের মই দিয়ে ঢেলাগুলি ভেঙ্গে দিতে হবে ও জমি যতটা সম্ভব সমতল করে নিতে হবে।

মাদা তৈরি ও প্রাথমিক সার প্রয়োগ

তরমুজের বীজ জমিতে মাদা তৈরি করে লাগাতে হবে। প্রতিটি মাদা এক ফুট ব্যাসার্ধ করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ভালভাবে তৈরি করতে হবে। মাদা করার পর প্রতি মাদায় কম্পাষ্ট বা খোল ১০০ গ্রাম, সুপার ফসফেট ২০ গ্রাম ও পটাশ সার ১০ গ্রাম দিতে হবে।

বীজ বোনার পদ্ধতি, বীজ শোধন ও বীজের পরিমাণ

১০০ গ্রাম বীজ ওজনের তরমুজের বীজে সাধারণতঃ ২০০০ থেকে ২২০০ বীজ থাকে। একর প্রতি ৫০০-৬০০ গ্রাম বীজ লাগে। দূরত্ব রাখতে হবে ৪'X৪' বা ৪'X৬'।

বীজ বোনার আগে বীজগুলি অন্তত



৫-৬ ঘন্টা প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম
ব্যাভিষ্টিন ওষুধে মিশিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে।
পরে এই বীজগুলি সরাসরি প্রতি মাদায় ৪-৫টি
করে লাগিয়ে দিতে হবে। বীজ বোনার পর
পোয়াল (খড়কুটো) দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন।
এতে তাড়াতাড়ি গাছ বার হবে।

সারের কথা

একরে নাইট্রোজেন ঘটিত ইউরিয়া সার
ছ কুইন্টাল লাগে। প্রতি মাদায় গাছ বের
হওয়ার পর দশ দিন অন্তর সার দিতে হবে।
সেইসঙ্গে মাদার মাটি কুপিয়ে দিতেও হবে।
জমিতে আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করা
দরকার। সার প্রয়োগের পর মাটির কলসী
করে বা অন্য উপায়ে প্রতি মাদায় জল দিতে
হবে।

প্রতি মাদায় সারের মাত্রা :

গাছ বের হবার দশ দিন পর দশ গ্রাম

গাছ বের হবার কুড়ি দিন পর দশ গ্রাম
গাছ বের হবার ত্রিশ দিন পর পনেরো গ্রাম
” ” ” চল্লিশ দিন পর কুড়ি গ্রাম
” ” ” পঞ্চাশ ” ” পঁচিশ গ্রাম
অর্থাৎ মোট আশী গ্রাম।

এবার রোগ-পোকাকর কথায় আসি। গাছ
বার হওয়ার পর কাটুই পোকাকর আক্রমণ দেখা
দিতে পারে। এক্ষণে শেষ চাষের আগে একর
প্রতি ১২ কেজি অলড্রিন পাঁচ শতাংশ বা
বি-এইচ-সি দশ শতাংশ গুঁড়ো জমিতে ছড়িয়ে
দেওয়া ভাল। রোগের মধ্যে গোড়া পচা রোগ
দেখা দিতে পারে। প্রতিকার হিসাবে ব্যাভিষ্টিন
প্রতি লিটার জলে ছ গ্রাম অর্থাৎ এই হারে
মিশিয়ে গাছের গোড়া ভিজিয়ে দিতে হবে।

ফসল তোলা

তরমুজের বোঁটা শুকিয়ে লাল হয়ে এলে,
ফসল তোলার সময় হয়েছে বুঝতে হবে।

তিল খরা সহনশীল ফসল। পশ্চিমবাংলায় আমরা এই রাজ্যের তৈলবীজের অভাব অনেকটা সর্বত্রই তিল চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পূরণ করতে পারি। জমির অবস্থান, আবহাওয়া তিল চাষের প্রসার ঘটিয়ে এবং উপযুক্ত চাষ এবং শস্য পর্যায়ে প্রকার ভেদে বছরে তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে একর প্রতি উৎপাদন বাড়িয়ে খন্দে তিলের চাষ করা হয়।

খন্দ	বোনার সময়	ফসল তোলার সময়
প্রাক খরিক	মাঘ-ফাল্গুন	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
খরিক	আষাঢ়-শ্রাবণ	আশ্বিন-কার্তিক
প্রাক রবি	ভাদ্র	অগ্রহায়ণের শেষ

তৈলবীজের অভাব পূরণে তিলের চাষ করুন

আমন ধানের জমিতে বিশেষ করে যেখানে রবি মরশুমে কিছুটা সেচের জল পাওয়া যায়, সে অঞ্চলে আমন ধান তোলার পর ব্যাপকভাবে তিল ফসলের আবাদ করার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। রবি মরশুমে আলু বা শাক-সবজির পরেই তিলের চাষ খুবই লাভজনক। চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর বৃষ্টি পেলে তিলে কোন সেচের প্রয়োজন হয় না। বৃষ্টি না হলে বোনার আগে ও বোনার ৪০ দিন পরে সেচ দিতে হয়। খরিক মরশুমে কাঁকুরে মাটি বা উঁচু জমিতে তিলের চাষ বৃষ্টির জলে ভালই হয়। তাছাড়া আউশ এবং পাট কাটার পর ভাদ্র মাসে আবাদ করে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেও তিলের চাষ করা যায়।



মাটি

যেসব মাটিতে জল জমে না, কিন্তু যথেষ্ট রস থাকে এরকম মাটিতে তিল ভাল জন্মায়। দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ জমি তিল চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। শান জমির এঁটেল দো-আঁশ মাটিতেও তিলের চাষ মোটামুটি ভাল হয়।

জমি তৈরি

বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে মাটি বুরবুরে করে নিন। এই সময় একর প্রতি ৮—১০ গাড়া গোবর সার মূল সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ

করুন। মাটি অনুযায়ী তিন চারটে লাজল ও মই দিন। আলু বা সবজি চাষের পর জমি তৈরির জন্য ছবার চাষই যথেষ্ট, যেহেতু আলু বা সবজি চাষে যথেষ্ট পরিমাণ জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সে কারণে এক্ষেত্রে মূল সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

উন্নত জাত

বহরমপুরের ডালশস্ত্র ও ডৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র থেকে কয়েকটি উন্নত জাতের তিলের প্রচলন করা হয়েছে। নীচে সেগুলোর বিবরণ দেওয়া হল :

উন্নত জাতের নাম	পাকবার সময় (দিন)	একর প্রতি ফলন (কেজি)	বীজের রং	ডেলের ভাগ (শতকরা)
বি-৬৭ (তিলোত্তমা)	৭৫—৮০	৩০০—৩২৫	কালচে বাদামী	৪০
বি-১৪	৮৫—৯০	১৫০—২০০	কালো	৩৪

এই জাতগুলির মধ্যে বি-৬৭ (তিলোত্তমা) জাতের রোগ পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। এই ছটি জাতই প্রাক খরিফ ও খরিফ মরসুমে এবং শরৎকালে চাষ করা চলে।

বীজের হার ও বোনার পদ্ধতি

ছিটিয়ে এবং সারিতে ছুভাবেই তিলের চাষ করা যায়। ছিটিয়ে বুনলে একর প্রতি ২২—৩ কেজি বীজ লাগে। সারিতে বুনলে বীজ লাগে একর প্রতি ২—২২ কেজি। সারিতে বীজ বুনলে ২টি সারির মাঝে ৩০ সেমি (১ ফুট) এবং সারিতে ২টি গাছের মাঝে ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) দূরত্ব রাখতে হবে। বোনার আগে প্রতি কেজি

বীজে ৩ গ্রাম ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড (যেমন মনোসান) অথবা ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট (যেমন সেরেসান বা প্যারাসন) অথবা ক্যাপটান (যেমন ক্যাপটাফ) ওষুধের গুঁড়ো মাখিয়ে বীজ শোধন করে নিন।

সার প্রয়োগ

সেচের জলের সুবিধা থাকলে একর প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি কসফেট এবং ১০ কেজি পটাশ মূল সার হিসেবে দিন। বীজ বোনার এক মাস পরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন চাপান হিসাবে তিলের জমিতে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। অ-সেচ এলাকায় কেবলমাত্র

বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৯১

মূল সার হিসাবে ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ প্রতি একরে দিন। তবে আলু চাষের পর তিল চাষ করলে সাধারণতঃ আর সারের দরকার হয় না।
পরিচর্যা

তিলের চাষে ছবার নিড়ান দেওয়া উচিত। প্রথম নিড়ান বোনার ২০—২১ দিনের মাথায়, দ্বিতীয়টি আরও ১০—১৫ দিন পর দিলে ভাল হয়। প্রথম নিড়ানীতে চারা তুলে পাতলা করুন যাতে প্রতি বর্গমিটারে ৩৫—৪০টি চারা থাকে।

শস্য রক্ষা

তিলের দুটি প্রধান কীটশত্রু হ'ল বিছা পোকা ও লেদা পোকা। এই পোকাগুলি গাছের কচি পাতা ও গোড়া খেয়ে নেয়। এ ছাড়া গুটি ছিঁড়কারী পোকাও দেখা যায়। এদের হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে প্রতি লিটার জলে ১ই মিলি এণ্ডোসালফান (যেমন থায়োডান-৩৫ ইসি ইত্যাদি) অথবা মিথাইল প্যারাথিয়ন (যেমন মেটাসিড-৫০, প্যারাটক্স ইত্যাদি) অথবা ৫ গ্রাম বি-এইচ-সি ৫০% গুঁড়ো (জলে গোলা) মিশিয়ে একর প্রতি ৩০০ লিটার ওষুধ মিশানো জল স্প্রে করুন। প্রয়োজন হলে ১৫—২০ দিন পর আর একবার একই ওষুধ স্প্রে করুন।

তিলের প্রধান রোগ গোড়া পচা। যে ক্ষমিতে তিলের গোড়া পচা রোগ আগে দেখা গেছে সেখানে বীজ বোনার আগে একর প্রতি ৩০০ লিটার জলে ৩০০ গ্রাম ক্যাপটান (যেমন ক্যাপটাফ) গুলে মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিন।

গাছ বেরুবার পর যদি পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা যায় তবে তা মাঘটিত যে কোন কপার অক্সিক্লোরাইড জাতের ওষুধ (যেমন ব্লাইটক্স ইত্যাদি) একর প্রতি ১ই থেকে ২ কেজি অথবা জিনেব (যেমন ডাইথেন জেড-৭৮, হেজ্জাথেন ইত্যাদি) অথবা ম্যানকোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫) একর প্রতি ১ কেজি হারে অথবা ৩০০ গ্রাম ক্যাপটাফ (যেমন ডাইফো-লেটোন ইত্যাদি) ৩০০ লিটার জলে গুলে গাছে স্প্রে করুন।

ফাইলডী তিলের আরও একটি প্রধান রোগ। এই রোগে গাছের কাণ্ড উপরের দিকে চ্যাপ্টা হয়ে যায় এবং ফুলগুলি পাতার মত হয়ে যায়। এক জাতীয় শোষক পোকাকার মাধ্যমে এই রোগ এক গাছ থেকে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগ দমনের জন্য ১ লিটার জলে ১ মিলি মিথাইল ডিমেটন (যেমন মেটাসিস্টক্স-২৫% ইত্যাদি) অথবা ১ মিলি ফসফামিডন ৮৫% (যেমন ডিমেক্রন ইত্যাদি) অথবা ১ মিলি ডাইমিথয়েট ৩০% (যেমন রোগর, ভারী ৯০৯ ইত্যাদি) জলে মিশিয়ে একর প্রতি ৩০০ লিটার ওষুধ মেশানো জল স্প্রে করুন।

ফসল তোলা

গাছ পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার আগেই ফসল তুলে নেওয়া দরকার নচেৎ গুঁটি ফেটে দানা ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। যখন ফুল ফোটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়তে শুরু করে অথচ গুঁটি কিছুটা সবুজ থাকে তখনই ফসল কেটে নিন।

ওরা ডাকে—ইশারায় । দিলীপ কুমার সাহা

ওরা আমায় ডাক পাঠায়—দূর হতে,
না, ডাকে না, ইশারা করে,
হাতেও না, চোখেও না, তবু—
তবু ওরা আমায় ডাকে :
ফুটন্ত ফুল, উড়ন্ত চিল—দূর আকাশে
নিঃসঙ্গ ঘুমন্ত কোন কোন ছপূরে ।
ভাসন্ত মেঘ—দূর পাহাড়ে নিয়ে যেতে ।
মাঘের শিশির ভেজা দুর্ধাবাস,
যখন ইচ্ছে হয়—চোখ মেলে দেখি
মাঠ ভরা সবুজ ধানক্ষেত—কচি, হুখে ভরা
হাওয়ার দাপটে ঞ্চামল শাড়ীর নাচন
দূরের তালগাছের সারি ।

ওরা ডাকে, আয় ছুটে আয়
লেজ-ঝোলা, তাঁতী-বাবুই, দর্জি-টুনটুনি,
কাঙাল কাক, ভীড় কোকিল—কোহলিয়া স্বরে ;
দূরের কৃষ্ণচূড়া, পলাশ—আগ্নেয় নিশান
বিছানো সবুজ কার্পেট—সারা মাঠ জুড়ে ।
রাস্তার জ্যোৎস্না—নদীর বুকে, ওপারের মাঠে
সূর্যাস্ত রক্তিম দিগন্তের মেঘ
—ওরা সবাই আমায় ডাকে—ইশারায় ॥

॥ আবেদন ॥

বিষয়—“বসুন্ধরা” পত্রিকার জ্ঞান কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ, রচনা, আহ্বান করা হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়নের কাজ এ রাজ্যে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনেও এই কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টা আমাদের বাড়িয়ে যেতে হবে। নতুন নতুন কৃষি চিন্তা ভাবনা, গবেষণালব্ধ তথ্য ইত্যাদি যা কৃষকের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করবে তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবে এই “বসুন্ধরা”। এজ্ঞান আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বসুন্ধরায় প্রকাশের জ্ঞান কৃষি বিষয়ক নানা তথ্য, কৃষকের কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ, গবেষণা লব্ধ তথ্য, সাক্ষাৎকার, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ, কৃষিঋণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠানোর জ্ঞান অহুরোধ করা হচ্ছে। এইসব তথ্য আকর্ষণীয় হবে যদি তার সঙ্গে ফটো থাকে। কৃষি প্রাসঙ্গিক বা গ্রামোন্নয়নভিত্তিক লেখা শুধু কৃষিকর্মীদের কাছ থেকেই নয়, যারা নিজেদের হাতে শস্য উৎপাদন করছেন সেই কৃষকভাইদের কাছ থেকেও। আপনাদের সকলের সহযোগিতা বসুন্ধরাকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হবে।

সম্পাদিকা

বোরো ধান চাষে রাসায়নিক সারের ভূমিকা

বিষ্ণুপদ মণ্ডল

অউশ এবং আমন অপেক্ষা বোরো ধানে
আমরা সাধারণভাবে বেশী ফলন পেয়ে থাকি।

এর কারণ :—

(ক) এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে বলে
গাছ প্রচুর পরিমাণে সৌরশক্তি আহরণ করে
সালোক-সংশ্লেষের সাহায্যে বেশী পরিমাণে শর্করা
উৎপাদন করতে পারে।

(খ) অতি অল্পকূল তাপমাত্রার জন্য
শ্বাসক্রিয়ার হার কম হয়, এতে সালোক-সংশ্লেষের
সাহায্যে উৎপাদিত শর্করার অপচয়ও কম হয়।

(গ) নিয়ন্ত্রিত সেচ প্রয়োগ।

(ঘ) রাসায়নিক সার এবং জলের সুব্যবহার।

(ঙ) অল্পকূল আবহাওয়ায় রোগ-পোকার
অপেক্ষাকৃত কম উপদ্রব।

(চ) অপেক্ষাকৃত কম প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

এসব কারণে আমরা দেখতে পাই যে,
কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ।

অধিক ফলনশীল জাতের ধানের মধ্যে যে
স্বাভাবিক উচ্চ ফল দানের ক্ষমতা রয়েছে বোরো
মরসুমে সুষম সার প্রয়োগ, জলের সুব্যবহার
এবং বিধিমত পরিচর্যা প্রভৃতির ফলে ঐ ক্ষমতার
পূর্ণ বিকাশের পথ সুগম হয় এবং ফলন বৃদ্ধি
পায়। অপর পক্ষে ফসলের ক্ষতিকারক আগাছা,
কীট ও রোগ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কম
হওয়ার ফলে তুলনামূলকভাবে ফলনের বিশেষ
হ্রাস হয় না। উপরোক্ত অল্পকূল কারণগুলির
জন্ম বোরো ধান নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে
অধিক সংখ্যক শিষ উৎপাদন করে এবং
প্রতি শিষে পুষ্ট দানার সংখ্যাও থাকে বেশী।
বোরো মরসুমে শিষে চিটেও কম হয়। সুষম
সার, যা ফলন বৃদ্ধির অগ্রতম কারণ, এই অধিক
ফলনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

সেচের ব্যবস্থা থাকলে তবেই বোরো ধানের

বস্তুক্রম : মাঘ : ১৩৯১

চাষ করা সম্ভব। সীমিত জলের সুব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে সুখম সার অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। উচ্চ ফলন লাভের প্রধান বাধা হ'ল কম মাত্রায় সার প্রয়োগ। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানগাছে অধিক ফলনের জন্য বেশী সারের প্রয়োজন হয়। কাজেই জমিতে প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খাদ্য প্রয়োগ না করলে ফসল মাটির সঞ্চিত খাদ্য-ভাণ্ডার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। ফলে মাটির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়।

পুষ্টি

ধান গাছের জন্য সিলিকা সহ যে ১৭টি মৌলিক খাদ্য দরকার তার মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গাছের যে অংশ মাটির উপরে থাকে সেই অংশের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন মূলত দায়ী। নাইট্রোজেন দানা এবং খড়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে; উপরন্তু দানায় প্রোটিনের পরিমাণও বাড়ায়। নাইট্রোজেনের অভাব হলে গাছের সবুজ অংশ সমানভাবে হলদে হতে থাকে, গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, গাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে, পাশকাঠির সংখ্যা কমে যায়; ফলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রয়োজন। যথা:—

(১) পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে, যার ফলে বেশী সংখ্যায় শিষ পাওয়া যায়।

(২) উদ্ভিদ দেহে ক্রমশঃ জন্মাবার প্রাক্কালে, যা শিষে ফুলের সংখ্যা বাড়ায় এবং শিষ বড় হয়।

(৩) জনন কোষের বিভাজনের (reduc-

tion division) সময়, যা ফুলের বন্ধ্যাস্থ কন্ডায় এবং দানার আকার বৃদ্ধি করে।

(৪) শিষের পূর্ণ প্রস্ফুটন অবস্থায়, যা পুষ্ট দানার সংখ্যা বাড়ায়।

ফসফরাস মূলের বৃদ্ধি, ফলবান পাশকাঠি বৃদ্ধি এবং দানার পুষ্টিতে সহায়তা করে। দানা পুষ্টির ক্ষেত্রে ফসফরাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের কুফলকে ফসফরাস কিছুটা সংশোধন করে। ফসফরাসের অভাব ঘটলে পাতার রঙে নীলাভ ভাব দেখা যায়, শিকড় ও পাশকাঠির বৃদ্ধি বাহত হয়, গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, ফুল আসতে ও দানা পুষ্ট হতে বিলম্ব হয় এবং অনেক সময় অপুষ্ট দানার সংখ্যা বাড়ে।

ধানগাছ অকুরোদগম অবস্থা থেকে ফুল আসা পর্যন্ত নিরবধি ফসফরাস গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু জমিতে যে ফসফরাস থাকে তার স্তূর ব্যবহার প্রাথমিক অবস্থায় সম্ভব হয় না বলে মূল সার হিসাবে ফসফরাস ঘটিত সারের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় জমির ফসফরাস গাছের পক্ষে সহজলভ্য হয় না সেজন্য বিশেষ করে বোরো ধানের ক্ষেত্রে মূল সার হিসাবে ফসফেট অবশ্যই দিতে হবে।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে গাছের খাদ্য প্রস্তুত ও খাদ্য সঞ্চালনের জন্য পটাশ অপরিহার্য। পটাশ বেশী মাত্রায় নাইট্রোজেন প্রয়োগের কুফল যথেষ্ট সংশোধন করে। পটাশ গাছের জীবনীশক্তি বাড়িয়ে রোগ-পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিহত করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। পটাশের অভাবে গাছের পুরানো পাতার

ডগা এবং ধারগুলি পুড়ে যাওয়ার মত হয়, ক্রমে পাতা মরে যেতে থাকে। পাতার গায়ে এবং শিষে ঝলসে যাওয়ার মত দাগ দেখা যায়।

গাছের শ্বাসক্রিয়ায় (respiration) পটাশিয়ামের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। পটাশিয়ামের যুহু প্রভাবে মাইটোকন্ড্রিয়া (mitochondria) এবং ক্লোরোপ্লাস্টের (chloroplast) পক্ষে অধিক অক্সিজেন গ্রহণ করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে অতি মাত্রায় পটাশিয়ামের উপস্থিতি অক্সিজেন গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।

পটাশিয়ামের অভাবে শ্বাসক্রিয়াসম্বৃত শক্তি সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনাবশ্যক শ্বাসক্রিয়ার বৃদ্ধি ঘটে।

গাছের খাদ্য সংশ্লেষ, পরিবহন এবং সঞ্চয়ে পটাশিয়ামের ভূমিকার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ধানের জমিতে চুন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়, কারণ চুন প্রয়োগে জমির অম্লত্ব হ্রাস পাওয়ার ফলে রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। চুন প্রয়োগের ফলে জমিতে নীলাভ সবুজ ছত্রাকের (blue-green algae) পক্ষে নাইট্রোজেন সংযোজনের সুবিধা হয়। চুন উদ্ভিদ দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং গাছকে শক্ত করে। চুন মাটির ভৌত গঠন উন্নত করে, জৈব সারের পচন ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং এ্যামোনিয়া মুক্ত করে। মাটির pH-এর সূচক ৫.৫ এর নীচে হলে জমিতে চুন প্রয়োগে চোখে লাগার মত ফল পাওয়া যায়।

যদিও উদ্ভিদ দেহে সিলিকার অবদান সম্বন্ধে এখনও ভালভাবে জানা যায়নি, তবে দেখা যায়, ধানগাছ প্রচুর পরিমাণে সিলিকা গ্রহণ করে।

সিলিকা প্রয়োগের সুফলগুলি হল :—

ক) ফসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে।

খ) গাছ মাটিতে লুটিয়ে পড়ার প্রবণতা ও রোগ-পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

গ) গাছ সোজা রাখতে সাহায্য করে এবং প্রস্বেদন (transpiration) জনিত বাষ্পমোচন হ্রাস করে।

ধানগাছের বিভিন্ন অংশের প্রকৃতি এবং কার্যধারা বিভিন্ন। এরা বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। গাছের বয়স এবং পরিবেশের উপর এদের বৃদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা নির্ভর করে। গাছের পাতায় প্রচুর প্রোটিন থাকে এবং সেখানে ব্যাপক হারে সালোক-সংশ্লেষ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। দানায় যে প্রোটিন থাকে, পাতার নাইট্রোজেনই তার প্রধান উৎস এবং সালোক-সংশ্লেষের ফলে প্রস্তুত অতিরিক্ত শর্করা (starch) গাছের পাতাতেই সঞ্চিত থাকে। ডাঁটার ভিতরেও কিছু শর্করা জমা থাকে। দানায় যে ফসফরাস থাকে তা প্রধানতঃ ডাঁটা থেকেই আসে। শিকড়ে উদ্ভিদ খাদ্য এবং শর্করা বিশেষ থাকে না। শিকড়ের কাজ শুধু জমি থেকে খাদ্যরস আহরণ করা। গাছের শিষই হল খাদ্য সঞ্চয়ের প্রধান অঙ্গ এবং দানা গঠনের সময় প্রোটিন, শর্করা ও অম্লীয় খনিজ দ্রব্য সঞ্চিত হয়।

গাছে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সালফারের অভাব হলে পাতার সংখ্যা, পাতার দৈর্ঘ্য, শিষের সংখ্যা ও শিষে দানার সংখ্যা হ্রাস পায়। পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে শিষে দানা ঠিকমত বাঁধে না, দানার ওজনও কম হয়; ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়।

অবশ্য উপরোক্ত উপাদানগুলির অভাবে শিষের রাসায়নিক গঠন বিশেষ প্রভাবিত হয় না। নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের অভাব জনিত লক্ষণগুলি নীচের দিকের পাতায় এবং ক্যাল-সিয়াম ও লৌহের অভাব জনিত লক্ষণগুলি উপরের দিকের পাতায় বেশী দেখা যায়। খাত্তের অভাব হলে ঐসব উপাদান নীচের পাতা থেকে উপরের পাতায় সরে যায়, ফলে নীচের পাতা অকালে মরে যায়। কাজেই পাতার দীর্ঘজীবন এবং সূচু কার্যক্ষমতার জন্য পর্যাপ্ত খাত্ত সরবরাহের প্রয়োজন রয়েছে।

পাশকাঠি ছাড়ার কাজ মা-গাছের পুষ্টির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ পাশকাঠিগুলি তিন পাতা হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বেতসার ও অগ্নাশ্ব খাত্ত মা-গাছ থেকে গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ তাই দ্রুত পাশকাঠি ছাড়ার সহায়ক হয়। অধিক খাত্তের যোগান থাকলে নাইট্রোজেন ও সালফার গাছের সর্বাঙ্গে, ফসফরাস ও পটাশিয়াম গাছের কাণ্ডে এবং ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পুরানো পাতায় সঞ্চিত হয়।

ধানগাছের মাঝ পাতাতে প্রচুর সালোক-সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া হয় এবং নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ ও সালফার সঞ্চিত হয়। গাছের বাড়ের সঙ্গে পাতাটি উপরের দিকে বৃদ্ধি পায়। গাছের বৃদ্ধির যে কোন পর্যায়ে এই মাঝ পাতার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ গাছের বৃদ্ধিতে মাঝ পাতার দান সর্বাধিক। গাছের যে কোন অঙ্গের পুষ্টির সময় প্রচুর পরিমাণে খনিজ খাত্ত সরবরাহ ও দ্রুত সালোক-সংশ্লেষ আবশ্যক। সঞ্চিত খাত্ত গাছের বিভিন্ন অংশে সঞ্চারিত হয়ে

গাছের বৃদ্ধি এবং পুষ্টিতে সাহায্য করে। পাশকাঠি ছাড়ার সময় এ খাত্ত মূল ডাঁটার বর্ধিষ্ণু পাতা, পাশকাঠি এবং শিকড়ে সঞ্চারিত হয়। গাছের কাঁচথোড় আসার সময় খাত্তরস ভ্রূণশিষ, উপরের পাতা ও পর্বমধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফুল আসার পরে পাতার সঞ্চিত খাত্ত দানায় এবং নীচের পাতায় সঞ্চিত খাত্ত গাছের নিম্নাংশে এবং শিকড়ে ছড়িয়ে পড়ে।

জল দাঁড়ানো জমির বৈশিষ্ট্য

যেহেতু জল দাঁড়ানো জমিতে ধান রোয়া হয় সেহেতু জলে ডোবা জমির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা থাকা দরকার। জল দাঁড়ানো জমিতে তিনটি বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে :—

ভৌত পরিবর্তন

মাটির ভিতরের শূন্য ছিদ্রগুলি জলে ভরে গিয়ে মাটি ফুলে ওঠে এবং ঢেলা নরম হয়ে গলে যায়। জমি কাদা করার সময় মাটির স্বাভাবিক গঠনে ভাংচুর হওয়ার দরুন সমস্ত রক্ত্র বুজে যায়, ফলে চুইয়ে জলের অপচয় কম হয়। বাইরের বাতাস এবং কাদা জমিতে আবদ্ধ বাতাসের আদান-প্রদান ব্যাহত হয়। ফলে জমি শুকোতে বিলম্ব হয়।

জল দাঁড়ানো কাদা করা জমিতে দুটি ভিন্ন চরিত্রের স্তর গঠিত হয়। উপরের দিকে অর্থাৎ দাঁড়ানো জলের ঠিক নীচ থেকে ৫—১০ মিলি-মিটার গভীর পর্যন্ত জারিত স্তর মাটির উপরে বেড়ে উঠা বিভিন্ন শৈবালের মাধ্যমে বায়ুস্তরের অল্পজান বাতায়নের ফলে এই স্তরের সৃষ্টি হয়। এ স্তরের রং বাদামী। এর নীচের স্তর অর্থাৎ বিজারিত স্তর কার্যতঃ অল্পজান বিহীন।

বিজারিত লৌহ যৌগের প্রভাবে এ স্তরের রং কালো বা নীলাভ ধূসর। এই স্তরের জারণ বিজারণ ক্ষমতা কম।

রাসায়নিক পরিবর্তন

শুক মাটিতে ফসফরাস মাটির ভিতরের লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, এ্যালুমিনিয়াম এবং ক্যাল-সিয়াম এর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে আবদ্ধ থাকে। জল দাঁড়ানো অবস্থায় এরা সহজেই দ্রবীভূত হয়ে মাটির ফসফরাসকে মুক্ত করে দেয়। বিজারিত অবস্থায় ভূমি সঞ্চিত ফসফরাস এবং ব্যবহৃত সারের ফসফরাস এভাবে গাছের পক্ষে সহজলভ্য হয়। অল্প জমির পি-এইচ বৃদ্ধি এবং ক্ষার জমির পি-এইচ হ্রাস হওয়ার ফলেও ফসফরাসের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়।

সক্রিয় লৌহের অল্পপস্থিতিতে অত্যধিক সালফেটযুক্ত জমিতে বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নির্গত হয়, বিশেষতঃ যখন বেশী পরিমাণে জৈব সার দেওয়া হয়। এরকম জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সক্রিয় লৌহ যৌগ প্রয়োগ করে সালফারকে ফেরিক সালফাইডরূপে আবদ্ধ করে ঐ বিষাক্ত গ্যাসের উদ্ভব নিবারণ করা যায়। এরূপ জমিতে সালফার যুক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। অতি অল্প এবং অত্যধিক লৌহ যুক্ত জমি জলে ডুবিয়ে দিলে প্রচুর লৌহ দ্রবণ বিমুক্ত হয়ে বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে। জমিতে চুন প্রয়োগ করে, মাঝে মাঝে সেচ দিয়ে এবং জল নিকাশ করে এবং সালফার যৌগ প্রয়োগ করে, বিষক্রিয়া নিবারণ করা যায়।

জৈবিক পরিবর্তন

কাদা জমি বা জল দাঁড়ানো জমির বায়ুবিহীন অবস্থায় জৈব পদার্থ পচন ক্রিয়ার সাহায্যকারী

জীবাণুর পরিমাণ এবং প্রকারের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। বায়ুযুক্ত জমির তুলনায় কাদা জমিতে পচন ক্রিয়ার গতি মন্দ্র হয় এবং পচন-ক্রিয়ায় উদ্ভূত যৌগও হয় ভিন্ন প্রকার। গবেষণা করে দেখা গেছে যে পচন ক্রিয়ায় উদ্ভূত বিভিন্ন বিষক্রিয়া থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য রোয়ার কম করে দু'সপ্তাহ আগে জমিতে জল ঢুকিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত।

জমি চাষ ও জৈব সার প্রয়োগের ঠিক আগে বা পরে ধানের জমিতে জল ঢুকিয়ে দিতে হবে। জৈব সারে যে নাইট্রোজেন থাকে তা জল দাঁড়ানো অবস্থায় অ্যামোনিয়ামে (NH_4^+) রূপান্তরিত হয়ে পরবর্তীকালে ধান গাছের খাতি হিসাবে কাজে লাগে। যদি জমিতে জল ঢুকানো না হয় জৈব রাসায়নিক আরও পরিবর্তনের ফলে নাইট্রেট (NO_3^-) গঠিত হয়। পরে সেচের জলের সাথে সাথে মিশে চুইয়ে বা নাইট্রোজেন বিয়োজনে (denitrification) নষ্ট হয়। মূল সার হিসাবে অ্যামোনিয়াম ঘটিত নাইট্রোজেন সার মাটির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে না দিলেও অম্লরূপ ক্ষতি হয়। মাটির জারিত স্তরে বসবাসকারী জীবাণু অ্যামোনিয়ামকে নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে এবং নাইট্রেট ধীরে ধীরে মাটির নীচের বিজারিত স্তরে নেমে গিয়ে নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে নষ্ট হয়। মূল সার হিসাবে দেওয়া অ্যামোনিয়াম ঘটিত নাইট্রোজেন সারকে যদি সঙ্গে সঙ্গে বিজারিত স্তরের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে এরূপ ক্ষতি কমানো সম্ভব।

জমি তৈরি

ছটি কারণে রোয়ার দিন পনের আগে জমি

বহুধরা : মাঘ : ১৩৯১

কাদা করা দরকার :—

(ক) জমি কাদা করার সময় জমিতে মিশে যাওয়া পচনশীল জৈব পদার্থের পচনক্রিয়ার ফলে যে যৌগ উৎপাদিত হয় তার থেকে ধানের চারাকে রক্ষা করা।

(খ) জৈব পদার্থের পচনের ফলে উৎপাদিত অ্যামোনিয়াম যাতে গাছ কাজে লাগাতে পারে।

উক্তমুদ্রণে প্রস্তুত ধান জমির বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ :—

(১) লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে মেশানো সমস্ত জৈব সার, আগাছা এবং ফসলের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণরূপে পচে যায়।

(২) জমি খুব মোলায়েমভাবে কাদা করে সমতল করে নিতে হবে যাতে সেচের জল সর্বত্র সমানভাবে দাঁড়াতে পারে।

শেষ চাষ দেওয়ার আগে মূল রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে তা ১০—১২ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে জমির উপরে ২—৩ সেন্টিমিটার জল দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে।

জমি তৈরি করার সময় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে :—

(১) ভালভাবে পচেনি একরূপ জৈব পদার্থ জমিতে বেশী থাকলে তা মাটির নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ, অতি বিজারিত অবস্থার সৃষ্টি এবং পচনক্রিয়ার জন্তু বিভিন্ন বিষাক্ত যৌগের সৃষ্টির ফলে চারা লেগে যেতে দেয়ী হয়। এ অবস্থার মোকাবিলা করতে হলে জৈব সার পচনের জন্তু রোয়ার কাজ কিছুটা পিছিয়ে দিতে হবে এবং মূল সারে নাইট্রোজেন এর মাত্রাও বাড়িয়ে দিতে হবে।

(২) জমির সর্বত্র সমানভাবে গাছের বৃদ্ধি, নাইট্রোজেনের সুরক্ষা ও জলের সদ্ব্যবহারের জন্তু জমি নিখুঁতভাবে সমতল করা একান্ত প্রয়োজন।

(৩) মূল সার জমির বিজারিত স্তরে পৌঁছে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ বিধি

রাসায়নিক সারের সূচু ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাতে ফলন বাড়ি এবং কৃষকের লাভ বেশী হয়। রাসায়নিক সারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে ফসলের পরিচর্যাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সার প্রয়োগ সত্ত্বেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় না।

মূল সার প্রয়োগ

সুপারিশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ এবং সুপারিশের সিকি পরিমাণ নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করে কাদা জমির উপরিভাগের ১০—১৫ সেন্টিমিটার গভীরতা পর্যন্ত মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

রাসায়নিক সারের মাধ্যমে প্রদত্ত নাইট্রোজেনের অপচয়ের জন্তু নিম্নলিখিত কারণগুলি দায়ী :—

(১) জমির উপরে জল প্রবাহ,

(২) উবে যাওয়া,

(৩) ডিনাইট্রিকেশন ও

(৪) চুইয়ে মাটির নীচের স্তরে গমন।

এই অপচয়ের পরিমাণ মাটির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার উপরও নির্ভর করে। এঁটেল মাটিতে এই অপচয় কম হয় এবং হালকা বেলে মাটি যার ক্যাটায়ন বিনিময় (Cation exchange)

ক্ষমতা কম সেখানে অপচয় বেশী হয়। আবার অল্প ভাবাপন্ন জমি অপেক্ষা ক্ষার ভাবাপন্ন জমি থেকে অপচয় বেশী হয়। অ্যামোনিয়াম অথবা ইউরিয়া সার মাটির বিজারিত স্তরে প্রয়োগ করে বা মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে এই অপচয় কমানো যায়। জমিতে সার ছড়িয়ে জমি ভাসিয়ে সেচ দিলে সার ধুয়ে গিয়ে নষ্ট হয়। অ্যামোনিয়াম অপেক্ষা ইউরিয়া সারে অপচয় হয় বেশী। উচ্চ পি-এইচ, উচ্চ তাপমাত্রা, কম ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা বিশিষ্ট মাটি এবং মুক্ত কার্বোনেট সমৃদ্ধ মাটি থেকে নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া গ্যাস রূপে সহজে উবে যায়।

জমি উত্তমরূপে চষে, আল বেঁধে এবং সেচের জল নিয়ন্ত্রণ করে সার ধুয়ে যাওয়া ও চুইয়ে যাওয়া বজ্রলাংশে হ্রাস করা যেতে পারে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রোজেন জারণ ক্রিয়ায় নাইট্রেটে রূপান্তরিত হতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এজছ NH^+ সৃষ্টিকারী সার মাটির গভীরে বিজারিত স্তরে প্রয়োগ করা এবং তা থেকে জারিত না হয় সেজছ কাদা জমির উপর সামান্য জল দাঁড় করিয়ে রাখা দরকার।

চাপান সার প্রয়োগ

জমি থেকে জল বার করে দিয়ে চাপান সার প্রয়োগ করা উচিত। হালকা জমির চেয়ে ভারী জমির পক্ষে এর গুরুত্ব আরও বেশী। অনেক জল দাঁড়ানো জমিতে চাপান সার প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ ধানগাছ সেই সারের খুব কমই কাজে লাগাতে পারে। কারণ তার কিছু অংশ ধুয়ে বেরিয়ে যেতে পারে এবং জলজ উদ্ভিদ বা আগাছা খাচ্চা হিসাবে টেনে নেয়। তাই চাপান সার প্রয়োগের কিছুদিন আগে সেচ বন্ধ

করে দিতে হবে অথবা জমি থেকে জল বের করে দিতে হবে। অবশ্য চাপান সার প্রয়োগের বেশী আগে জল বার করে দিলে আগাছা বাড়বে এবং নাইট্রোজেনের অপচয় হবে। সার প্রয়োগের আগে কাটা আল বা কাঁকড়ার গর্ত ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে হবে। প্রথম চাপানের সময় এবং গভীরে রোয়া চারার পক্ষে অ্যামোনিয়া ঘটিত সার ধান নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিলে নাইট্রোজেনের কার্য-কারিতা বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন সার চাপানের একদিন পরে জমিতে জল ঢোকালে সব চাইতে ভাল ফল পাওয়া যায়। আরও পরে জল ঢোকালে নাইট্রোজেনের অপচয় বৃদ্ধি পায়। চাপান সার প্রয়োগের সময় জমি যদি শুকনো হয়ে ফেটে গিয়ে থাকে, তবে চাপান সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই জল ঢুকিয়ে নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কোন সময়ে কি পরিমাণ সার দিতে হবে

নাইট্রোজেন সার এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে গাছ জীবনকালে সব সময় প্রয়োজন মত নাইট্রোজেন পায় এবং প্রদত্ত নাইট্রোজেন সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয় ও অপচয় কম হয়। নাইট্রোজেন প্রয়োগের উপযুক্ত সময় এবং পরিমাণ বিষয়ে আলোচনায় নীচের কটি কথা বিবেচনা করতে হবে।

- (ক) প্রথম পর্যায়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ পাশকাঠির সংখ্যা বাড়ায়।
- (খ) পরবর্তী কালে নাইট্রোজেন প্রয়োগে শিষ বড় হয় এবং দানা পুষ্ট হয়।
- (গ) ফুল আসার সময়ে নাইট্রোজেন প্রয়োগ দানাতে প্রোটিনের ভাগ বৃদ্ধি করে।



বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৯১

(ঘ) চাষের প্রাথমিক ফসলের পরিচর্যা
ক্ষেত্রে কোন ক্রটি ঘটে থাকলে চাপান
সার প্রয়োগের মাধ্যমে তা সংশোধন
করার সুযোগ থাকে।

জমির সর্বত্র গাছের বৃদ্ধি সমান না হলে
স্থান বিশেষে নাইট্রোজেন সার চাপান দিয়ে তা
সংশোধন করে নিতে হবে। বিচার বিবেচনা
করে চাপান সার প্রয়োগ করলে জমিতে সর্বত্র
গাছের বৃদ্ধি সমান করা যায়। পাশকাঠির
সংখ্যা ও শিষের ওজনও বাড়ানো যায়।

নাইট্রোজেন সার কতটা দিতে হবে তা জাত,
জলবায়ু, মাটির বৈশিষ্ট্য, রোগ-পোকার উপদ্রব,
পরিচর্যা, জলের ব্যবহার ইত্যাদির উপর
প্রধানতঃ নির্ভর করে। ফসলের বৃদ্ধির প্রতি
তীক্ষ্ণ নজর রেখে, পাতার রং দেখে চাপান সার
প্রয়োগ এবং বিভিন্ন পরিচর্যা করে ফসলকে
প্রয়োজনীয় মাত্রায় সারের যোগান দেওয়া
সম্ভব।

খাদ্য গ্রহণ ও ব্যবহার

সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, উপযুক্ত
পরিমাণে সার প্রয়োগ করে চাষ করা অধিক
ফলনশীল ধানের দানায় ১'৩ থেকে ১'৫ শতাংশ
নাইট্রোজেন, ০'৪ থেকে ০'৫ শতাংশ ফসফেট
এবং ০'৪ থেকে ০'৫ শতাংশ পটাশ এবং খড়ে
০'৬ থেকে ০'৭ শতাংশ নাইট্রোজেন, ০'১ থেকে
০'২ শতাংশ ফসফেট এবং ২ থেকে ৩ শতাংশ
পটাশ থাকে। উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা
সহজেই হিসাব করে নিতে পারি যে, ধান চাষ
করার ফলে এক একর জমি থেকে কি পরিমাণ
নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ অপসৃত হয়।
জমির স্থায়ী ভাণ্ডার এবং প্রদত্ত সার উভয় উৎস

থেকেই ধানগাছ এসব খাদ্য গ্রহণ করে।
বোরো ধান রোয়ার সময়ে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার
প্রভাবে জমি থেকে উদ্ভিদ খাদ্য নিঃসরণ এবং
গাছের পক্ষে তা গ্রহণ উভয় প্রক্রিয়াই খানিকটা
বাধাপ্রাপ্ত হয়। খরিফ ফসল, প্রধানতঃ আমন
ধানের পরে বোরো চাষ করার পূর্বে প্রাকৃতিক
উপায়ে জমির স্থায়ী ভাণ্ডারের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের
সুযোগ থাকে না বললেই চলে। এজন্যই উত্তম-
রূপে জমি চাষ এবং মূল সার প্রয়োগের গুরুত্ব
বেশী। যদিও জমি থেকে উদ্ভিদ খাদ্য নিঃসরণ
এবং বোরো ধানের খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে গবেষণা
খুব বেশীদূর এগোয়নি, তবু অনুমান করা যায়
যে উপস্থিত নাইট্রোজেনের ২০ শতাংশ, উপস্থিত
ফসফেটের ৪০ শতাংশ, উপস্থিত পটাশের
৪০ শতাংশ মাটির সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে এবং
মোটামুটি ৫০ শতাংশ নাইট্রোজেন, ২০ শতাংশ
ফসফেট এবং ৭০ শতাংশ পটাশ প্রদত্ত রাসায়নিক
সার থেকে বোরো ধান ব্যবহার করে থাকে।

সুপারিশ

মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সারের পরিমাণ ঠিক
করা উচিত, তবে সাধারণভাবে এই হারে
সুপারিশ করা যেতে পারে :—

হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১২ মেট্রিক টন ভাল
পচা জৈব সার প্রথম চাষের সময়ই জমিতে
ছড়িয়ে পর পর লাঙ্গল দিয়ে মাটির সাথে ভাল-
ভাবে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। জাত অনুযায়ী
শেষ চাষের আগে পরপৃষ্ঠার হারে প্রাথমিক
রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

পটাশ সারও অর্ধেক পরিমাণ প্রাথমিক
সার হিসাবে এবং বাকী অর্ধেক পাশকাঠি ছাড়ার
সময় চাপান হিসাবে দেওয়া যেতে পারে।

জাত	হেক্টর প্রতি প্রাথমিক সারের পরিমাণ (কেজিতে)		
	নাইট্রোজেন	ফসফেট	পটাশ
অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী জাত :			
রত্না, পলমন-৫৭৯,			
আই-আর ৩৬ ইত্যাদি	২৫	৫০	৫০
অধিক ফলনশীল মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী জাত :			
কুস্তি, শস্যশ্রী, ক্ষিতীশ,			
সি-এন-এম ২০ ইত্যাদি	৩০	৬০	৬০
স্থানীয় উন্নত জাত :			
লাঠিশাল	২০	৪০	৪০

মাটির প্রকৃতি ও ফসলের বৃদ্ধি বিবেচনা নাইট্রোজেন সার কিন্তু চাপান হিসাবে আপনাকে করে অন্ততঃ দুই দফায় নিম্নলিখিত হারে দিতে হবে :—

জাত	হেক্টর প্রতি চাপান সার (কেজিতে)	
	পাশকাঠি ছাড়ার সময়	থোড় আসার মুখে
অধিক ফলনশীল স্বল্পমেয়াদী জাত	৫০	২৫
অধিক ফলনশীল মধ্য ও দীর্ঘ-মেয়াদী জাত	৬০	৩০
স্থানীয় উন্নত জাত	৪০	২০

প্রাথমিক সার, কার্যকরী পাশকাঠির সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও অধিক ফলনের ভিত্তি সৃষ্টি করে। সময়মত ও পরিমিত সেচ, সার ও রোগ-পোকার দমন; দানার সংখ্যা, ওজন ও দানার প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

মন্তব্য

মাটির প্রকৃতি, জাত ও জলবায়ুর অবস্থা,

সারের দাম, ফসলের চলতি দাম, চাষের ব্যবস্থাপনা, শস্যরক্ষণ ইত্যাদির উপর বোরো চাষে সার প্রয়োগজনিত সর্বোচ্চ লাভ নির্ভর করে। সারের মাত্রা সুপারিশ করবার সময় কৃষকের সম্পদ ও ক্ষমতাও বিবেচনা করা দরকার। সার প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লিখিত প্রত্যেকটি সূত্রই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।



ফাল্গুন মাসের করণী

শীত ঋতুর অবসানে গাছে গাছে সবুজ কচি পাতার উকিঝুঁকি জানিয়ে দেয় বসন্তের আগমন। সেইসঙ্গে কৃষকের চাষের ক্ষেত্রেও আসে পরিবর্তন। প্রাক্-খরিরের চাষের শুরু এখন থেকেই। এ মাসে তরাই অঞ্চলে বোনা আউশের বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। এই অঞ্চলে বোনার উপযুক্ত অধিক ফলনশীল জাত আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলম ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১ এবং স্থানীয় উন্নত জাত হুলাং ও এম-সি ১৬১৬। বোনার আগে বীজ সব সময়েই শোধন করে বোনা দরকার।

বোরো

বোরো ধানের চাষ যাঁরা করেছেন তাঁদের এখন পরিচর্যা কাজ। ক্ষেতে নিড়ান দিয়ে চাপান সার দিন। রোগ পোকার আক্রমণ রোধ করার জন্য ক্ষেত নিয়মিত ঘুরে দেখা দরকার। রোগ পোকার আক্রমণ হয়েছে চোখে পড়লেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

গম

গম চাষে এ বছর কৃষকরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েছেন। গমে যদিও ধানের তুলনায় জলের পরিমাণ কম লাগে তবু ভাল ফলনের জন্য

নির্দিষ্ট সময়ে সেচ দেওয়া দরকার। এই সময়ে একবার সেচ দিন। সেচ এমনভাবে দিতে হবে জমিতে যেন জল না দাঁড়ায়। জমিতে জল বেশী জমলে গাছ হলদে হয়ে যাবে। তাতে গমের ফলন কম হবে। কালবৈশাখীর জলে গম যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য গম পাকার সঙ্গে সঙ্গে ফসল কেটে মাড়াই করে নিন। ধানের খড়ের মত গমের খড় গবাদি পশুর খাচ্চা হিসাবে ব্যবহার করুন।

পাট

উত্তরবঙ্গে অল্প বৃষ্টি এলাকায় উচু জমিতে এ মাসের শেষ থেকে মিঠে পাট চৈতালী (জে-আর-ও ৮৭৮) এবং নিচু জমিতে তেতো পাট সোনালী (জে-আর-সি ৩২১) বুনুন।

তিল

এ মাসে তিল বুনুন। তিলের উন্নত জাত বি-৬৭ ও বি-১৪। বোনার আগে মূল সার হিসাবে একর প্রতি ১০ কেজি করে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিন।

অন্যান্য ফসল

এ মাসের মাঝামাঝি থেকে মুগ ও কলাই বুনুন।

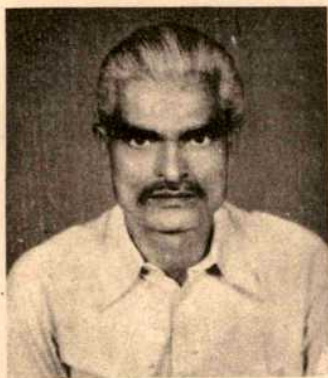
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের উদ্ভান শাখার ৫০ বর্ষ পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ১৯৮৪-৮৫ সালের আমের মরশুমে রাজ্য আন্তর-উদ্ভান প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ২৪ পরগণা (উত্তর) জেলার মহঃ সাদরুদ্দিন আমেদ। দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন মালদা জেলার মহঃ শাহাজাত হোসেন খাঁ ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন নদীয়া জেলার সুজিত কুমার বিশ্বাস।



মহঃ সাদরুদ্দিন আমেদ



রাজ্য আম্র উদ্ভান প্রতিযোগিতা



মহঃ শাহাজাত হোসেন খাঁ

এই তিন বিজয়ীর বিষয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা হলো। প্রথম স্থান অধিকারী মোহঃ সাদরুদ্দিন আমেদ ২৪ পরগণা জেলার দেগজার নন্দীপারা গ্রামের একজন কৃষক। দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ছোট থেকেই চাষের কাজে আগ্রহ। তাঁর মোট ১৭ একর জমির মধ্যে ১৫ একরে আম বাগান। এই বাগানে প্রায় ১৯টি জাতের আমগাছ আছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, হিমসাগর, লক্ষণ্ডা, বোম্বাই ইত্যাদি। আমবাগানের তিনি নিয়মিত যত্ন নেন এবং রোগপোকা দমনের যথারীতি ব্যবস্থা নেন। তাঁর একটি নার্সারীও আছে, যেখান থেকে স্থানীয় বাজারে চারা বিক্রিও করে থাকেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহঃ

বসুন্ধরা : মাঘ : ১৩৯১

শাহাজাত হোসেন খাঁ। মোহঃ হোসেন খাঁ কালিয়াচক রকের সৈয়দপুর গ্রামের একজন কৃষক। স্থানীয় স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পারিবারিক দায়িত্বভার এসে পড়ায় অল্প বয়সেই চাষের কাজে নেমে পড়েন। চাষ করার সময়ই বুঝতে পারেন যে মালদা জেলার অর্থকরী ফসল আম। তাই ফসল চাষ ছাড়াও চার একর জমিতে আম বাগান করেন। উন্নত পদ্ধতিতে যেমন চাষের কাজ করতে থাকেন, সেইসঙ্গে আম বাগানের উন্নতির দিকেও নজর দেন। তিনি প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে একবার ও আশ্বিন মাসে একবার বাগানে চাষ দেন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আম ভাঙ্গার পর গাছে যে সমস্ত পরগাছা থাকে, তা নষ্ট করে ফেলেন। গাছ সজীব রাখার জন্য প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি বাগানে রাসায়নিক সার ও গোবর সার দেন। একটি বড় গাছে গোবর সার দেন তিন বুড়ি, হুপার ফসফেট তিন কেজি, ইউরিয়া দেড় কেজি ও মিঃ পটাশ আধ কেজি।

আমগাছে মুকুল আসার আগে পৌষ মাসের মাঝামাঝি একবার কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করেন। মুকুল আসার পর মুকুল ফুটে যাওয়ার আগে দ্বিতীয়বার এবং আম যখন মটর দানার মত হয় তখন তৃতীয়বার বা শেষ বারের মত ওষুধ প্রয়োগ করেন। ওষুধ হিসাবে সেভিন বা রোগার ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর বাগানে যেসব আমগাছ রয়েছে তার মধ্যে—ফজলী, বোম্বাই, হিমসাগর, ল্যাংড়া, লক্ষণভোগ ইত্যাদি। প্রতি বছর আনুমানিক ফজলী গাছে এক হাজার, হিমসাগর দুই হাজার, ল্যাংড়া তিন হাজার



শক্তি কুমার বিশ্বাস

থেকে চার হাজার, বোম্বাই তিন হাজার, লক্ষণ-ভোগ তিন হাজার, এই রকম সব জাতের গাছ থেকেই তিনি ভাল ফলন পেয়ে থাকেন। তাঁর মতে আম পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত ভাঙ্গা উচিত নয়, তাতে গাছের ক্ষতি হয়। তিনি আম বাগান ও চাষের জমি থেকে যা আয় করেন তাতে তাঁর ১৪ জনের সংসার ভালভাবেই চলে এবং ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও করেছেন।

তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন নদীয়া জেলার ধোপাট্টা গ্রামের শ্রীশক্তি কুমার বিশ্বাস। তিনি আই. এ. পাশ। তাঁর আমের বাগান তেহট্ট থানার ধোপাহাট মৌজায়। তাঁর বাগানে আমগাছের সংখ্যা ৮৭টি। উল্লেখযোগ্য আম হলো হিমসাগর, ল্যাংড়া, বোম্বাই, ফজলী, চন্দনকোশা ইত্যাদি। বাগান তৈরির জন্য তিনি চারা সংগ্রহ করেছিলেন কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র থেকে।

সংবাদ

সুবাবুলের গাছ-পাতা পশুখাত্তের যোগ্য করে তোলার উপায়

পশুখাত্ত কুশলীদের মতে পশুদের সুবাবুলের ডালপালা বা গাছ-পাতা কাঁচা না খাইয়ে তা যদি কিছুটা শুকিয়ে বা জলে ভিজিয়ে অথবা মাটি চাপা দিয়ে রেখে তারপর পশুদের খাওয়ানো যায় তাহলে কাঁচা সুবাবুলের গাছ-পাতায় যে বিষাক্ত পদার্থ থাকে, বহু পরিমাণে তা কমিয়ে ফেলা যায়।

চায় থেকে ছয় ঘণ্টা যদি সুবাবুলের পাতা কড়া রোদে শুকিয়ে নেওয়া যায় তবে এর বিষাক্ত পদার্থ কমে যায়। সুবাবুলের পাতা পশুদের খাড়ে ধীরে ধীরে মিশিয়ে দিলে তাদের শরীরের রুমেন ব্যাকটেরিয়া এই খাড়ের সঙ্গে পরিচিত

হয়। কলে খাড়া সহজেই হজম হয়। সুবাবুলের বিষাক্ততা ৭০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপেও শোখন করে নেওয়া যায়। এই খাড়ের সঙ্গে পশুদের যদি শতকরা ১ ভাগ ফেরাস সালফেটও খাওয়ানো যায় তাহলেও এর বিষাক্ততা কমানো সম্ভব হয়। এই নিয়ম বিষাক্ততা সম্পন্ন সুবাবুল চাষের জন্য সুপারিশ করা হয়।

মহিষ ও ছাগল যদি মাঠে চরার সময় কাঁচা সুবাবুলের পাতা খায় এবং তা যদি তাদের বেশী খেতে না দেওয়া হয় তাহলে পশুদের ক্ষতি হয় না। এ ছাড়াও মহিষ ও ছাগলের খাড়ে শতকরা ৩০ ভাগের কম সুবাবুল মেশানো থাকলে তাদের ক্ষতি হয় না।

(এফ. আই. ইউ)

কৃষি সংবাদ

আমের শোষক পোকা দমন করুন

আমের শোষক পোকা ধূসর অথবা কালচে ধূসর রংয়ের হয়। দেখতে খুব ছোট ও এদের গায়ে অনেক কালো কালো চিহ্ন থাকে। এদের বিরক্ত করলে ছটফট করে লাফিয়ে বেড়ায়। এই পোকারাই আমের মুকুলের এবং কচি গুটির রস শুষে খায়, যার ফলে এগুলি শুকিয়ে অকালে ঝরে পড়ে। কচি মুকুলের রস শুষে নেওয়ার দরুন আমের ফলন ব্যাহত হয়। এই পোকা দমন করতে হলে নীচের লেখা যে কোন একটি ওষুধ মুকুল আসার ঠিক আগে একবার ও গুটি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর একবার মোট দুইবার স্প্রে করতে হবে। মোটর-চালিত বা পদ-চালিত স্প্রেয়ার ব্যবহার করুন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
১) মোনোক্রোটোফস ৪০%	১'৫ মিলি
২) কার্বারিল ৫০%	২'৫ গ্রাম
৩) ডাইমিথয়েট ৩০%	১'৫ মিলি
৪) ফসফামিডন ৮৫%	০'৫ মিলি
৫) মিথাইল ডেমিটন ২৫%	২ মিলি
৬) ক্রমোথিয়ন ২৫%	২ মিলি
৭) ম্যালাথিয়ন ৫০%	২ মিলি

মনে রাখবেন

মুকুল ফোটা অবস্থায় স্প্রে করা উচিত নয়।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রচারিত

কৃষিক্ষেত্র

নিয়মান্বলী

পত্রিকার প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে তথ্যবা তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাফাৎকার, মজা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রযোজক, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিক্ষেত্র, কৃষি বিপণন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, ঘৎস্যাচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সম্ব্যবহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গাছপালাবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃষ্টির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জন্য সম্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সম্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফেল কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কাজি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা ভাষায় লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধুনী। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

প্রাথমিক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার প্রাথমিক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য প্রাথমিক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদের বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা "কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ"-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ফ্রসড) পোস্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রদর্শনের জন্য এবং অর্থ পূটার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদের মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং 'আই-ই-এন্-এস' দ্বারা স্বীকৃত এক্সেসীক বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নশীল যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বৈধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এক্সেসিট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এক্সেসিট তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির কম এক্সেসিট দেওয়া হয় না। এক্সেসিটমূল্যে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এক্সেসিট অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বামে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রথায় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

১। উন্নত মানের বীজ

২। রাসায়নিক সার

৩। জৈব সার

৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ

৫। মাটি সংশোধক

৬। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য

১। জেটর/ইন্টারন্যাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর

২। কুবোটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার

৩। “সুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট

৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার

৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রে শার

৬। হস্তচালিত ছইলহো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি

৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল পাম্প

তদুপরি,

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো-ইণ্ডাস্ট্রীজ

কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

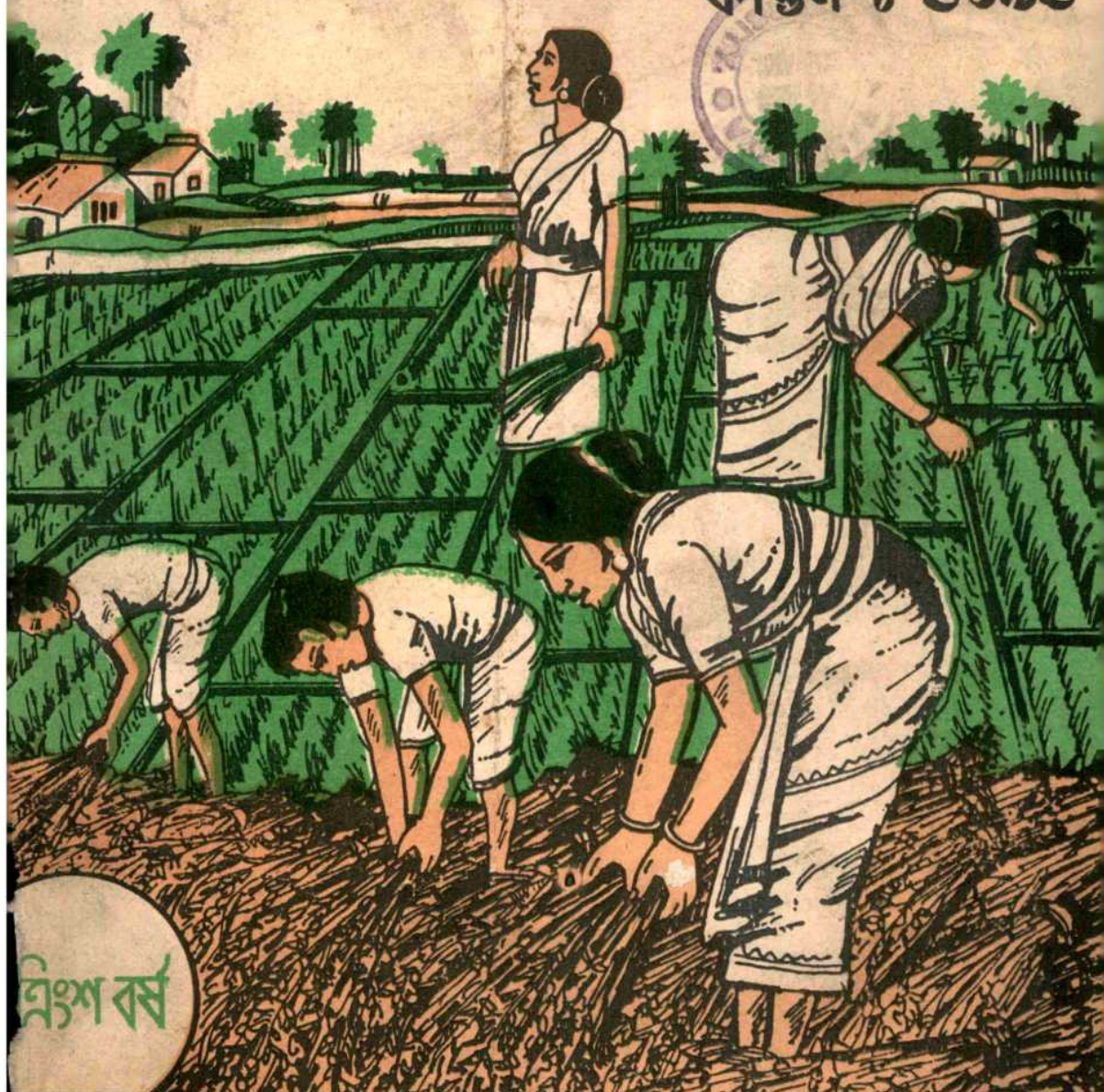
টেলিফোন : ২২-২৩১৪

২৩-৩১৯২

(কৃষি তথ্য সংস্থা কর্তৃক অকস্ট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রচারিত)

ସ୍ୱାଧୀନତା

ଫାଲ୍ଗୁନ : ୧୩୯୯



ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ

শ্রী

সম্পাদকীয়	৩-৪
মুগের চাষ	৫-৮
রমা ভট্টাচার্য্য	
চীনাবাদামের চাষ	৯-১১
কুমি ছড়া	১৩
অমলেন্দু সরকার	
উন্নত প্রথায় পাটের চাষ করুন ...	১৪-১৭
চৈত্র মাসে কুমকের করণীয় ...	১৮
খাইল্যাওে ধান চাষ—	
একটি সাক্ষাৎকার	১৯-২১
ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায়	
আউশের উন্নত জাত	২২-২৩
ভুট্টার চাষ	২৪-২৮
রাজ্য শীতকালীন ফল ও সবজি	
প্রদর্শনী	২৯-৩১

সম্পাদনা উপবেষ্টা পর্ব
বিক্রপদ মণ্ডল, কুমি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কুমি অধিকর্তা
(সাধারণ)
ডঃ দেবব্রত মুখার্জী, অপর কুমি অধিকর্তা
(গবেষণা)
মুর্জী মুখার্জী, মুখ্য কুমি অধিকর্তা (সম্প্রদায়িক)
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কুমি বিভাগ
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ
আধিকারিক, কুমি অধিকার
অমিয় কুমার মিত্র, জেলা কুমি তথ্য আধিকারিক
(সদর)

স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ ঘোষাচারী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক
বিক্রপদ মণ্ডল, কুমি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুসংস্করণ

ফাল্গুন-১৩৯১

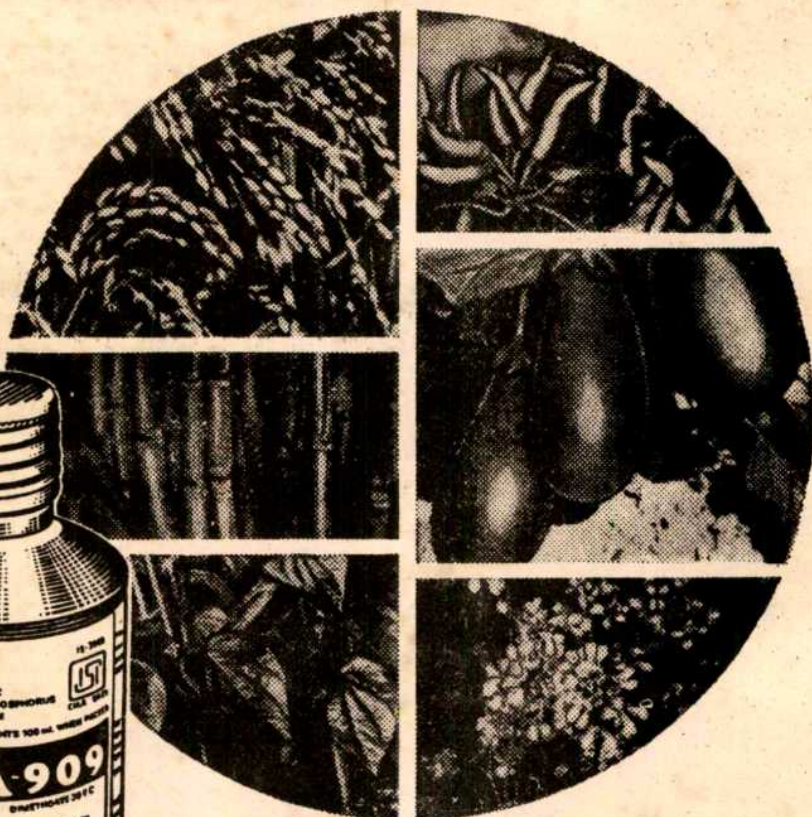
কুমি বিভাগের কুমি-তথ্য সংস্থা

কর্তৃক প্রকাশিত

পোকার যম... খরচ কম

তার-৯০৯

শক্তিশালী কীটনাশক ওষধ



পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচান

তার-৯০৯ ডাইমেথোয়েট ৩০% ই.সি. ব্যবহার করুন

প্রস্তুতকারক :

শ' ওয়ালেস এণ্ড কোং লিঃ

৪, বাদশাল স্ট্রীট,
কলিকাতা : ৭০০ ০০৬



শ' ওয়ালেস উৎপাদন

সম্প্রদায়



ফাল্গুনে রবি ফসল ক্ষেতে তৈরী। সেই ফসল ঘরে উঠবে এখন। সেচপ্রাপ্ত জমির এলাকা বাড়ার ফলে রবি মরশুমে চাষের এলাকাও আগের তুলনায় অনেকটা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে রবি মরশুমে ফলনও এখন অনেক বেড়েছে। গত বছরই আলুর রেকর্ড ফলন পাওয়া গেছে। এ বছরও আশা করা যাচ্ছে আলুর ফলনে রেকর্ড তৈরি হবে। শাক-সবজির উৎপাদনও অনেক বেড়েছে। শীতের সবজির শেষ পর্যায়ে হাটে বাজারে এখন তার প্রাচুর্য চোখে পড়ে।

এর থেকে বলা যায় যে কৃষি উৎপাদন আমাদের বেড়েছে। উৎপাদন বাড়ি যেমন আনন্দের বিষয়, সেইসঙ্গে কৃষক যাতে সেই উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্য পায় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। না হলে কৃষকের এই অধিক উৎপাদনের ইচ্ছা এবং চেষ্টায় বাধা পড়বে। যে চাষ কৃষক একদিন উৎসাহের সঙ্গে শুরু করেছিল তাতে ভাঁটা পড়বে। এই বিষয়ে তাই চিন্তা ভাবনার দরকার রয়েছে।

সরকার অবশ্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আছেন। এ বছর আলুর ভাল ফলন হয়েছে। আলুর দাম যাতে না কমে যায় সেজন্য আলু তোলার পরই তা যাতে হিমঘরে মজুত রাখা হয় সেজন্য হিমঘরের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হিমঘরের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের হিমঘরে আলু রাখা নিয়ে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। এইসব সমস্যা দূর করার জগুও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া বিপন্ন ব্যবস্থার উন্নতির জগুও নানা চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রাম থেকে কৃষক যাতে সহজে তার পণ্য শহরে বিক্রির জায়গায় আনতে পারে সেজন্য গ্রাম্য সড়ক ব্যবস্থার উন্নতির পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং এ কাজ অনেকটা অগ্রসরও হয়েছে। কৃষক তার পণ্যের যাতে উচিত দাম পায় সেজন্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ানো হচ্ছে।

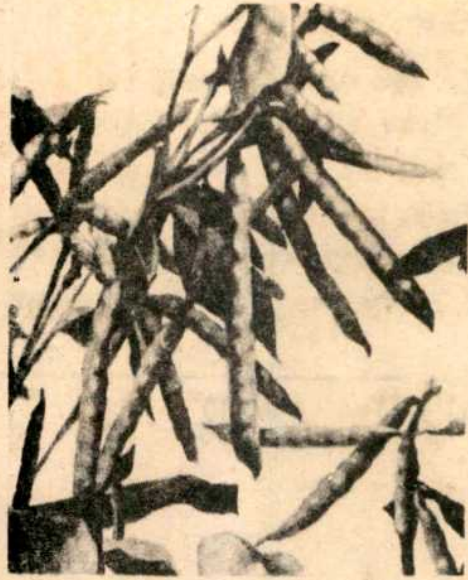
একসঙ্গে অনেক ফসল উৎপাদন হলে তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর দামও কমে যায়। সেজন্য ফল ও সবজি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আরও উন্নত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসব পরিকল্পনা কার্যকরী করা ছাড়াও বিপন্ন ব্যবস্থার উন্নতির জগু আরও কি করা

যেতে পারে সরকার সে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন।

উচিত মূল্যের কথা যেমন আমাদের ভাবতে হবে, সেইসঙ্গে উৎপাদন প্রচেষ্টাও অব্যাহত রাখতে হবে। রবি ফসল কেটে তোলার পর এবং পাট বা আউশ ধান চাষ করার আগে অনেক জমি খালি পড়ে থাকে। এই সময়ে স্বল্প মেয়াদী ফসল হিসাবে একটি ডালশস্ত্রের চাষ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন সেচপ্রাপ্ত এলাকায় গম, আলু এবং সরষের পর চৈতালী মুগের চাষ করা যায়। তাছাড়া সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ধান কাটার পরে জমিতে যে রস থাকে তার সাহায্যে বিনা সেচে চৈতালী মুগের চাষ করা যায়। পুরো ফাল্গুন মাসই চৈতালী মুগ বোনা যায় এবং এই সময় বুনলে ফলনও সবচেয়ে ভাল পাওয়া যায়। কৃষক তাতে লাভবান হবেন। উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কৃষক যাতে ফসলের গ্রাহ্য দাম পায় সেদিকে যেমন চেষ্টা থাকবে, তেমনি ভাল দাম পাওয়ার জন্য ফসলের মানের উন্নতির দিকেও নজর দিতে হবে।

মুগের চাষ

রমা ভট্টাচার্য



পশ্চিমবঙ্গে মুগের চাষ খাড়া পাঁচ বছরের (১৯৭৯-৮০) গড় হিসাবে ৩৮৯০০ হেক্টর জমিতে হয়ে থাকে। গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ৫২৪ কেজি। এর মধ্যে ৪৮০০ হেক্টর খরিক খন্দে এবং ২৬২০০ হেক্টর প্রাক-খরিকে চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার প্রধানতঃ মাঘ, ফাল্গুন মাসে মুগ চাষের প্রচলন বেশী। এই লব জায়গায় আমন ধান কাটার পর জমির জল শুকিয়ে এলে শীতের শেষে মুগ চাষ সাধারণতঃ হয়ে থাকে। অন্ত্যান্ত জেলার যেমন ছপলী, বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলায় প্রাক-খরিকে স্বল্পমেরাদী মুগের চাষ ক্রমশঃ বাড়ছে ও কৃষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফাল্গুন মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত মুগ বোনা চলে তবে ফাল্গুন মাসের ফলন সর্বোচ্চে বেশী হতে দেখা গেছে।

কৃষিবিদ, কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ।

ডালশস্ত্র উৎপাদনে পাঁচমবল একটি ঘাটতি রাজ্য। এই ঘাটতি পূরণে প্রাক-খরিকে মুগের চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। প্রাক-খরিকে মুগের চাষ ডালের এলাকা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং সামান্য ঝড় নিলে হেক্টর প্রতি মুগের ফলন বাড়ানোও খুব অসম্ভব নয়। স্বল্পমেরাদী উন্নত জাত উদ্ভাবনের ফলে সেচ-সেবিত অঞ্চলে সরষে, গম ও আলুর পর এবং পাট, আউশ ও আমন ধান লাগাবার আগে একটি ৬০—৭০ দিনের মুগের চাষ তুলে নেওয়া সম্ভব। সমগ্র রাজ্যের কৃষির অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে প্রাক-খরিকে মুগ একটি লাভজনক চাষ। এই চাষে জমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়।

এই নিবন্ধে মুগের ফলন বাড়াতে গেলে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছে।

বহুধরা : কানুন : ১৩৯১

১। উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করা

হেষ্টির প্রতি মূগের ফলন বাড়াতে গেলে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন। এতে ফলন তো ভাল হবেই, এছাড়া রোগও অনেকটা কমবে। বহরমপুরের ডালশস্ত্র ও তৈলবীজ কেন্দ্র থেকে মূগের কয়েকটি উন্নত

জাত যেমন মূগ বি-১, বি-১০৫, টি-৫১ ও টি-৪৪ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি কে-৮৫১, শি-এস ১৬ ও পদ্ম মূগ ২ এই তিনটি পরীক্ষিত অন্নমোদী মূগের উন্নত জাতও পশ্চিমবঙ্গে ভাল ফল দিয়েছে। বিবরণ নিম্নরূপ।

(১) মূগ বি-১ (সোনালী)

সোনালী রঙের ছোট দানা। ৩০—৬৫ দিনে পাকে। হেষ্টির প্রতি উৎপাদন ৮—৯ কুইন্টাল। শতকরা ২৭.৬ ভাগ প্রোটিন আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চল ও দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চলের উপযোগী।

(২) মূগ বি-১০৫ (পাশা)

সবুজ রঙের বড় দানা। ৫৫—৬০ দিনে পাকে। হেষ্টির প্রতি ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। শতকরা ২৬.৭ ভাগ প্রোটিন আছে। গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চলের উপযোগী।

(৩) মূগ টি-৪৪ ও
টি-৫১ }

সবুজ জাতের বড় দানা। ৬০—৭৫ দিনে পাকে। হেষ্টির প্রতি ফলন ৮—১০ কুইন্টাল। শতকরা প্রোটিনের ভাগ ২৪। লালমাটি ও কঁকুরে অঞ্চলের উপযোগী।

(৪) কে-৮৫১

কালচে সবুজ রঙের বড় দানা। ৬০—৬৫ দিনে পাকে। হেষ্টির প্রতি গড় ফলন ৮—১০ কুইন্টাল।

(৫) শি-এস ১৬

সবুজ রঙের দানা। ৬০—৭০ দিনে পাকে। হেষ্টির প্রতি গড় ফলন ৮—১০ কুইন্টাল।

(৬) পদ্ম মূগ ২

সবুজ রঙের দানা। ৬০ দিনে পাকে। হেষ্টির প্রতি ফলন ৭—৮ কুইন্টাল। শুঁটি মোটামুটি একসঙ্গে পেকে যায়।

২। সময়মত বীজ বোনা, সঠিক হারে বীজ বোনা ও হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক গাছ রাখা

সময়মত বীজ বোনা ও সঠিক হারে বীজ বুন হেক্টর প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক গাছ রাখা, এই বিষয়ে বিশেষ মজুর রাখা দরকার। ঠিক সময়ে বীজ না বুনলে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে একটি সেচ দিয়ে মৃগ বি-১ বুনলে হেক্টর প্রতি ১০—১২ কুইন্টাল অবধি ফলন পাওয়া যায়। চৈত্র প্রতি উপযুক্ত সংখ্যক গাছ রাখতে গেলে সঠিক হারে সারিতে বীজ বোনা দরকার। প্রাক-খরিকে মৃগ প্রতি হেক্টরে ৩০—৩৫ কেজি হারে সারিতে ২০×৫ সেমি: দূরত্বে বুনলে উপযুক্ত সংখ্যক গাছ থাকবে এবং ফলনও ভাল হবে। দ্বিতীয়ে বুনলে প্রতি বর্গমিটারে অন্ততঃ ১০০টি গাছ রাখা দরকার।

৩। সেচ ও পরিচর্যা

মৃগে সাধারণতঃ সেচের প্রয়োজন হয় না। বীজ বোনার সময় মাটির অবস্থা বুঝে বীজ বোনার আগে একটি হালকা সেচ দেওয়া দরকার। ফুল আসার সময় একটি হালকা সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়, তবে মাটিতে যথেষ্ট রস থাকলে এই সেচের প্রয়োজন নেই।

ভালের ক্ষেতে পরিচর্যা খুব কমই করতে দেখা যায়। কিন্তু যখন ভাল পেতে হলে আগাছা পরিষ্কার করা নিত্যসুই দরকার। চারা বেরোবার তিন সপ্তাহ পরে একবার আগাছা পরিষ্কার করা দরকার।

৪। সার ও জীবাণু সারের ব্যবহার

মৃগ একটি গুটি জাতীয় ফসল। এর শিকড়ে

এক বিশেষ ধরনের 'রাইজোবিয়াম' জীবাণু গুটি বাঁধে ও বাতাস থেকে 'নাইট্রোজেন' সংগ্রহ করে গাছকে সরবরাহ করে। সেইজন্ম মৃগে নাইট্রোজেন ঘটিত সার বেশী প্রয়োগ করার দরকার নেই। তবে যতদিন না শিকড়ে রাইজোবিয়াম জীবাণু গুটি বাঁধছে ও কার্যকরী হচ্ছে ততদিন সারের চাহিদা মেটাবার জন্য মাটির উর্বরতা ভেদে প্রতি হেক্টরে ১০—১২ কেজি নাইট্রোজেন দিতে হবে। বীজ বোনার আগে মৃগের জন্য নির্দিষ্ট জীবাণু সার সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট প্রাথমিক জীবাণু সার বীজের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। যেসব জমিতে মৃগের চাষ একেবারেই হয়নি সেই জমিতে অবশ্যই জীবাণু সার বীজের সঙ্গে প্রয়োগ করা দরকার। জীবাণু সার প্রয়োগে গাছের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। গাছ সবুজ, সতেজ হয় এবং একমাস বয়স হলে ১-২টি গাছ শিকড়গুচ্ছ তুললে শিকড়ে ছোট ছোট লাল রঙের গুটি দেখা যায়।

ফসফেট ঘটিত সার ভালশস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শুধু গাছের চাহিদা মেটাবার জন্য নয় জীবাণুগুলি গুটি বাঁধার ও কার্যকরী করার জন্য ফসফেট ঘটিত সার প্রয়োগ করা দরকার। উর্বরতা ভেদে হেক্টর প্রতি ৪০—৫০ কেজি ফসফেট দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৫। শস্ত রক্ষার ব্যবস্থা

রোগ ও পোকার আক্রমণ থেকে শস্ত রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রথমেই গ্রহণ করা দরকার। যেমন বীজ বোনার আগে বীজ শোধন। বীজ অঙ্কুরোদগম ও চারা অবস্থায় রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বোনার

বহুধরা : কানুন : ১৩৯১

আগে বীজ শোধন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বোনার ৭ দিন আগে ১ কিলোগ্রাম বীজে ১৫ গ্রাম খাইরাম ও ১৫ গ্রাম ত্রাসিকল ৮০ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিলে চারা অবস্থায় রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি জন্মায়। মুগের প্রধান মারাত্মক রোগ হোল কুটে রোগ। এই রোগ জাব পোকের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের পাতা হলদে ছিট ছিট দাগে পরিণত হয়। এই রোগ হলে ফলন খুব কমে যায়। এই রোগ দমন করতে হলে রোগ সহনশীল প্রজাতির চাষ করা দরকার। যে মাঠে এই রোগ দেখা যায় তার বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। রোগ দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় রোগাক্রান্ত গাছগুলি তুলে ফেলতে হবে। রোগ বহনকারী জাব পোকা দমনের জন্ত মিথাইল ডেমিটন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক্স বা ডাই মিথয়েট ঘটিত ওষুধ যেমন রোগের, প্রতি লিটার জলে এক মিলিলিটার মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এর জন্ত একর প্রতি ২৫০—৩০০ লিটার মিশ্র দ্রবণ লাগবে।

মুগের আরেকটি ক্ষতিকারক রোগ হোল বাদামী দাগ ধরা রোগ। সাধারণতঃ পরিণত অবস্থায় পাতায় ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায়। অনেক সময় ফলের ওপরও দাগ দেখা যায়। এই দাগ দেখা দিলে তামাঘটিত কপার

অক্সিজোরাইড যেমন রাইটক্স বা কাইটোলান একর প্রতি ১ কেজি, ২৫০ লিটার জলে গুলে ১৫ দিন অন্তর অন্ততঃ দু'বার ছিটাতে হবে।

বিছা বা লোদা পোকের আক্রমণও মুগের ক্ষতি করে। এই পোকা দমনের জন্ত মিথাইল প্যারাথিয়ন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিস্টক্স প্রতি লিটার জলে ১৫ মিঃলিঃ পরিমাণ মত মিশিয়ে ছিটাতে হবে। এর জন্ত মিশ্র দ্রবণ একর প্রতি ২৫০—৩০০ লিটার লাগবে।

রোগ ও পোকের আক্রমণ প্রতিহত করতে চারা রোয়ার পরে গাছ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত মাঠে গিয়ে ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার। সব সময়ে মনে রাখতে হবে যেন ওষুধ প্রয়োগ প্রয়োজনভিত্তিক হয়।

৬। ফসল কাটা ও সংরক্ষণ

ভাল ফলন ও উন্নত মানের বীজ পেতে হলে উপযুক্ত সময়ে ফসল কাটা দরকার। মুগে অন্ততঃ ২ বার পাকা ও ৩টি গাছ থেকে তোলা দরকার। আড়াভেদে বোনার ৫০—৬০ দিনের মধ্যে প্রথমবার তোলার মত হয়ে যায়। এরপর ১০—১৫ দিনের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শুঁটিই পেকে যায়। মুগ বি-১০৫ ও টি-৪৪ অপেক্ষাকৃত একসঙ্গে পাকে।

ফসল কাটার পর বীজ সংরক্ষণের দিকেও নজর দেওয়া আবশ্যিক।

চীনাবাদামের চাষ



পশ্চিমবাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর (পশ্চিম), বর্ধমান, প্রভৃতি জেলার উঁচু জমির লাল ও কঁকুরে মাটিতে ধান চাষ ভাল হয় না। এসব অঞ্চলে শ্রমিক মরসুমে লাভজনকভাবে চীনাবাদামের চাষ করা সম্ভব। অগ্রাশ্র ফসল যেমন আউশ ধান, অড়হড়, ভুট্টা ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়েও চীনাবাদামের চাষ করা যায়। এছাড়া সুন্দরবন ও অগ্রাশ্র সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে আমন ধান কাটার পর উঁচু দো-আঁশ জমিতে রবি ফসল হিসাবে বিনা সেচে চীনাবাদামের চাষ করা যায়, কারণ এসব জমিতে তখনও যথেষ্ট রস থাকে। চীনাবাদামে শতকরা তেলের ভাগ আছে ৪৫ থেকে ৫০ অংশ। তবে ঘানিতে ভাললে ৫ থেকে ৭ ভাগ কম হয়। হেক্টর পিছু বাদামের ফলন পাওয়া যায় ১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল।

জমি

উঁচু ও মাঝারি বেলে দো-আঁশ এবং দো-আঁশ মাটি বাদাম চাষের পক্ষে উপযোগী।

পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরের লালমাটি অঞ্চলের ডাল্পা ও অল্পবর জমিতেও ঠিকমত সার দিয়ে বাদাম চাষ করা যায়। কিন্তু ভাল ফলনের জন্য এসব অঞ্চলের অল্প জমিতে পরিমাণ মত চুন দিয়ে বাদাম চাষের উপযোগী করে নেওয়া দরকার। মাটিতে চূনের পরিমাণ কম থাকলে ফলন ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে।

জমি তৈরি ও সার দেওয়া

বাদামের শুঁটি মাটির নীচে বাড়ে, তাই সোজাশুঁজি ও আড়াআড়িভাবে বারে বারে চাষ দিয়ে মাটি ভালভাবে বুরবুরে করে তৈরি করুন। মাটি বুরবুরে ও আলগা হলে বাদামের আকার বড় এবং ফলন বেশী হয়। জমি তৈরি করার সময় হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২৫ গাড়ী পচা গোবর সার বা কম্পোষ্ট ভাল করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। শেষ চাষের সময় হেক্টর পিছু ১০ কেজি নাইট্রোজেন, ৩০ কেজি ফসফেট এবং ৪৭ কেজি পটাশ ছড়িয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিন। জমিতে উই পোকের

বসুন্ধরা : ফাল্গুন : ১৩৯১

উপভব থাকলে জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ৩০ কেজি অলড্রিন (৫%) বা হেপ্টাক্লোর (৫%) বা ক্লোরডেন (৫%) মিশিয়ে দিন।

জাত

জাত হিসেবে বাদামকে দু' ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) খাড়া বা গুচ্ছ জাতীয়।

(খ) লতানো বা ছড়ানো জাতীয়।

পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী গুচ্ছ জাতের বাদামই ভাল।

গুচ্ছ জাত

(১) টি-এম-ভি ২ : জলদি জাতের, ৯০ থেকে ৯৫ দিনে পাকে। হালকা গোলাপী ছোট দানা, তেল আছে শতকরা ৫৩ ভাগ।

(২) টি-এম-ভি ৭ : খরা সহনশীল। ১০৫ দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল শতকরা ৪৯ ভাগ।

(৩) জে-১১ : মাঝারি জাতের, ১১০—১১৫ দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল ৫১%।

(৪) এ-কে ১২-২৪ : ১১০—১১৫ দিনে পাকে। মাঝারি দানা। তেল শতকরা ৫০ ভাগ।

(৫) এম্-এইচ ২ : বেঁটে জাত। মাঝারি আকারের দানা। ১১৫—১২৫ দিনে পাকে। তেল শতকরা ৫১ ভাগ।

(৬) ফুলে প্রগতি (জে-এল ২৪) জলদি জাত। ১০০—১১০ দিনে পাকে। তেল শতকরা ৫০ ভাগ। খরিফ মরসুমে চাষের উপযোগী।

বীজের হার

হেক্টর প্রতি ১০০—১১০ কেজি।

বীজ শোধন

বোনার এক সপ্তাহ আগে খোসা ছাড়ানো

প্রতি কেজি বীজের ৩ পুই বীজের ৩ গ্রাম ভাসিকল বা ৪ গ্রাম থাইরাম জাতীয় ওষুধ ভালভাবে মিশিয়ে শোধন নিন।

বোনার সময়

প্রাক-খরিফ, খরিফ ও রবি মরসুমে বাদামের চাষ করা যায়। তবে প্রাক-খরিফ ও খরিফে চাষই প্রধান। খরিফে সাধারণতঃ সেচের দরকার হয় না, রবি ও প্রাক-খরিফে দরকার হয়। যে সব অঞ্চলে কার্তিকের শেষ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত মাটিতে ভাল রস থাকে সেখানে বিনা সেচেও চাষ করা যায়, কিন্তু ফসল তুলতে সময় বেশী লাগে। খরিফে বোশেখ থেকে আষাঢ় এবং রবিতে কার্তিকের শেষ থেকে অশ্বিন এবং প্রাক-খরিফে মাঘ—ফাল্গুন বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। লালমাটি অঞ্চলের ডাঙ্গা জমিতে বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বীজ বোনা দরকার।

বীজ বোনা

মাটিতে ঠিকমত 'জো' এলে প্রতি খুপীতে একটি করে শোধান করা পুই বীজ ৫ সে.মি (২ ইঞ্চি) গভীরে বুহন। গুচ্ছ জাতে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সে.মি, এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ১০ সে.মি (৪ ইঞ্চি)। এম্-এইচ ২ জাতের বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৫ সে.মি, হবে।

পরিচর্যা

বাদামের ফলন অনেকটা নির্ভর করে যথাযথ পরিচর্যার উপর। বীজ থেকে কল বের হওয়ার দু সপ্তাহের মধ্যে চাকা-বিদার সাহায্যে ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করুন। দু সপ্তাহ পরে দ্বিতীয়বার চাকা-বিদার চালান। গাছের সারির মাঝের আগাছা হাত নিড়ানির সাহায্যে তুলে

দিন। প্রথম ফুল আসার ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যে মাথার গোড়ায় মাটি টেনে ভেলি বেঁধে দিন। মাটি আলগা থাকলে ফুল ভালভাবে মাটিতে চুকতে পারে এবং বাদাম ধরতেও অনেকটা সুবিধা হয়। এবার সেচের কথায় আসা যাক।

সেচ

খরিফ মরসুমে ঠিকমত বৃষ্টি হলে সেচের দরকার নেই। বৃষ্টি না হলে ২০ থেকে ২৫ দিন অন্তর হালকা সেচ দেওয়া দরকার। প্রাক-খরিফে ও রবি মরসুমে মাটি, বৃষ্টি ও ফলনের অবস্থা অনুযায়ী ২ থেকে ৪ বার সেচ দিন।

রোগ

প্রতিকার

(১) টিক্কা

প্রতি লিটার জলে ২৫ গ্রাম জিনেব কম্পাউণ্ড (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) বা ১ গ্রাম ফলটন (যেমন ডাইকোলেটান ইত্যাদি) বা ৭ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন ব্রাইটজ ইত্যাদি) জলে গুলে স্প্রে করুন।

(২) মরচে রোগ

প্রতি লিটার জলে এক গ্রাম বেনলেট ৫০ বা ব্যাভিট্রিন গুলে স্প্রে করুন।

(৩) ভলে পড়া রোগ

প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম হিসাবে ফলটন (যথা ডাইকোলেটান ইত্যাদি) গুলে কেবল আক্রান্ত জায়গায় গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করুন।

পোকা

লাল স্তম্ভপোকা

প্রতি লিটার জলে ১ মিলিলিটার হিসাবে মিথাইল প্যারাথিয়ন (যেমন মেটাসিড ৫০ ই-সি ইত্যাদি) বা এণ্ডোসালফান (যেমন থায়োডান ৩৫ ই-সি ইত্যাদি) গুলে স্প্রে করুন।

এক হেক্টরে রোগ-পোকা দমনের ওষুধ ছোটোতে মোটামুটি ৭৫০ লিটার জল লাগে।

ফসল তোলা

গুচ্ছ জাতের গাছের পাতায় অনেক ভাড়াভাড়া হলে রং ধরে। বীজ বোনার ১১৫ থেকে ১২০ দিনের পরে মাঠের ৫ থেকে ৫ জায়গা থেকে কয়েকটি গাছ তুলে যদি দেখা যায় (ক) অল্প চাপে বাদামের খোলা ভেঙ্গে যাচ্ছে,

(খ) খোসার ভেতরে শিরাগুলিতে কালচে রং ধরেছে, (গ) বীজের উপরকার পাতলা খোসাতে রং ধরেছে তাহলে বুঝতে হবে বাদাম তোলার সময় হয়েছে। প্রাক-খরিফ ও খরিফ মরসুমের চেয়ে রবি মরসুমে বাদাম পাকতে ৩০ থেকে ৪৫ দিন সময় বেশী লাগে। মাটি ভিজে থাকলে গাছ টেনে অথবা লাঙ্গল দিয়ে তুলে বাদাম ছাড়িয়ে নিন। বাদাম তুলে সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে শুকিয়ে নিন।

সময়মত ও সঠিক পরিমাণে ওষুধ প্রয়োগ করে বোরো ধানের শস্যরক্ষা করুন

নিম্নলিখিত কীটশত্রুগুলি বিশেষভাবে বোরো ধানের ক্ষতি করে :—

মাকরা পোকা—মাঘের শেষ দিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়। সাধারণতঃ শতকরা পাঁচটি পাশকাটি আক্রান্ত হলে অথবা ৫০টি গোছে একটি মাকরা পোকার মত বা ডিমের গাদা দেখা গেলে কীটনাশক প্রয়োগ করুন। ক্ষেতে ৫—৭ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে জল রাখার ব্যবস্থা করে একর প্রতি ৪ কেজি ফোরট ১০% (থাইমেট ১০ জি) বা ১২ কেজি কার্বোফুরান ৩% (ফুরাডান ৩ জি) প্রয়োগ করুন। তরল ওষুধের মধ্যে ৩ মি. লি. ফসফোমিডন ৮৫% বা ১ মি. লি. মিথাইল প্যারাথিয়ন বা ১৩ মি. লি. কুইনালফস ২৫% বা ২ মি.লি. এণ্ডোসালফান ৩৫% বা বি. এইচ. সি. ৫০% (জলে গোলা) ৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।

বাদামী শোষক পোকা—খাদ্য ফুল আসার সময় থেকে বাদামী শোষক পোকার আক্রমণ শুরু হয়। গুছিতে ৩টি পোকা দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন। নীচের যে কোন একটি ওষুধ গাছের গোড়ার দিকে স্প্রে করুন। প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম বি. এইচ. সি. ৫০% (জলে গোলা) বা ৩ মি.লি. ফসফোমিডন ৮৫% বা ১ মি.লি. মোনোক্রোটোফস ৪০% বা ২ মি.লি. ম্যালাথিয়ন ৫০% বা ২৩ গ্রাম কার্বারিল ৫০% স্প্রে করুন অথবা বি. এইচ. সি. ১০% গুঁড়ো একর প্রতি ১২ কেজি বা সেন্ট্রিন ৫% বা ফলিডল ২% একর প্রতি ১০ কেজি হারে প্রয়োগ করুন।

গন্ধী পোকা, লেদা বা শীষ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ হলে ১০ শতাংশ বি. এইচ. সি. গুঁড়ো একর প্রতি ১২ কেজি হিসাবে ক্ষেতে ও আলে বিকালের দিকে ভালভাবে छড়ান।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প

(হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড)

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন : ২১-২৬৩২-৩৪

কৃষি ছড়া

অমলেন্দু সরকার

উচ্ছে বিচ্ছে লাউ কুমড়ো
নানা রকম শাক
কৃষক স্থখে থাক ।
বাছারী বাট গাজর
মূলো বেগুন পালং পাতা
সবার কাড়ে নজর ।
সারা বছর, ধারাবাহিক
সবজি যেথা হয় ।
আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ
সবার উপর রয় ।

(পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকারের উজ্জান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে
রচিত)

॥ গ্রাহকদের প্রতি আবেদন ॥

“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকার ১৩৯১ সালের চাঁদার মেয়াদ ষাঁদের শেষ হয়ে যাচ্ছে বা গেছে, নতুন বছরের জন্ম চাঁদা পাঠিয়ে তাঁদের গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে । বার্ষিক চাঁদার টাকা পোষ্টাল অর্ডারে বা ব্যাঙ্ক ড্রাক্টে কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে, মহাকরণ, কলিকাতায় পাঠাতে হবে ।

প্রধান সম্পাদক



উন্নত প্রথা পাটের চাষ করুন

উন্নত প্রথা চাষ করে প্রতি একরে ১০—১২ কুইন্টাল পাট পাওয়া যায়। পশ্চিম-বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অনেক কৃষকই এরকম ফলন পাচ্ছেন। পাটের চাষ সময় মত করতে পারলে দ্বিতীয় ফসল তো নেয়া যায়, সুযোগ সুবিধা থাকলে আরও একটি ফসল পাওয়া যায়।

প্রায় সব রকম জমিতে পাট চাষ করা যায়। সব জাতের দো-আঁশ বিশেষতঃ পলি দো-আঁশ মাটিই ভাল। তেতো বা বগী কোনও পাটই চাষা অবস্থায় মাটিতে জল দাঁড়ানো সহ্য করতে পারে না। কিন্তু একটু বড় হলে তেতো পাট কিছুটা দাঁড়ানো জল সহ্য করতে পারে, বগী পাট তা পারে না। বগী পাটের জন্ম জল জমে না এমন জমি বেছে নিন।

মাটির অম্লত্ব বেশী থাকলে পাট ভাল হয় না, রোগের প্রকোপও, বিশেষ করে ডাঁটা পচা বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে। অম্লত্ব কমিয়ে সার দিলে ফলন ভাল পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বেশীর ভাগ জমি অম্ল। অগ্ৰাছ জায়গাতেও জমির অম্লত্ব বেশী থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে জমিতে চুন, ডলোমাইট, (বেসিক স্লাগের) গুঁড়ো বা চকস্ফাজ দিয়ে চাষ করুন। সঠিক মাত্রা জানার জন্ম মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন। মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হলে অম্ল জমির এঁটেল মাটিতে একর প্রতি ১৫ টন, দো-আঁশ মাটিতে ১ টন এবং বেলে মাটিতে ৫ টন চুন দিন। চুন দিয়ে জমি ভালভাবে চষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। চুন দিলে এক মাসের মধ্যে বীজ বুনবেন না বা সার দেবেন না।

উন্নত জাতের পাট

১) ডিতা পাট	জমি	বোনার সময়
সোনালী (জে-আর-সি ৩২১)	নীচু	ফাগুন থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি
সবুজ সোনা (জে-আর-সি ২১২)	মাঝারি, উচু	চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি
শ্রামলী (জে-আর-সি ৭৪৪৭)	মাঝারি-উচু	চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি
২) বগী (মিঠা) পাট		
চৈতালী (জে-আর-ও ৮৭৮)	মাঝারি-উচু জল দাঁড়ায় না	ফাগুনের শেষ থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি
বাহুদেব (জে-আর-ও ৭৮৩৫)	মাঝারি-উচু	চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমদিক
বৈশাখী (জে-আর-ও ৬৩২)	মাঝারি-উচু	বৈশাখ
নবীন (জে-আর-ও ৫২৪)	মাঝারি-উচু	চৈত্র ও বৈশাখ

নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে অসময়ে ফুল আসতে পারে এবং ফলন কম হবে।

জমি তৈরি

পাটের বীজ আকারে খুব ছোট। সেজন্য জমির মাটি বেশ বুরবুরে করে তৈরি করা দরকার। জমি থেকে আগের ফসলের শিকড় বা ডাঁটা ইত্যাদি পরিষ্কার করে বেছে ফেলে দরকার মত ৪ থেকে ৬ বার আড়াআড়িভাবে লাকল ও মই দিয়ে জমির মাটি গুঁড়ো করে নিন। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ হবে, ছোট চারাগুলিও সহজে বেড়ে উঠবে।

বীজ শোধন

প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম অর্গানো মারকিউরাল কম্পাউন্ড বা ২ গ্রাম ব্যাভিটিন-৫০% দিয়ে শোধন করে নিন। শোধিত বীজে চারা ধসা রোগের প্রকোপ কম হবে।

বীজের হার

বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে শতকরা ৮০ ভাগ থাকা উচিত। প্রতি একরে ভেত্রে পাট সারিতে বুনলে বীজ লাগে ২২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ৩ কেজি এবং মিঠে পাট সারিতে বুনলে লাগে ১২ কেজি ও ছিটিয়ে বুনলে ২ কেজি।

সারিতে বীজ বোনা

বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাট বুনুন। এতে বীজ কম লাগে, নিড়ান দেয়া সহজ হয়, ভালভাবে ওষুধ দেওয়া যায়, ফলন বেশী হয় অথচ খরচ কমে। পাটের সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০—২২.৫ সে.মি (৮—৯ ইঞ্চি) হওয়া উচিত। সারির মধ্যে ছিটি গাছের দূরত্ব ৫—৬ সে.মি (২—২.২ ইঞ্চি) এর বেশী যেন না হয়।

বহুধরা : ফাল্গুন : ১৩৯১

সেচ

যেখানে সেচ ব্যবস্থা আছে সেখানে বৃষ্টির জল অপেক্ষা না করে সেচের সাহায্যে সময় মত পাট বুচুন, যাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ফসলও সময় মত চাষ করতে পারেন। তাছাড়া সময় মত পাট বুনলে বেশী ফলন পাওয়া যায়। বোনার পর এবং বর্ষা শুরু হবার আগে পর্যন্ত ১৫—১৮ দিন অন্তর প্রয়োজন মত ২—৩ বার সেচ দিলে ভাল হয়।

সার দেওয়া

পাট চাষে মাটি পরীক্ষা না করে সার দেওয়ার কোন চালাও সুপারিশ করা শক্ত। তবে মোটামুটিভাবে তেতো পাটে একর পিছু ১৫—২৫ কেজি ও মিঠে পাটে একর পিছু ১০—১৮ কেজি নাইট্রোজেন ফলনের পক্ষে ভাল। ফসফেট ও পটাশের পরিমাণ হবে নাইট্রোজেনের অর্ধেক। সম্ভব হলে একর প্রতি ২ টন জৈব সার জমি তৈরীর সময় দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মোট রাসায়নিক সারের সবটুকু ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরির সময় দিন। চারা বেরানোর ৩—৪ সপ্তাহ (প্রথম নিড়ানির পর) পরে নাইট্রোজেন সারের অর্ধেক এবং বাকী অর্ধেক দেড় মাস পরে চাপান সার হিসেবে দিন। জমির মাটি হালকা অথবা অল্পবর বেলে দো-আঁশ হলে মোট নাইট্রোজেন সারের তিন ভাগের প্রথম ভাগ বোনার আগে শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয় ভাগ বোনার এক মাস পরে ও তৃতীয় ভাগ বোনার দেড় মাস পরে দিলে ফলন ভাল হয়। যে জমিতে গম-পাট, ধান-পাট, গম-ধান-পাট, পাট-ধান-আলু ইত্যাদি শস্য পর্যায়ে চাষ হয় এবং যে জমিতে



পাটের আগে সবজির বা আলুর চাষ হয়, সেখানে আগের ফসলে যথাযথ পরিমাণ ফসফেট দেওয়া থাকলে পাটের জন্য ফসফেট দরকার নাও হতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে দিলে চলে।

চাপান সার হিসাবে ইউরিয়া মাটিতে দেয়ার বদলে জলে গুলে স্ট্রয়ারের সাহায্যে পাতায় স্ট্রে করে প্রয়োগ করা যায় এবং তাতে কম পরিমাণ সার লাগে। তবে, উপযুক্ত ফলন পেতে ইউরিয়া সার দুবার স্ট্রে করতেই হবে। বোনার ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রথম বার এবং এর পরে আবার ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় বার ২ শতাংশ ইউরিয়া জ্বলণ (প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া) পাট গাছের গাভীর ভালভাবে স্ট্রে করুন। প্রতি একরে স্ট্রে করার জন্য ২৫০—৩০০ লিটার জল লাগে।

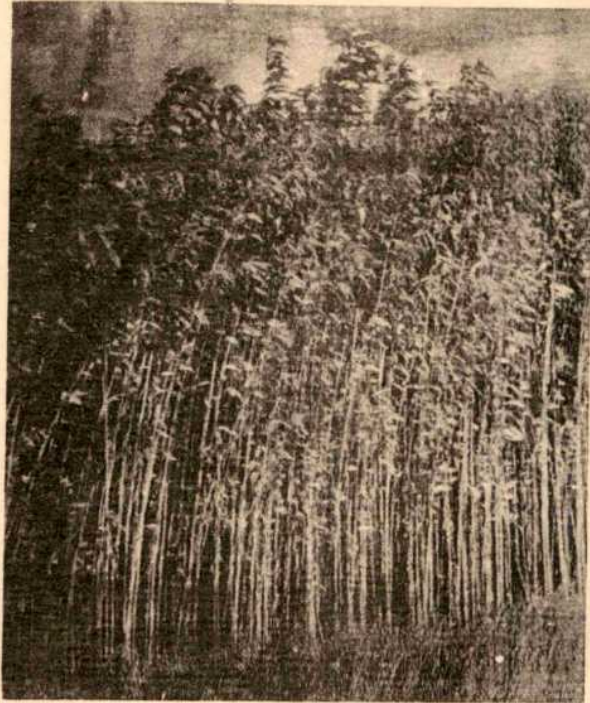
বোনার সময় থেকে ৩৫ থেকে ৬০ দিনের

মধ্যে উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের কাজ অবশ্যই শেষ করতে হবে। এর আগে বা পরে দিলে ততটা সফল পাওয়া যায় না। প্রয়োজন হলে ইউরিয়া গোলা জলের সাথে রোগ ও কীট-নাশক ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করা চলে, এতে খরচ কম হয়।

পরিচর্যা

পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সময় মত নিড়েন দিন। আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে মাটি আলগা রাখলে পাট তাড়াতাড়ি বাড়ে। চারা ৭ থেকে ১০ সে,মি (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি) মত লম্বা হলে সারির উপর দিয়ে আড়া আড়াভাবে সরু বিদে চালিয়ে এবং ছ সারির

মাঝে চাকা নিড়ানি চালিয়ে আগাছা মেরে মাটি আলগা করে দিন। এর পরেই একবার হাত নিড়ানি দিয়ে জমি ভালভাবে পরিষ্কার করুন এবং বাড়তি চারা তুলে ফেলুন। আগাছার উপদ্রব বুঝে পরে আরও ২—৩ বার চাকা নিড়ানি চালান। চারার উচ্চতা ১৪—১৫ সে,মি (৬ ইঞ্চি) হলে দ্বিতীয় বার বাড়তি চারা তুলে ফেলুন। যাতে সারিতে বোনা পাটে ছুটি চারার মধ্যে দূরত্ব থাকে ৫—৬ সে,মি (২—২½ ইঞ্চি) এবং ছটিয়ে বোনা পাটের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব থাকে ১০ সে,মি (৪ ইঞ্চি)। ছটিয়ে বোনা পাটের ক্ষেত্রে অনুরূপ সময়ে নিড়ানি দিয়ে মাটি আলগা এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।





চৈত্র মাসে কৃষকের করণীয়

এখন রবি মরহুমের শেষ সময়। প্রাক-খরিকের চাষ শুরু হচ্ছে।

পাট

এ মাসেই অধিকাংশ জাতের পাট বোনার উপযুক্ত সময়। কোন সময়ে কোন জাতের পাট বুনবেন তা জাত ও জমির অবস্থান অনুযায়ী ঠিক করে নিন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বুনলে অসময়ে ফুল এসে যেতে পারে। তাই বিভিন্ন সময়ে বুনবার জ্ঞান সুপারিশ করা জাতগুলি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিন। অভিবৃদ্ধির এলাকায় চৈতালী (জে-আর-ও ৮৭৮) জাতের পাট বুনবেন না।

আউশ

ফাল্গুনে বোনা আউশের পরিচর্যা করুন ও নিড়েন দিয়ে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।

মুগ

এ মাসেও মুগ বোনা যায়। মুগের উন্নত

জাত—মুগ-বি ১, বি-২০৫, টি-৪৪ এবং টি-৫১। লাল ও কঁকুরে মাটিতে টি-৪৪ জাতের ফলন ভাল পাওয়া যায়। বোনার আগে বীজ শোধন করে নিন।

গম

গম পেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে নিন। কাটতে দেবী হলে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। আগামী মরহুমে যাতে সময় মত বুনতে পারেন সেজ্ঞা নিজের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেই রাখুন।

অন্যান্য ফসল

তিল ও চীনাবাদামের ক্ষেতের এখন পরিচর্যা করুন। আখ ও সবজি ক্ষেতে সেচ দিন এবং প্রয়োজনমত রোগ-পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। আনারসের ক্ষেতে পরিমাণ মত সার দিন এবং অন্যান্য ফল বাগানের পরিচর্যা করুন।



প্রদর্শন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী জামলিয়াং

থাইল্যান্ডে ধান চাষ একটি সাক্ষাৎকার

ডঃ পুণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায়

নদী, নালা ও পাহাড়ে ঘেরা থাইল্যান্ডের গ্রামে গেলে পশ্চিমবঙ্গেরই কোন গ্রামে গেছি বলে মনে হয়। ধানই এই দেশের প্রধান ফসল—দেশের সর্বমোট ৫১৪ লক্ষ হেক্টর জমির মধ্যে প্রায় ১১৪ লক্ষ হেক্টর জমি শুধু ধানই অধিকার করে আছে। থাইল্যান্ড সারা বিশ্বের প্রায় ৬৬ শতাংশ ধানের জমির অধিকারী। চালের গড় ফলন অবশ্য বেশী নয়—হেক্টর প্রতি ১.২৫ টন (১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

শরৎের এক রৌদ্রতপ্ত দুপুরে থাইল্যান্ডের

ছেহেরাং সাও প্রদেশের ছ' নম্বর গ্রামের কৃষক রমণী শ্রীমতী জামলিয়াং গোমলের সঙ্গে ধান চাষ নিয়ে কথা হচ্ছিল দোভাষীর মাধ্যমে। ব্যাঙ, প্রেকং জেলাভুক্ত গ্রামটির অবস্থিতি ব্যাঙ্কক সহর থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে। উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে ধান চাষের ব্যাপারে অগ্রণী এই প্রদেশে আমন এবং বোরো বা আউশ ধানের মোট জমির পরিমাণ ছ' লক্ষ হেক্টর। এখানকার অধিকাংশ চাষীরই ছোট হস্তচালিত ট্রাক্টর আছে। চাষীরা জমিতে অধিক পরিমাণে

কীটতত্ত্ব, দ্র. ধাতু গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়া।

বসুন্ধরা : কাক্সন : ১০৯১

সারের ব্যবহারও করে থাকে। ধান চাষ সম্বন্ধে ভাল করে জানার জন্ত যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়— সে সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা হলো।

শ্রীমতি জামলিয়াংকে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁর মোট জমির পরিমাণ কত ?

প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম ওর মোট জমির পরিমাণ ৩৬৮ হেক্টর। এই জমিতে তিনি প্রধানতঃ ধানের চাষই করেন।

প্রশ্ন করলাম— আপনি কি কি জাতের ধান চাষ করে থাকেন ?

শ্রীমতি জামলিয়াং-এর উত্তর, তিনি আর-ডি-২০, আর-ডি-২৩, আর-ডি-২৫, আর-ডি-২১ প্রভৃতি জাতের ধান চাষ করেছেন।

শ্রীমতি জামলিয়াংকে জিজ্ঞাসা করলাম— আমাদের সামনে যে ধান দেখতে পাচ্ছি, এই ধানের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জানাবেন কি ? আপনি বোধ হয় জানেন যে আজ আমরা এই ধান দেখতেই এসেছি।

তিনি জানানেন— আপনারা ধানের যে প্রদর্শনী ক্ষেত্রে দেখতে এসেছেন তাতে আর-ডি-২০ জাতের ধান আছে। এর বংশ পরিচয় দিতে গেলে বলা যায় যে আর-ডি-১ এবং আই-আর ৬৬১ এর সংমিশ্রণে এই জাতের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রদর্শন ক্ষেত্রের মোট আয়তন ১০ রাই বা ১৬ হেক্টর। চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানানেন যে প্রথমে জমিতে লাঙল দিয়ে ও বিদা চালিয়ে কাদা করেছিলেন। পরে আবার বিদা বা মই দিয়ে জমি সমান করে আগাছা বেছে ফেলেন। এর পরে জমির অতিরিক্ত জল বের করে দেন। পরে পাম্পের সাহায্যে

নতুন জল ঢোকান এবং ১০ সেন্টিমিটার (৪ ইঞ্চি) গভীরতায় এই জল রেখে দেন। আর-ডি-২০ জাতের বীজ ছ' দিন জলে ভিজিয়ে রেখে এবং ছ' দিন জারিয়ে রেখে বীজের কল বেরিয়ে গেলে তখন ঐ জমিতে জলের মধ্যে বীজ ছিটিয়ে বুনে দেন। এক রাত্রি ঐভাবে বীজ জলের মধ্যে রাখার পরদিন সকালে জল বের করে দেন এবং ঐভাবে ১০—১৫ দিনের জন্ত অঙ্কুরিত বীজ মাঠে রেখে দেন। এর পরে জল ঢুকিয়ে জলের মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়িয়ে প্রায় ১০ সেন্টিমিটার গভীর করে রাখেন।

প্রশ্ন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না—আপনি কি হারে বীজ ছিটিয়ে ফেলেছেন ?

প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম যে, হেক্টর প্রতি জমিতে ১২৫ কেজি বীজ ফেলেছেন।

আবার প্রশ্নের অবতারণা করতে হ'ল—সার ও কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে। প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম, যখন চারার বয়স ২০ দিন তখন প্রতি বস্তা গ্র্যামোফসের (৫০ কেজি) সঙ্গে ১ কেজি ২, ৪-ডি মিশিয়ে প্রতি ২ রাই (০.৩২ হেক্টর) জমিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। চারার বয়স যখন ১০ দিন তখন চিরুণী পোকা বা থ্রিপ্স লেগেছিল এবং ঐ পোকা দমনের জন্ত কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়েছিল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে লেগেছিল লাঙ্গা পোকা। সবুজ শ্যামা পোকা এবং বাদামী শোষক পোকা। এই সব কীটশত্রুদের দমন করার জন্ত দ্বিতীয়বার কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এর ঠিক পরেই ১০ কেজি হারে গ্র্যামোফস দিয়েছিলাম। এর পরে তৃতীয়বার গ্র্যামোফস



জমি পরিদর্শনে এসেছেন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী

সালফেট দিয়েছিলাম অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ১০ কেজি হারে। ধানের জমিতে মাঝে মাঝে ঝলসা রোগ বা ব্লাষ্ট লাগে এবং এই রোগ দমনের জন্য ব্রাস্টিসিডিন স্প্রে করে থাকি।

আমি ১৯৮৪ সালের ১৮ই অক্টোবর শ্রীমতি জামলিয়াংএর ক্ষেত পরিদর্শন করেছিলাম। তখন ধানের শিষ বেরিয়ে গেছে। উন্নত শীর্ষের সবুজ ঘন ধান অধিক ফলনের ইঙ্গিত বহন করে। আমি শ্রীমতি জামলিয়াংএর কাছে শেষ প্রশ্ন রেখেছিলাম— আপনি কবে পর্যন্ত ধান কাটবেন এবং কত ফলন আপনি আশা করেন?

শ্রিত হাসিতে উদ্ভাসিত শ্রীমতি জামলিয়াং

উত্তর দিলেন—গত বছর আমি ৩'৬৮ হেক্টর জমি থেকে উনিশ হাজার কেজিরও কিছু বেশী ধান পেয়েছিলাম অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছিল ৫'১৬ টন। এ বছর আশা করছি হেক্টর প্রতি ৬ টন ধান পাব। সব কিছু ঠিকমত চললে আশা করি নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ধান কাটা হবে।

শ্রীমতি জামলিয়াংকে শঙ্কবাদ জানিয়ে গাড়িতে ওঠার আগে আর একবার ঘন সবুজ ও সুপুষ্ট ধানের দিকে তাকালাম। আমারও ক্ষেত দেখে মনে হয়েছিল ৬ টন ধান পাওয়া মোটেই অসম্ভাবিক নয়।

আউশের উন্নত উদ্ভাত



গত কয়েক বছরে ধানের বেশ কয়েকটা অধিক ফলনশীল জাত আবিষ্কৃত হয়েছে। উন্নত পদ্ধতিতে এইসব অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ করে ফলন যে অনেক বাড়ানো যায় রাজ্যের অধিকাংশ কৃষকই সে বিষয়ে একমত। তাছাড়া সময়মত এইসব জাতের ধানের চাষ শুরু করলে পরবর্তী ফসল চাষের জঘাও যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, আবহাওয়া, জমির অবস্থান বিভিন্ন রকম। সব জাতের ধান সব জায়গায় ভাল হবে না। সেজন্য প্রাকৃতিক আবহাওয়া, জমির অবস্থান, সেচের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী উপযুক্ত জাতের ধান বেছে নিতে হবে। ভাল ফলনের জঘা জমির উপযোগী উপযুক্ত ধানটি বেছে নেওয়া একান্ত দরকার।

কোথায় কি জাতের ধান চাষ করা যাবে সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হলো।

(১) খরা প্রবণ কাঁকুরে মাটি অঞ্চল—এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে পুরুলিয়ার সমগ্র অঞ্চল। তাছাড়া বাঁকুড়া জেলা এবং মেদিনীপুর, বর্ধমান ও বীরভূমের পশ্চিমাঞ্চল।

এই অঞ্চলের উপযোগী অধিক ফলনশীল জাতের ধান হলো আই-ই-টি ৮২৬ ও ১৪৪৪ (রসি), পলমন ৫৭৯ ও সি-আর ১২৬-৪২-১ এবং স্থানীয় জাত জুয়ার। এই জাতগুলি বোনা ও রোয়ার উপযোগী। তবে যারা রোয়া করে বুনতে চান তাঁদের রোয়ার উপযোগী ধান হলো রত্না, সি-এন-এম ৬ (লক্ষ্মী) এবং ২৫, আই-ই-টি ২২৩৩ ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ) এবং আই-আর ৩৬।

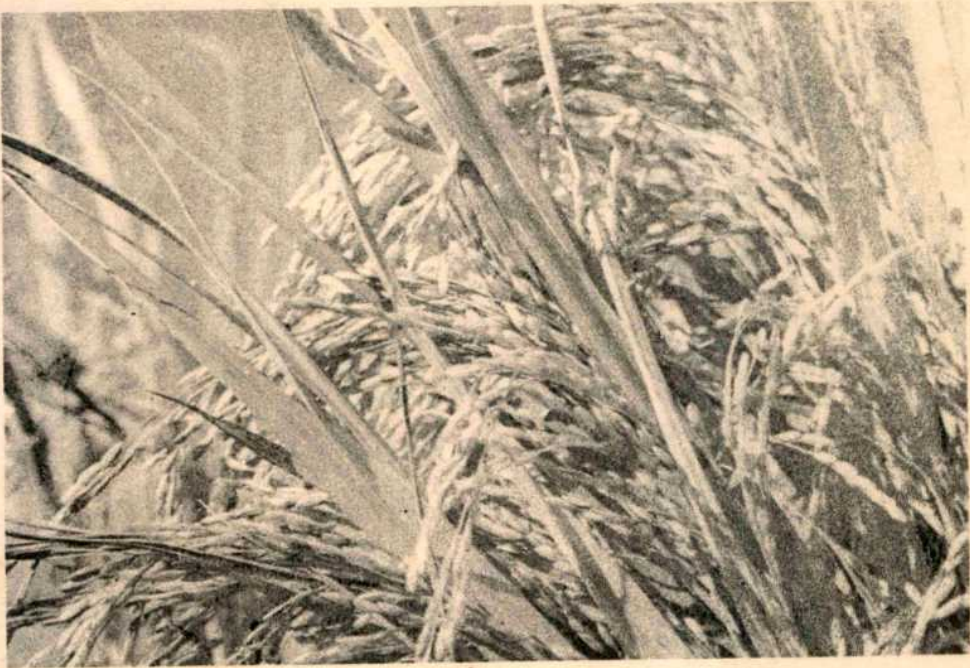
২। পলিমাটি অঞ্চল—পলিমাটি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া, জগলী, পশ্চিম দিনাজপুর (ইসলামপুর মহকুমা বাদে) এবং বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার পূর্বাঞ্চল।

এই অঞ্চলে বোনা ও রোয়ার উপযোগী ধানের জাত হলো পলম্নন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬। স্থানীয় জাত হলো ঢুলার এবং এন-সি ১৬২৬।

যারা ধান রোয়া করে বুনবেন, তাঁদের জন্য উপযোগী জাত হলো রত্না, সি-এন-এম ৬ (লক্ষী), আই-ই-টি ১৪৪৭ (রসি) ও ৪০৯৪ (ক্ষিতীশ)।

৩। তরাই অঞ্চল—এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমা। কেবল বোনার উপযোগী জাত হলো আই-ই-টি ১৪৪৪ (রসি) ও ২২৩৩, পলম্নন ৫৭৯ এবং সি-আর ১২৬-৪২-১। স্থানীয় জাত হিসাবে ব্যবহার করতে পারা যায়—ঢুলার ও এন-সি ১৬২৬।

আউশ মরসুমে উচু ও মাঝারি অবস্থানের যে কোন দো আঁশ জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ধানের চাষ করা হয়, তবু জমিতে সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে ফসলের ভাল ফলন হয়।



ভুট্টার চাষ

দানা জাতীয় খাদ্যশস্যের মধ্যে ভুট্টার উৎপাদন অস্বাভাবিক ফসলের তুলনায় যথেষ্ট বেশী। বছরের যে কোন সময়েই খরা প্রবণ, পাহাড়ী এবং সমতল অঞ্চলে এর চাষ করা যায়।

জমি ও মাটি

বিভিন্ন রকমের জমি ও মাটিতে ভুট্টার চাষ সম্ভব হলেও উঁচু, ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থায়ুক্ত ও জল ধারণক্ষম দো-আঁশ বা বালি দো-আঁশ অল্প অল্প ভাবাপন্ন মাটি সবচেয়ে উপযোগী।

জাত

উচ্চ ফলনশীল সংকর (Hybrid) ও যৌগিক ভুট্টার চাষ বিশেষ লাভজনক। কিন্তু সংকর ভুট্টার চাষে প্রতি বছর নতুন বীজ সংগ্রহ করে লাগাতে হবে। কৃষক তার নিজের ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করে লাগাতে পারবেন না, লাগালেও ভাল ফলন পাবেন না। যৌগিক ভুট্টার ক্ষেত্রে কৃষক তার নিজের ক্ষেতের ফসল থেকে বীজ নিয়ে লাগাতে পারবেন। তবে ৩ বছর এইভাবে চাষ করার পরে নতুন বীজ সংগ্রহ করে লাগাতে হবে।

এলাকা	লাগানোর সময়	জাত	কতদিনে পাকে	একর প্রতি ফলন/কুইন্টাল
পাহাড়ী	প্রাক-খরিক	সংকর : ভি-এল ৫৪,	১৩০—১৩৫	১৯—২০
		হিম-১২৩		
		যৌগিক : বিজয়, কিয়াণ ও নবীন		
খরা	খরিক	যৌগিক : দিয়ারা ও রাজেন্দ্রমকা-১	৭৫—৮০	১৩—১৫

এলাকা	লাগানোর সময়	উপযুক্ত জাত	কতদিনে পাকে	একর প্রতি ফলন
সমতল	খরিফ	সংকর : গঙ্গা-৫, সফেদ-২ ও ডেকান-১০১	১০০—১১০	১৮—২০
	যৌগিক : জহর, কিষণ ও বিজয়		১০০—১১০	১৮—২০

বোনার সময় ও বীজের হার

পাহাড়ী এলাকায় মার্চ মাসের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ বোনার উপযুক্ত সময়। এতে বহু ফসলী চাষ করা সম্ভব। অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতায় এর আগেও বোনা চলে। বেশী উচ্চ এলাকার জমিতে আরও দেরীতে বোনা দরকার। বোনার সময় কিছুটা তাপমাত্রা বা শৈত্যের উপর নির্ভর করে। সমতল এলাকার খরা এবং অঞ্চলে খরিফ মরসুমে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে বোনার উপযুক্ত সময়।

একর প্রতি ৮—১০ কেজি নীরোগ, পুষ্ট ও শতকরা ৯০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন বীজের প্রয়োজন।

বীজ শোধন

পাতা ধসা, ডাঁটা পচা প্রভৃতি বীজ ও মৃত্তিকা বাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড (যেমন এথোসেন জি-এন ইত্যাদি) বা ফিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট (যেমন সেরেসান ও'ডা ইত্যাদি) ভালভাবে বীজের সঙ্গে মিশিয়ে শোধন করে নিন।

জমি তৈরি

৩—৪ বার লাজল দিয়ে ভূট্টা বোনা যায়। দুই সারি ভূট্টার মধ্যে ষথেষ্ট দূরত্ব থাকে, প্রয়োজন হলে দুই সারির মাঝখানের মাত্র ২০—২৫ সে.মি

(৮—১০ ইঞ্চি) পরিসর জায়গা পরিষ্কার করে নামমাত্র চষে ভূট্টার দানা বোনা যায়। এভাবে বুনলে প্রাথমিক সার চষা জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার দেয়া

সম্ভব হলে চাষ দেওয়ার আগেই একর প্রতি ৪—৫ গাড়ী হারে কম্পোষ্ট বা গোবর সার জমির ওপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিন। প্রাক খরিফ ও খরিফ মরসুমে একর প্রতি ৪০ : ২০ : ২০ নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ দিতে হবে। সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ এবং অর্ধেক নাইট্রোজেন শেষ চাষের আগেই প্রাথমিক সার হিসাবে দিন।

বোনা

৭৫ সে.মি (৩০ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারি করে সারির মধ্যে ২০—২৫ সে.মি (৮—১০ ইঞ্চি) দূরে ২টি করে বীজ ৫—৬ সে.মি (২—২ই ইঞ্চি) গভীরে বুনুন। বীজ গজানোর ৬—৭ দিনের মধ্যে প্রতি জায়গায় ১টি মাত্র চারা রেখে অষ্টটি তুলে ফেলুন। কোনভাবে একই জায়গায় ২টি গাছ থেকে গেলে কোনটাতেই ভাল ভূট্টা হবে না। জলদি জাতের বেলায় সারির মধ্যে ২টি বীজের দূরত্ব হবে ২০ সে.মি (৮ ইঞ্চি)। একর প্রতি গাছের সংখ্যা ২২—২৪ হাজারের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অবশ্য পাহাড়ী অঞ্চলে

বহুজর : ফাল্গুন : ১৩২১

ও খরা প্রবণ অঞ্চলে একর প্রতি ৩০—৩২ হাজার গাছ থাকলে ভাল ফলন দেয়।

পরিচর্যা

চারা বেরবার পর ১৫—২০ দিনের মাথায় দু সারির মধ্যে চাকা বিদা চালিয়ে আগাছা তুলে ও বেছে ফেলুন। গাছ ৩০ সে.মি (১২ ইঞ্চি) 'র মত লম্বা হলে দুটি সারির মাঝ থেকে মাটি টেনে গাছের গোড়ায় ভালভাবে ধরিয়ে দিলে গাছ গড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। সারির মাঝখানের মাটি তুলে নিলে যে নালা হবে তা সেচ দেওয়ার কাজে লাগবে।

চাপান সার

অর্ধেক নাইট্রোজেন সমান দু ভাগে ভাগ করে দু দফায় চাপান হিসাবে দিন। প্রথমবার গাছের গোড়ায় মাটি ধরানোর আগে গাছ থেকে ১৫ সে.মি (৪ ইঞ্চি) দূরে সারিতে এবং গাছের মাথায় ২-১টা পুরুষ ফল (Tussel) দেখতে পেলেই দ্বিতীয়বার চাপান সার সারির মধ্যে একইভাবে দিন।

সেচ

প্রাক খরিরের চাষে বর্ষা নামার আগে ৩ সপ্তাহ অন্তর ১-২টি সেচ দেবার প্রয়োজন দেখা যায়। খরির মরসুমের চাষে সেচের কোন প্রয়োজন হয় না, বর্ষার জলই যথেষ্ট। তবে জমিতে জল যেন না জমে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে। সেচের ব্যাপারে ফুল আসার

সময়ই হলো বিশেষ সঙ্কটময় সময়, সে সময়ে মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রস না থাকলে ফলন অনেক কমে যায়।

শস্য রক্ষা

ক) পোকা : ভুট্টার ক্ষেতে মাজরা, পাতা মোড়া, জাব পোকা প্রভৃতির উপদ্রব দেখা যায়। এদের মধ্যে মাজরা পোকার উপদ্রবই বেশী।

মাজরা পোকা

বীজ বোনার ২—৩ সপ্তাহ পর থেকে আক্রমণ শুরু হয়। আক্রমণে ছোট গাছের মাঝের পাতা শুকিয়ে যায়, বড় গাছের বাড় কমে যায়। বোনার পর থেকেই ক্ষেতের ফসলের উপর লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আক্রমণ দেখা দিলে একালান্ন ২৫ ই-সি প্রতি লিটার জলে ১'৫ মিঃলিঃ হিসাবে গুলে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করুন।

পাতা মোড়া পোকা

এরা পাতা মোড়ে ও পাতার সবুজ অংশ খেয়ে সাদা করে দেয়। এদের দমনের জন্য উপরোক্ত কীটনাশক ওষুধ ছাড়াও প্রতি লিটার জলে ১ মিঃলিঃ মোনোক্রোটোফস (যেমন সুভাক্রন ৪০ ইত্যাদি) মিশিয়ে স্প্রে করুন।

জাব পোকা

জাব পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিম্নলিখিত ওষুধগুলির যে কোন একটি ব্যবহার করুন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
ফসফোমিডন (যেমন ডিমেক্রন ১০০ ইত্যাদি)	২ মিঃলিঃ
মিথাইল ডেমিটন (যেমন মেটাসিসটক্স ইত্যাদি)	১

খ) রোগ : পাতা ধসা, পাতায় দাগ পড়া, বাদামী দাগ, মরচে, গোড়া ও ডাঁটা পচা রোগই সাধারণতঃ ভূট্টাতে দেখা যায়।

পাতা ধসা বা দাগ ধরা

ফুল আসার সময় গাছ সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়। এর আক্রমণে পাতার ওপর বড় বড় ডিম্বাকৃতি বা লম্বাটে ধূসর রঙের দাগ পড়ে অথবা বাদামী রঙের ছোট দাগ এবং অল্পকূল আবহাওয়ায় বেড়ে একে অপরের সাথে মিশে যায় যার ফলে আক্রান্ত পাতাগুলি ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়। এর ব্যাপক আক্রমণে ফুল ও দানার ক্ষতি হয়।

বাদামী দাগ পড়া

এই রোগের আক্রমণে পাতা বা ডাঁটার ওপরে প্রথমে ফ্যাকাসে সাদা রং এর দাগ হয় পরে তা বাদামী বা গাঢ় বাদামী রং হয়ে যায়। দাগগুলি সাধারণতঃ পাতার গোড়ার দিকে থাকে ও পরে একে অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

মরচে রোগ

এই রোগের আক্রমণে পাতার দুই দিকে গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি সামান্য উচু গুটি হয়ে দাগ পড়ে। প্রথমদিকে এই গুটির রং হলদে থাকে পরে বাদামী রঙের হয়ে যায় এবং এর চারপাশে ফিকে হলুদ রং দেখতে পাওয়া যায়। এর ব্যাপক আক্রমণে পাতার রং ফিকে হয়ে যায়। অবশেষে এই গুটি থেকে রোগের জীবাণু চারপাশে ছড়িয়ে যায়।

প্রতিকার

উপরোক্ত রোগগুলি থেকে কসল বাঁচাতে এখানে বলা ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে।

১) রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির চাষ করতে হবে।

২) উপযুক্তভাবে নিড়ান দিয়ে ক্ষেত পরিষ্কার রাখতে হবে।

৩) বোনার আগে বীজ অবশ্যই ঠিকমত শোধন করে নিতে হবে।

৪) পাতা ধসা ও দাগ ধরা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার জলে ৩ গ্রাম ম্যানকোজেব (যেমন ডাইথেন এম-৪৫ ইত্যাদি) মিশিয়ে ১৫—২০ দিন অন্তর ২ বার আক্রান্ত ক্ষেত ও আশেপাশের নীরোগ গাছে স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়া জনিত গোড়া পচা

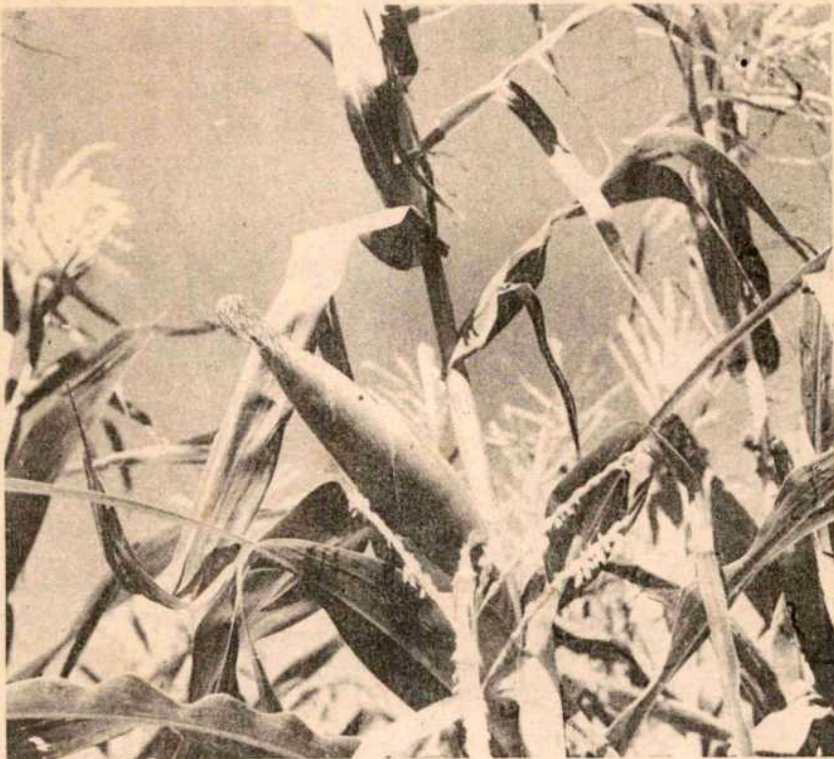
এই রোগের আক্রমণে ডাঁটার গোড়ার দিকের অংশ ক্রমশঃ নরম হয়ে পচতে আরম্ভ করে। আক্রান্ত গাছের পাতা ফিকে হলুদ রঙের হয়ে যায় ও পরে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত অংশ ধীরে ধীরে কালচে বাদামী রঙের হয়ে যায়। ডাঁটার এই পচা অংশ পরের দিকে শুকিয়ে যায় ও আঁশগুলি একে অপরের সাথে আবদ্ধ থাকে না। এই রোগে ভূট্টাও আক্রান্ত হতে পারে।

প্রতিকার

১) জমিতে যাতে জল না জমে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

২) বীজ ঘন করে বোনা উচিত নয়।

৩) রোগ আক্রমণ সহনশীল জাত ব্যবহার করা উচিত।



ফসল তোলা

গাছের পাতা হলেদে হয়ে এলে এবং দানা শক্ত হয়ে পেকে যাওয়ার পর গাছগুলি কেটে ভুট্টাগুলি আলাদা করে নিন। দানায় শতকরা ২৫—৩০ ভাগ রস থাকতে থাকতে ভুট্টার গাছ কাটা যায়। দানাগুলি পায়ে চালানো ভুট্টা মাড়াই কলের সাহায্যে সহজেই ভুট্টা থেকে আলাদা করা যায়। দানাগুলি ভালভাবে রোদে

শুকিয়ে নিতে হবে যাতে দানায় রস শতকরা ১২—১৪ ভাগে নেমে আসে। যদি দানা ছাড়ানোর কাজ পরে করতে চান, তা হলে খোলাসহ ভুট্টাগুলি ভাল করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে ছায়ায় দড়ির ওপর ঝুলিয়ে দেবেন। অনেকে রান্নাঘরের মধ্যে দড়ি বেঁধে তাতে ভুট্টা ঝুলিয়ে রাখেন। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় খোসাশুদ্ধ ভুট্টা অনেকদিন ভালভাবে রাখা যায়।



রাজ্য শীতকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনী



পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের উদ্ভান শাখার ৫০ বর্ষ পূর্তিতে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে রাজ্য শীতকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় নরেন্দ্রপুরে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রদর্শনী আয়োজিত হয় এবং চলে পাঁচ দিন ধরে। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেলা থেকে ফল ও সবজি উৎপাদকরা প্রতিযোগী হিসাবে যোগদান করেন। ফল ও সবজি ছাড়া ফল ও সবজি থেকে তৈরি সামগ্রী যেমন জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদিও প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্য কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল গুহ। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি শ্রী শিবদাস ভট্টাচার্য। সভায় অগ্রাঙ্কদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্রপুর গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা), রাজ্য উদ্ভানবিদ ও আরও অনেকে।

কৃষিমন্ত্রী মাননীয় শ্রী কমল গুহ তাঁর ভাষণে কৃষকদের তথা উৎপাদকদের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। কিন্তু সে তুলনায় কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হয়নি। কারণ শস্য ও সবজির অধিক উৎপাদন করে আশাহুঁরুপ দাম তাঁরা পান না। যাতে কৃষকরা উৎপাদিত শস্যের দ্বারা দাম পায় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার সময় এসেছে।

২৪ পরগণা জেলার সভাপতি শ্রী ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে বলেন যে ঐ অঞ্চলটি সবজি প্রধান। সবজির চাষ বেড়েছে। কৃষকরা সবজি চাষে উৎসাহিত হয়েছেন তবে আরও বাড়ানো দরকার। সেইসঙ্গে আলানি ইত্যাদির জন্ম সোসাল ফরেস্ট্রি স্কীমে উপযুক্ত গাছ লাগানোও প্রয়োজন।

রাজ্যের অপর কৃষি অধিকর্তা (গবেষণা) শ্রী দেবব্রত মুখার্জি তাঁর ভাষণে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে নানা রকম সবজি ও ফল উৎপাদন করা যায়। এদিকে কাজও হচ্ছে, তবে এর

বঙ্গবন্ধু : কাক্তন : ১৯৯১

প্রসারের জন্য ভাল কলম ও গুটির অভাব রয়েছে। সপ্তম যোজনাকালে রাজ্য উন্নয়ন শাখার কাজের আরও উন্নতি করা এবং কলম, গুটি, চারা ইত্যাদি আরও বেশী করে উৎপাদন করার চেষ্টা করা হবে। রাজ্য উন্নয়নবিদ ডঃ হেমেন সমাদ্দার ও অধ্যাপকরাও অল্পটানে তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

এবার প্রদর্শনীর কথায় আসি। এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন জেলা থেকে বিচিত্র ফল ও

সবজির সমারোহ ছিল। তাছাড়া ছিল আচার, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি। প্রদর্শনীটি তিনটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা ছিল। গ্রুপ-এতে রাজ্যের উৎপন্ন ফল। গ্রুপ-বিতে সবজি ও গ্রুপ-সিতে কমার্সিয়াল ফ্রুট প্রোডাক্টস। প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতায় ফল ও সবজিতে যারা প্রথম হয়েছেন তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

গ্রুপ-এ ফল

কমলালেবুতে	দার্জিলিং জেলার	লেনসিং লেপচা।
পেয়ারায়	২৪ পরগণা জেলার রাজপুর গ্রামের	হরনাথ দাস।
পেঁপেতে	হুগলী জেলার বাগডাঙ্গা নোয়াপাড়ার	নিতাই দাস
	ও মুর্শিদাবাদ জেলার খামার পরা	
	দৌলতাবাদের	সুনীল সরকার।
নারকেলে	২৪ পরগণা জেলার রাজপুর গ্রামের	হরনাথ দাস।
কূলে	মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নতুনপাড়ার	নকুল চন্দ্র শীল।

গ্রুপ-বি সবজি

ফুলকপিতে	২৪ পরগণা জেলার আদিকাশিমপুর	
	বারাসতের	বিশ্বদাস মুন্ডা।
বাঁধাকপিতে	বর্ধমান জেলার পাড়াতলের	মহঃ ইয়াসিন খাঁ
	ও হুগলী জেলার অমরপুর গ্রামের	শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ।
বেগুনে	মালদা জেলার	সুরেন রাজবংশী ও
		জিতু রাজবংশী
	২৪ পরগণা জেলার বনহুগলীর	নরুদ্দিন মাল।
টমেটোতে	নরেন্দ্রপুর গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টারের	রবিউল হক।
মূল্যেতে	২৪ পরগণা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের	ইলিয়াস শেখ।
কুমড়োতে	২৪ পরগণা জেলার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের	নরুদ্দিন মাল।
কড়াইশুঁটিতে	নদীয়া জেলার	আকবর আলি বিশ্বাস।

বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন কৃষি সচিব শ্রী বিশ্বনাথ শেনোই।

রাজ্য শীতকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনীর চিত্রাবলী



কৃষি অধিকারের উদ্ভান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী ও ফল
প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন কৃষিমন্ত্রী শ্রী কমল গুহ।



উদ্ভান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে মহোদয়গণের
আমন্ত্রণেবক ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত
শীতকালীন সবজি ও ফল প্রদর্শনীর একাংশ।



প্রদর্শনীতে কৃষি বিপণন শাখার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি
থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী জ্যাম, জেলি,
কোয়াশ ইত্যাদি সংরক্ষিত দ্রব্যগুলি ঘুরে দেখছেন
কৃষি সচিব ডঃ বিশ্বনাথ শেনোই।



উদ্ভান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত
আমবাগান প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার
বিজয়ী দেগদার মহঃ সদরুদ্দীন আহমেদ।
পুরস্কার বিতরণ করছেন কৃষি সচিব
ডঃ বিশ্বনাথ শেনোই।

আলোক চিত্র : শ্রী দিলীপ কুমার সাহা

ফরম—৪
রুল নং—৮
“বসুন্ধরা” মাসিক পত্রিকা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৮৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্য বিবরণ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশ স্থান—	৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০
২। প্রকাশ কাল—	মাসিক
৩। মুদ্রাকরের নাম—	তারাপদ রায়চৌধুরী
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০
৪। প্রকাশকের নাম—	কৃষি অধিকারের কৃষি তথ্য সংস্থা
জাতি—	—
ঠিকানা—	—
৫। প্রধান সম্পাদকের নাম—	বিষ্ণু পদ মণ্ডল
জাতি—	ভারতীয়
ঠিকানা—	রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০০০১

আমি শ্রী বিষ্ণু পদ মণ্ডল, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাঃ—বিষ্ণু পদ মণ্ডল
প্রধান সম্পাদক, বসুন্ধরা

কৃষিক্রান্তি

নিম্নমানমূল্য

পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ছোটগল্প, নাটিকা, সাক্ষাৎকার, নমুনা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োজনীয় কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী নীতি, প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল সংরক্ষণ, সমবায় ও কৃষিক্ষেত্র, কৃষি বিপন্নন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং সমষ্টিগত অভাব-অসুবিধার কথা, পশুপক্ষী পালন, মৎস্যচাষ, বনসম্পদ সংরক্ষণ, ভূমি সংরক্ষণ ও সন্ধানহার, ভূমিসংস্কার-গত রচনা ও সংবাদ, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃটির ও ক্ষুদ্রশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম-সংস্থানের সমস্যাাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

রচনার জন্তু সন্মানমূল্য : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরনের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সন্মানমূল্য দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ও ছোটগল্প : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

রচনা ফুলফ্রেম কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার ঠিকানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধুনী। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

গ্রাহক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত এক বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম এককালীন প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা রেখাঙ্কিত (ক্রেসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২, গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

বিজ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কভার) : ৫০০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কভার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস্’ দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ইহা একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) প্রচারের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/স্বয়ংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকলেই এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

কমিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া কপির মোট মূল্যের টাকা (২০%) কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভূততা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রণালী চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

- | | |
|---|--|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারন্যাশনাল/ফোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “সুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রে শার |
| ৬। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য | ৬। হস্তচালিত ছইলহো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল/লোহার লাক্স ইত্যাদি |
| | ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরলা পাশা |

তত্পরি,

(ক) কুচবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্র্যাণ্ডো-ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

টেলিফোন : ২২-২৩১৪

২৩০১২২

ସମ୍ବନ୍ଧ

ଚୈତ୍ର : ୨୦୩୨



ଷାଟ୍ଟିବିଂଶ ବର୍ଷ

সূচী

সম্পাদকীয়	৩-৪
উন্নত প্রথায় আউশ ধানের চাষ	৫-৭
আদিবাসী সমাজে যৌথ কৃষি খামারের	
নতুন পদক্ষেপ	৮-১০
রাধিকারজন দেবভূতি	
কাড়গ্রামে অর্থকরী ফসল	
কাছ চাষের প্রসার	১০-১১
ডঃ বিমান মাইতি	
শেওড়াফুলিতে কৃষক দিবস : প্রয়োত্তর	১২-১৪
জাগরণ সোম	
আট বিঘা জমি ও দশজননের সংসার	১৫-১৭
অর্চন কুমার চ্যাটার্জী	
পাটের পোকা মাকড় ও তার দমন	১৮-২০
উজান শাখার সুবর্ণজয়ন্তী :	
আলোচনা সভা	২১-২৪
চিদানন্দ গোস্বামী	
পশুখাদ্য প্রসঙ্গ	২৬-২৭
বৈশাখ মাসে কৃষকের করণীয়	২৮
বর্ণানুক্রমিক সূচী	২৯-৩২

সম্পাদনা উপদেষ্টা পর্ব	
বিক্রপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ	
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী, অপর কৃষি অধিকর্তা	
(সাধারণ)	
ডঃ দেবজিত মুখার্জী, অপর কৃষি অধিকর্তা	
(গবেষণা)	
বৃজী মুখার্জী, মুখ্য কৃষি অধিকর্তা (সম্প্রসারণ)	
বি. পি. উকিল, উপ-সচিব (উন্নয়ন), কৃষি বিভাগ	
অমলেন্দু সরকার, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ	
আধিকারিক, কৃষি অধিকার	
অমির কুমার মিত্র, জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক	
(সদর)	

স্বলেখা ঘোষ, সম্পাদিকা
চিদানন্দ গোস্বামী, সহ-সম্পাদক

প্রধান সম্পাদক
বিক্রপদ মণ্ডল, কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

বহুস্বাক্ষর।

চৈত্র-১৩৯১

কৃষি বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা।
কর্তৃক প্রকাশিত

উন্নত প্রথায় পাটের চাষ করে লাভের পরিমাণ বাড়ান

উন্নত জাতের পাট ও বোনার সময়—ফাল্গুন থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি সোনালী (জে. আর. সি. ৩২১) চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে বৈশাখের মাঝামাঝির মধ্যে সবুজ সোনা (জে. আর. সি. ২১২), চৈত্রের শেষ থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি শ্রামলী (জে. আর. সি. ৭৪৪৭) ইত্যাদি তেতো পাট বুনুন। ফাল্গুনের শেষ থেকে চৈত্রের মাঝামাঝি চৈতালী (জে. আর. ও. ৮৭৮), চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রথমদিকে বাসুদেব (জে. আর. ও. ৭৮৩৫), বৈশাখে বৈশাখী (জে. আর. ও. ৬৩২), চৈত্র ও বৈশাখে নবীন (জে. আর. ও. ৫২৪) জাতের পাটের চাষ করুন।

বীজ শোধন—প্রতি কেজি বীজ ৫ গ্রাম অর্গানো মারকিউরাল কম্পাউণ্ড বা ২ গ্রাম ব্যাভিট্রিন ৫০% দিয়ে শোধন করুন।

সেচ—বোনার পর বর্ষা সুরুর আগে ১৫—১৮ দিন অন্তর প্রয়োজনমত ২—৩ বার সেচ দিলে ভাল হয়।

সার প্রয়োগ—সাধারণভাবে তেতো পাটের ক্ষেত্রে একর প্রতি ১৫—২৫ কেজি ও মিঠাপাটে একর প্রতি ১০—১৮ কেজি নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। নাইট্রোজেনের অর্ধেক পরিমাণ ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করা প্রয়োজন। গম ইত্যাদির জমিতে পাট চাষ করলে সারের পরিমাণ কম লাগবে। প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম ইউরিয়া গুলে বোনার ৪০—৪৫ দিনের মধ্যে প্রথমবার ও এরপরে আবার ১০—১৫ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্বেচ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

পরিচর্যা—ক্ষেতের আগাছার উপদ্রব অমুখায়ী ২—৩ বার নিড়ান দিয়ে আগাছা দমন করুন।

পোকামাকড় দমন—পাট গাছে কেড়ি, ঘোড়া বা ডিড়িং, বিছা পোকা ও মাকড়ের আক্রমণ দেখা গেলে সময়মত ওষুধ প্রয়োগ করে দমন করুন।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকাশ

(হিন্দুস্থান কার্টলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড)

১২বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১, ফোন : ২১-২৬৩২-৩৪

সম্পাদক



বর্ষচক্রে চৈত্র বছরের শেষ মাস। এই সঙ্গে একটি বছরের প্রস্থান ও নতুন বছরের প্রবেশ। কৃষিবর্ষেও রবি মরশুমের চাষের শেষ। এখন রবি ফসল ঘরে উঠবে। যদিও বর্তমানে সেচের সুবিধা বাড়ার ফলে সারা বছরই কিছু কিছু ক্ষেতে চাষের কাজ চলে তবুও কৃষি মরশুম প্রাক-খরিকের চাষ দিয়েই শুরু। এই সময় কালবৈশাখীর জলে কৃষকরা পাট ও আউশ ধানের চাষ শুরু করবেন।

পাট চাষে গত বছর কৃষকদের আয় খুব ভাল হয়েছিল তাই এ বছর পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ ও উৎসাহ খুব বেশী। এই আগ্রহ ও উৎসাহের সুযোগ নিয়ে অনেক সময় বাজারে পাটবীজের ঘাটতি দেখিয়ে দর খুব বেড়ে যায়। এই অসুবিধায় চাষীরা যাতে না পড়েন সেজন্য তাঁদের জানানো হচ্ছে যে এ বছর উন্নত জাতের বীজের কোন অভাব নেই। পাট চাষীরা প্রয়োজনীয় উন্নত জাতের সার্টিফাইড বীজ সংগ্রহ করে সময়মত বুনুন। বীজ কেনার সময় প্যাকেটের উপর লেখা নির্দিষ্ট দাম ও প্যাকেটের ওজন দেখে নিতে অম্লরোধ করা হচ্ছে। বিভিন্ন জাতের পাটের বোনার সময় বিভিন্ন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে চাষীরা যেন পাট বোনে। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের আগে পাট বোনা উচিত নয়। আগে বুনলে অসময়ে ফুল আসতে পারে এবং ফলন তাতে কমে যায়।

প্রাক-খরিক দিয়ে চাষ শুরু করে এখন একই জমিতে বছরে দু'তিনটি ফসল অনেকেই চাষ করছেন। বিশেষ করে যেখানে সেচের সুবিধা আছে। একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন করতে হলে বছরের প্রথম থেকেই সারা বছরের শস্ত চাষের একটি পরিকল্পনা যদি তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে ফল অমেক ভাল পাওয়া যেতে পারে। শস্ত পর্যায় ঠিক করার সময় জলদি জাতের শস্তের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তাতে সেচপ্রাপ্ত জমি থেকে অনায়াসেই তিন বা চারটি ফসল তুলে নেওয়া যায়। তবে তারজন্য ঠিক সময়ে চাষ শুরু করা দরকার। শস্ত পর্যায় ঠিক করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট ফসলচক্রে বার বার অম্লসরণ করা না হয়। তাতে অনেক সময় রোগ-পোকার আক্রমণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে।

আমাদের বেশিরভাগ চাষী হলো ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক। চাষের

মরসুমে এইসব ছোট ছোট চাষীদের অনেকেরই মূলধনের অভাব থাকে। ফসলচক্রে পরিকল্পনা তৈরি করার সময় এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখাও দরকার। তাছাড়া আছে বীজ, সার প্রভৃতি কৃষি উপকরণের সরবরাহ। পরিকল্পনা করার সময় তাই এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করে এক বছরে কটা ফসল নেওয়া সম্ভব তা ঠিক করতে হবে। এইসব বিষয়ে কৃষকরা স্থানীয় কৃষি কর্মচারী ও কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন। সারা বছরের জ্ঞান শস্য চাষের একটি পরিকল্পনা করে নিতে পারলে কাজের দিক থেকে খুবই সুবিধা হবে। আগামী বছরের জ্ঞান যে খাটোৎপাদন কর্মসূচী নেওয়া হবে তা রূপায়িত করার জ্ঞান এখন থেকেই এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

উন্নত পথায় আউশ ধানের চাষ

আউশ ধানের উন্নত জাত এবং কোন অঞ্চলের জমি কোন জাতের ধান চাষের উপযুক্ত হবে সে সম্বন্ধে গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। এবার চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

জমি নির্বাচন

প্রথমেই ভাল ফলনের জন্য জমির অবস্থান বিশেষ করে দেখা দরকার। জমির অবস্থান ও মাটি অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। আউশ মরশুমে উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের যে কোন দো-আঁশ জমি চাষের পক্ষে উপযুক্ত। যদিও অধিকাংশ জায়গায় বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আউশ ধানের চাষ হয়ে থাকে, তবু জমিতে সেচ ও জল নিকালের ব্যবস্থা থাকলে শস্তের ফলন ভাল হয়।

বীজের হার

যারা ধান ছিটিয়ে বুনবেন তাঁদের জন্য বীজ লাগবে একরে ৩০—৩৫ কেজি। বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে বুনলে একরে ২৫—৩০ কেজি, আর এক একর জমি রোয়ার জন্য লাগবে ২০ কেজি বীজের চারা।

বীজ শোধন

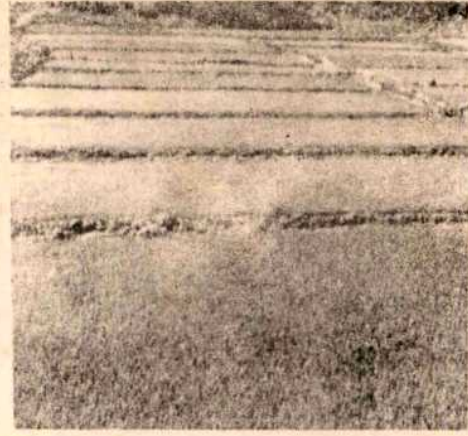
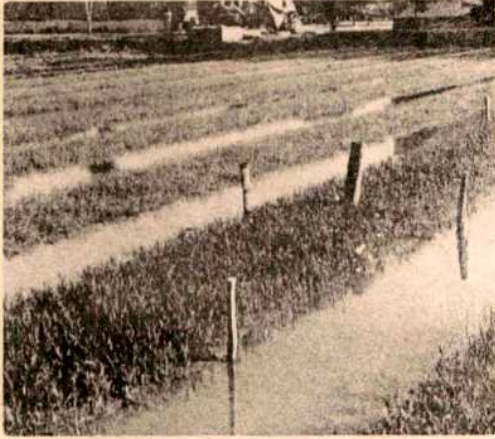
বীজ সব সময়েই শোধন করে বোনা দরকার। তাতে রোগপোকার আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। সরাসরি বোনার আগে বা বীজতলায় বীজ ফেলার আগে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৩ গ্রাম শুকনো গুড়ো ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা কিনাইল মারকিউরিক এ্যাসিটেট মিশিয়ে ভালভাবে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

বীজ বোনার উপযুক্ত সময়

তরাই অঞ্চলে ফাল্গুন মাসে, পলিমাটি অঞ্চলে বৈশাখ মাসে এবং খরা প্রবণ কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝি সরাসরি বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। বীজতলায় বোনার সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস।

চারা তৈরি

এক একর জমি রোয়ার উপযোগী চারা তৈরি করতে দশ শতক বা ৬ কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরী করুন। অতিরিক্ত নোনা মাটিতে বীজতলা করা উচিত নয়। বীজতলায় নিড়ানো, তাল্লাড়া ওষু ছোটানো, সেচ এবং সার



দেওয়া প্রভৃতি কাজের সুবিধার জন্ত সমস্ত বীজতলাটিকে ১'২০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া খণ্ডে ভাগ করে নিতে হবে। প্রতি খণ্ডের চারপাশে ৩০ সে.মি. (১ ফুট) চওড়া ও ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) গভীর নালা করে দিন। ভাল চারা পেতে হলে, বীজতলায় অবশ্যই সার দিতে হবে। প্রতি দশ শতক বীজতলায় প্রাথমিক মাত্রায় সার লাগবে গোবর বা কম্পোস্ট ১ টন, নাইট্রোজেন ২ কেজি, ফসফেট ২ কেজি ও পটাশ ২ কেজি।

বীজতলায় পরিচর্যা ও সেচ

শুকনো বীজতলায় বীজ বুনলে—বীজ ফেলার পর, হালকা-ভাবে পাটা চালিয়ে বা মই দিয়ে বীজগুলি ঢেকে দিন। বৃষ্টি না হলে, মাঝে মাঝে বীজতলায় হালকা সেচ দেবেন।

জমি তৈরি

বোনা আউশের জন্ত ৩-৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে মাটি বুরবুরে করুন এবং আগাছা ভাল

করে বেছে ফেলুন। রোয়া আউশ চাষের জন্ত ১২—১৫ সে.মি. (৫—৬ ইঞ্চি) গভীর করে মোলায়েম কাঁদা করুন। এ জন্ত খুলায় ২ বার ও কাঁদায় ৩-৪ বার চাষ ও মই দিন। চাষ দেবার পর মই দিয়ে জমি সমান করে দিন।

সার প্রয়োগ

জমিতে সবুজ সার করলে মাটির উর্বরতা বাড়বে। সবুজ সার করা সম্ভব না হলে জমি তৈরির সময় একর প্রতি ৮—১০ গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট দিন। জৈব সার ছাড়াও, এ সময় প্রাথমিক মাত্রায় রাসায়নিক সারের পরিমাণ ঠিক করে নেওয়াই সব থেকে ভাল। কারণ, এতে সারের অপচয় কম হয়। আবার কম সার প্রয়োগে ফসলের ক্ষতিও এড়ানো যায়।

জমির মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হলে পর পৃষ্ঠার তালিকা অনুযায়ী সার দিন।

ধানের জাত	সারের পরিমাণ (একর প্রতি কেজিতে)			
	শেষ চাষের আগে			চাপান সার
	নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ			নাইট্রোজেন
(১) অধিক ফলনশীল বোনা	০	১০	১০	১৫ দিন পরে ৭ ৩০ " " "
রোয়া	৬	১২	১২	৪০—৪৫ " " ৬ ১২—১৫ " " ১২ ২৫—৩০ " " ৬
দেশী উন্নত	০	১০	১০	১৫—১৬ " " ৫ ৩০ " " ৫

বীজ বোনা ও চারা রোয়া

বোনা আউশের বেলায় বীজ বোনা যন্ত্রের সাহায্যে অথবা লাঙলের পিছনে ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) দূরে দূরে সারিতে বুনুন। এ ভাবে বুনলে বীজের পরিমাণ কম লাগে। নিড়েন দিতেও সুবিধা হবে।

রোয়া আউশের বেলায় ২০ সে.মি. X ১০ সে.মি (৮ X ৪ ইঞ্চি) দূরত্বে সারিতে চারা রুইবেন। আষাঢ়ের মধ্যে আউশের চারা রোয়ার কাজ শেষ করুন।

সেচ

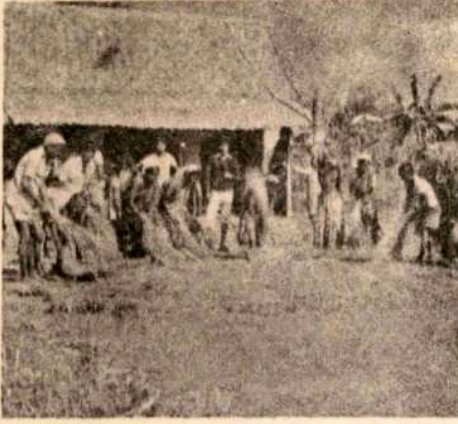
বোনা আউশ সাধারণত বৃষ্টির উপর নির্ভর করেই চাষ করা হয়। সময়ে বৃষ্টি না হলে অবশ্যই সেচের দরকার হয়। সুবিধা থাকলে,

প্রয়োজনবোধে ৭—১০ দিন অন্তর সেচ দেবেন। আউশ চারা রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল থাকলেই ভাল। চারা রোয়ার পর থেকে ধান কাটার ১০—১৫ দিন আগে পর্যন্ত জমিতে ২ই সে.মি. (১ ইঞ্চি) পরিমাণ জল রাখুন।

নিড়ান ও আগাছা দমন

বোনা আউশের জমিতে বীজ বোনার ১৫ দিন ও ৩০ দিন পরে হ'বার ভাল করে নিড়ান দিয়ে আগাছা তুলে দিন। রোয়া আউশের জমিতে চারা রোয়ার ১০ দিন ও ২০ দিন পরে হ'বার নিড়ান যত্ন দিয়ে বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে ফেলুন ও মাটি ঘেঁটে দিন।

রোগ-পোকার আক্রমণের জগ্ৰ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।



আদিবাসী সমাজে যৌথ কৃষি খামারে নতুন পদক্ষেপ

রাধিকা রঞ্জন দেবভূতি

শুধুমাত্র আদিবাসী পরিবারের বসতি নিয়ে গড়ে উঠেছে সিঙ্গিডিটা গ্রাম। আরও বিস্তৃত পরিচয় হ'ল এই গ্রামটি দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ী থানায় অবস্থিত। এখানে যে ৩০টি পরিবারের বসতি আছে তার মধ্যে ২২টি পরিবার হ'ল ভূমিহীন। চা বাগানে অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে মাঝে মাঝে কাজ করা আর জঙ্গলের কাঠ সংগ্রহ এই ছিল তাদের জীবিকা। হাঁড়িয়া ও পচানি (মদ) খেয়ে বিভোর থাকা ছিল এদের সাংস্কৃতিক জীবন।

এই এলাকার চা বাগান সংলগ্ন ২২ একর খাস জমি বাগানের মালিকরা বিভিন্ন কায়দায় দখল করে রেখেছিল। এই জমির অবস্থান ও মাটির প্রকার অনুযায়ী ভাল চাষযোগ্য জমি হওয়া সত্ত্বেও তা পতিত অবস্থায় আগাছাপূর্ণ হয়ে পড়েছিল।

১৯৭৮ সাল নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের শিলিগুড়ি নকশালবাড়ী প্রকল্প এই জমি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করে। তারপর স্থানীয় পঞ্চায়েত ও পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের ভূমি সংস্কার দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় এই জমি উদ্ধার করে গ্রামের ২২টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে (বন্টন) রেকর্ডসহ দখল দেওয়া হয়। তারপরেই শুরু হয় চাষের তোড়জোড়।

এই জমিতে চাষের বিভিন্ন উপকরণ ও কৃষিঋণ ব্যাঙ্ক থেকে সংগ্রহের জন্য ১৯৮৩ সালে সিঙ্গিডিটা আদিবাসী যৌথ কৃষিউন্নয়ন খামার সমবায় সমিতি গঠিত হয় (রেজিঃ নং দার্জিলিং-৪৬ তাং ২৪. ৫. ৮৩)। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২২ জন।

সি, এ, ডি, সি'র প্রযুক্তিগত সাহায্য আর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কৃষিঋণের সহায়তায় এখানে উন্নত মানের চাষ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এ জমিতে শুধু একটি ফসলই নয় আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগে বছরে তিন মরসুমে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলন দেখে আদিবাসী পরিবারগুলির চাষে আগ্রহ বেড়ে গেছে। গত প্রাক-খরিফে ভাল ফসল উৎপাদনের ফলে ৭,২০৬ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ

পরিশোধ করা সম্ভব হয়েছে। এবছরে আমন ফসল ভাল হয়েছে। বর্তমানে খামারে যত্ন সহকারে রবি ফসলের চাষ চলছে।

চাষের কাজে সহায়তার জন্য সমিতি ৮ জোড়া হালের বলদ ক্রয় করছে। সমিতির স্থায়ী সম্পদ। এই বলদ ব্রহ্মপুত্রের জল একটি শেডও তৈরী হয়েছে। সমিতির সদস্যরাই এই বলদ দেখাশুনা করে। জৈব সারের চাহিদা পূরণের জন্য একটি কম্পোষ্ট-পিট করা হয়েছে। চাষের ভাল ফলনের জন্য জলের প্রয়োজন সকলের আগে। এদিকেও সমিতির নজর রয়েছে। সেচের জল সরবরাহের জন্য ঝরণার জল খাল কেটে খামারে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। শুষ্ক শস্যই নয় সবজি চাষের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং ফল চাষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

চাষবাস ছাড়া এখানে ২ একর মত জমি রয়েছে সেখানে শস্য উৎপাদন ভাল হবে না। শস্য উৎপাদনের অনুপযোগী ঐ এলাকায় হাজা মজা পুকুর সংস্কার, মৎস্য চাষ ও পুনর্বাস প্রকল্পের অধীনে গত ২৮শে ডিসেম্বর '৮৪ কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দার্জিলিং জেলার মৎস্য বিভাগ মোট এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। এখানে এক নিবিড় মাছচাষ প্রদর্শনী পুকুর তৈরী হবে। এই পরিকল্পনার ফলে ঐ এলাকায় মাছ চাষে ব্যাপক আগ্রহ যেমন বাড়বে তেমনি আগামী ২ বৎসরের মধ্যে ঐ এলাকার আদিবাসী

পরিবারের মধ্যে জ্ঞানমূল্যে মাছের চাহিদা মেটানো যাবে। এই পরিকল্পনায় যৌথ খামারের সদস্যদের আয়ও বাড়বে।

এই সব পরিকল্পনার ফলে ইতিমধ্যে এখানকার আদিবাসী সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে তা হ'ল : আগে আদিবাসী পরিবারগুলির বছরে ১০০—১২০ দিনের বেশী কাজ জুটত না। ফলে বছরের অধিকাংশ সময় অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটত। যৌথ খামারে চাষ শুরু হওয়ার পর তারা যেমন জমিতে কাজ পাচ্ছে তেমনি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বছরের অধিকাংশ সময়ের খাবার জোগাড় হচ্ছে ও বছরে ২০০ থেকে ২৫০ দিন কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।

চাষের অবসরে তারা স্বচ্ছায় শ্রম দানের মাধ্যমে জমির আল সংস্কার, সেচ নালা সংস্কার, বৃক্ষরোপন ও গ্রামের ৫১৭ মিটার রাস্তা তৈরী করেছে।

কৃষি ছাড়াও এখানকার আদিবাসী পরিবারগুলির নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, মা ও শিশুদের পুষ্টির জন্য প্রকল্প, অভাবের সময় যাতে চড়া মূল্যে ধান ক্রয় না করতে হয় তাই ধর্মগোলা স্থাপিত হয়েছে। উৎপাদিত শস্য মজুতের জন্য ৫০ মেট্রিক টনের একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক শস্য গোলা তৈরী হয়েছে।

বর্তমানে এখানকার আদিবাসী পরিবারের মধ্যে যে ভাবে যৌথ চাষে আগ্রহ বেড়েছে; তাতে আশা করা যায় এই নজির গোটা দেশে আদিবাসী সমাজে এক নতুন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

ঝাড় গায়ে অর্থকরী ফসল কাড় চাষের প্রসার

ডঃ বিমান মাইতি

একদা ভারতবর্ষ একাই প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজুবাদাম বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আয় করেছে। বর্তমানে এই রপ্তানির হার কমে ৫৫ শতাংশে এসেছে। ঝাড়গ্রামের কাজুচাষীরাও বিদেশে কাজুবাদাম রপ্তানি করতে প্রচুর কাজুর যোগান দিত। এখন ভারতের সব কাজু চাষ এলাকায় চাষ কমেছে আর ফলনও কমেছে। ঝাড়গ্রামও সেই তালে তাল ফেলে চলেছে।

লাটেরাইট, লাল বালু ও কাঁকুরে, পাহাড়ী ঢালু জমিতে যেখানে অল্প কিছুই চাষ প্রায় হয় না সেখানে কাজু চাষ কিন্তু ভাল হয়। ৬০—৭০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতেও কাজু ভাল জন্মায়। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে কাজু চাষের উপযুক্ত পরিবেশ আছে। এর চাষে খরচও কম। একরে জমি প্রস্তুতি, বীজ, সার, রোগপোকার ওষুধ ইত্যাদির খরচ ধরে প্রায় ১৩৫০ টাকার মত খরচ হয়।

কাজু মেহেতু অর্থকরী ফসল তাই এর চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্তু ঋণ দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয়

সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রনাধীন ঝাড়গ্রাম সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে কাজু চাষের উন্নতির জন্তু পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থাও করা হয়। গত ৭ বছরে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ৩২ জন কাজুচাষী ঐ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছে। যেসব চাষীরা ঋণ নিয়ে কাজু চাষ করেছেন তাদের সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হ'ল।

গৌলবাধীর সুখীর মাহাতো কাজু চাষের জন্তু ৬০০০ টাকা কৃষি ঋণ নেন। তাঁর মোট দশ একর জমির মধ্যে ৪ একর জমিতেই শুধু কাজুর চাষ। তাঁর কাজুর বাগান দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাঁর চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি জানানলেন যে গাছ লাগানোর সময় প্রতি গর্তে তিনি এক ঝুড়ি গোবর ও ১৫০ গ্রাম নাইট্রোজেন সার দিয়ে চারা লাগান। গাছের বাড় খুবই ভাল হয় এবং দ্বিতীয় বছরেই প্রতি গাছে কিছু কিছু কাজুবাদাম পাওয়া গিয়েছিল। তবে অর্ধেক গাছের ফুল ভাঙ্গা হয়েছিল যাতে পরের বছর ফলন ভাল পাওয়া যায়। সাধারণতঃ

কাজুগাছে পাঁচ বছর পর ফলন আসে। সেজন্য ন'বছরের মেয়াদে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় এবং এর মধ্যেই তা শোধ দিতে হয়। তবে এর মধ্যে পাঁচ বছর যখন কোন ফলন হয় না তখন কেবল মূলধনের সুদ ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়। সুধীরবাবু তাঁর বাগানের যথেষ্ট যত্ন নেন এবং বাগানটি বেড়া দিয়ে মজবুত করে রেখেছেন। যেহেতু পাঁচ বছরের আগে সাধারণতঃ ফলন হয় না সেজন্য বাগানের মধ্যে কিছু কিছু সবজির চাষ সুধীরবাবু করেছেন। যেমন কুমড়া, শশা, উচ্ছে ইত্যাদি। সবজি থেকেও তাঁর লাভ ভালই হয় তাই সুদের টাকাও তিনি নিয়মিত শোধ দিয়ে থাকেন। তিনি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছেন ৮০ সালে। বাগানে ফল দেওয়া এখনও শুরু হয়নি।

শালবনীর গীতাঞ্জলি চৌধুরী ৮৪ সালে ৩৫৭৫ টাকা কাজু চাষের জমি ঋণ নেন। কিছু পুরানো বাগান কিনে তার উন্নতি করেছেন ও সেই সঙ্গে কিছু নতুন চারাও বসিয়েছেন। বাগানের তিনি নিয়মিত যত্ন নেন এবং প্রয়োজনমত সারও দিয়ে থাকেন। পুরানো গাছ থেকে তিনি গাছ প্রতি ১০ কেজি কাজুবাদাম পেয়ে থাকেন। আশা করছেন বাগান ভালভাবে বেড়ে উঠলে আরও ফলন পাবেন। এবার আসি অরুণ সেনের কথায়। তিনি বাস্তার বাসিন্দা। লোখাগুলিতে তাঁর কাজুবাগান। অরুণবাবুর বাগানে ৩০ বছরের গাছও আছে এবং তা থেকে তিনি ফলনও পাচ্ছেন। তাঁর মতে ভাল ফলনের জমি বাগানের যত্ন একান্ত দরকার।

তিনি তাঁর বাগানে যেমন প্রয়োজনমত সার দিয়ে থাকেন, আবার পোকা মাকড়ের দমনের জমি উপযুক্ত ওষুধ ব্যবহার করেন। ফসল বিক্রির কোন সমস্যা নেই। তাঁর আয় এই বাগান থেকে ভালই হয়। তাই তাঁর কাজুবাদাম চাষে উৎসাহ উদ্দীপনাও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়।

বাছুরডোবার রামনিবাস গুপ্ত। তাঁর পাঁচ একরে কাজুবাদামের বাগান আছে। বাগানের উন্নতির জমি ব্যাঙ্ক থেকে তিনি ৮২ সালে ৮০০০ টাকা ঋণও নিয়েছেন। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ। তাই সব সময়ে বাগান দেখতে পারেন না। ভাল ফলন পেতে হলে তিনি জানানেন যে বাগানের যত্ন পরিচর্যা নিয়মিত করা দরকার। নাহলে এই চাষ লাভজনক করা মুশকিল। তিনি আশা করছেন বছর দুয়ের মধ্যেই ফলন পাবেন।

কাজু অর্থকরী হলেও চারা লাগানোর পর সাধারণতঃ পাঁচ বছরের আগে ফলন পাওয়া যায় না। সেজন্য এই সময় ঐ ক্ষেত্রে সাথী ফসলের চাষ করা একান্ত দরকার। কিন্তু যেহেতু কাজুবাদামের চাষ প্রধানতঃ কাঁকুরে মাটিতে হয়ে থাকে সেখানে উপযুক্ত শস্ত বা সবজি নির্বাচন করে চাষ করা দরকার। তাছাড়া যেকোন ফসলই ভাল ফলনের জমি জল চায়। তার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখাও প্রয়োজন। এইসব অসুবিধাগুলি দূর করতে পারলে কাজু চাষ আরও বাড়ানো সম্ভব হবে। ঝাড়গ্রামের বদ্ধ কাজু প্রসেসিং মেশিনও চালু করা যাবে।

শেওড়াফুলিতে কৃষক দিবস : প্রস্তোত্তর

জাগরণ সোম

গত ৩।২।৮৫ তারিখে শেওড়াফুলি নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রাঙ্গনে কৃষক দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে হুগলী জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শতাধিক কৃষকের সমাগম হয়। প্রদর্শনী ক্ষেত্র পরিদর্শন, আলোচনাচক্র, কৃষকদের প্রস্তোত্তরের মাধ্যমে দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

প্রস্তোত্তরে অংশ গ্রহণ করেন কৃষি সচিব ডঃ বিশ্বনাথ শ্রোময়, কৃষি অধিকর্তা বিষ্ণু মণ্ডল, অপর কৃষি অধিকর্তা ডঃ জ্যোতি রঞ্জন লাহিড়ী এবং ডঃ ধ্রুব মুখার্জী, কৃষি বিপণন শাখার অধিকর্তা বিমলেন্দু গাঙ্গুলী, পঃ বঃ বীজ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত, মুখ্য প্রচার ও জনসংযোগ আধিকারিক অমলেন্দু সরকার, যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (খান্ড়া) ডঃ বাদল মণ্ডল প্রভৃতি, আলোচিত প্রস্তোত্তরের কয়েকটি-এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ দাস, বিমলগ্রাম পঞ্চায়েত

১। বেগুণে তুলসী লাগার প্রতিকার কি?

কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক, (কৃষিতথ্য)।

কৃষি অধিকার, পঃ বঃ।



উত্তর

১। (ক) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করুন।

- ১। (খ) যেখানে প্রতি বৎসর রোগ দেখা যায়, সেখানে ফুল আসার আগে, রোগ ছড়ানো পোকাকে দমন করার জন্য প্রতিলিটার জলে ১ মিলি হিসাবে ম্যালাথিয়ন ৫০% বা ডাইমিথয়েট ৩০% বা মিথাইল ডেমিটন ২৫% একবার স্প্রে করুন।
- ২। বেগুনের ঢলে পড়া রোগের প্রতিকার কি ? ২। (ক) রোগাক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে দিন। (খ) আক্রান্ত জমিতে ২/৩ বৎসর বেগুন, আলু, লঙ্কা, তামাক, বিলাতী বেগুন ইত্যাদির চাষ করবেন না।

মহাদেশ কর্মকার, বিলকুলি

- ৩। আমের গায়ে ছিট ছিট কালো কালো দাগ দেখা যায়। আম পাকার আগেই পচে নষ্ট হয়ে যায়—প্রতিকার কি ? ৩। যে সব এলাকায় এই রোগ প্রায় প্রতিবছর দেখা যায় যেখানে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। আম যখন কড়াইশুরটির মত মাপের থাকে তখন থেকে ১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার প্রতিলিটার জলে ৪ গ্রাম ব্লাইটক্স বা ফাইটোলান বা ব্লু কপার অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা ক্যাপটাক্ প্রয়োগে ফল পাওয়া যেতে পারে।

মনসারাম ঘোষ, বামুনআড়ী, রিষড়া

- ৪। একই জমিতে তিন জাতের কলার চাষ করি যথা চাঁপা, কাঁঠালী ও কাঁচাকলা। কিন্তু বর্ষার সময় কাঁঠালী কলার গাছের পাতা হলুদ রঙের হয়ে যায়, পরে মারা যায়। এর প্রতিকার কি ? ৪। বর্ষার আগে রোগ সামান্য দেখা দিলেই প্রতিলিটার জলে ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি ১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। রোগ বেশী হলে একই হারে ব্যাভিষ্টিন স্প্রে করতে হবে। ওষুধ মেশানো প্রতি ছ লিটার জলে ১ মিলি স্ট্রাণ্ডোভিট্ মেশালে ভাল হয়।

জহরলাল বাগ, আনন্দনগর

- ৫। ধানের জমিতে গাঁজ মারার উপায় কি ? ৫। গাঁজ লাগা ধানের জমিতে একরে ৫—৬ কেজি তুঁতে বা ৩ কেজি অল্প তামাঘটিত ওষুধ গুঁড়ো মাটিতে মিশিয়ে দিন।

বহুধরা : চৈত্র : ১৩২১

আশুতোষ মাঝি, সাং—জগন্নাথপুর

৬। পাট, ধান ও মটরের চাষ করি। মটরগাছ প্রায় অর্ধেক মরে গেছে, গাছ প্রথমে হলদে হয় পরে মরে যায়।

৬। জাম্বারীর মাঝামাঝি মটর ক্ষেতে মাঝে মাঝে হলদেটে গাছ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছগুলি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়।

এই রোগের প্রকোপ বেশী হলে ঐ ক্ষেতে ২/৩ বছর মটর না লাগানো উচিত। রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে এমন জাত যেমন বোন্ডিল, আরলিপারকেকশান ইত্যাদি চাষ করুন।

শেখ এরসাদ আলি, সাং—মোজাবেড়

৭। সরষেতে মীড়ে পোকা ধরে ফুল ও ফল নষ্ট করে দিচ্ছে। কি করলে উপকার হবে?

৭। প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ডিমেক্রন ৮৫% বা ১ মিলি মেটাসিসটক্স ২৫% বা রোগের ৩০% বা ডাইমিথয়েট ৩০% বা ডারা ৯০৯ পনের কুড়ি দিন অন্তর স্প্রে করুন। কিন্তু ফসল কাটার ১ মাস আগে স্প্রে করা বন্ধ করতে হবে।

এছাড়া আগামী বছর থেকে কার্তিকের প্রথমে সরষে লাগাবেন—তাহলে এই পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

গোপালচন্দ্র মণ্ডল, শুভীপুর, সিঙ্গুর

৮। একই আলু বীজ বিভিন্ন জমিতে চাষ করে দেখা যাচ্ছে কোন জমিতে ১০%, কোনটাতে ৭৫% আলুগাছ মরে গেছে। আবার কোন জমিতে একটিও গাছ নষ্ট হয়নি। এর কারণ ও প্রতিকার কি?

৮। একধরনের ব্যাকটেরিয়া আলুর এই রোগ (চলে পড়া) ঘটায়। সাধারণতঃ আলু বীজের মাধ্যমেই ঐ জীবগু জমিতে আসে। জমিতে একবার প্রবেশ করতে পারলে সুযোগমত ফসলের ক্ষতি করে। তবে এক্ষেত্রে মনে হয় আলুবীজ নীরোগ ছিল। আক্রান্ত জমিতে জীবগুর প্রবেশ আগেই ঘটেছিল। এ রোগ বেশী দেখা গেলে রোগাক্রান্ত জমিতে অন্ততঃ ৩ বছর আলুর চাষ করা ঠিক নয়।

আটি বিঘা জমি ও দশজনের সংসার

অর্চন কুমার চ্যাটার্জী

হাওড়া থেকে আমতা, দূরত্ব মাত্র ৪০ কিলোমিটার। না, আপনাকে আমতা পর্যন্ত যেতে হবে না। তার আগেই পড়বে দেবাকী গভীর নলকূপ। দেবাকী গভীর নলকূপের পাশ দিয়ে আলপথ ধরে মাইল খানেক গেলেই পাবেন সরপোতা গ্রাম। এই সরপোতা গ্রামের এক প্রবীণ ও নবীন কৃষককে নিয়ে এই রচনার সূত্রপাত।

প্রবীণ কৃষকের নাম বিজয় চন্দ্র কোলে। জমি আছে মাত্র ৬ বিঘা। আর বোরো চাষ করার সময় আরও ২ বিঘা জমি ভাগে নেন। ঘরে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি নাতনি নিয়ে খাবার মুখ ১০টি।

বিজয় চন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়—৬ বিঘে নিজের আর গরমের চাষের (বোরো চাষের) সময় আরও ২ বিঘা, এই থেকে কি ১০ জনের মুখের অন্ন, পরনের কাপড়, নাতি নাতনির পড়ার খরচ যোগান সম্ভব? কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছিলাম না। দেনা বেড়ে যাচ্ছিল। গ্রামে সবাই যেভাবে চাষ আবাদ করে আমিও সেইভাবে চাষ আবাদ করতাম। কিন্তু ক্রমে বৃষ্টিতে পারছিলাম যে এভাবে হবে না। কিছু জেলা প্রশিক্ষণ আধিকারিক, হাওড়া।



বহুধারা : চৈত্র : ১৩৯১

করা দরকার। এই সময় আমাদের এলাকার কে, পি, এস, বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। তাকে আমার কথা বলি। তিনি সব কথা শুনে এই হেমতি (আমন) চাষের আগের হেমতি চাষে (১৯৮৩-৮৪) আমাদের নতুন জাতের ধান চাষ করার কথা বলেন। মিনিকিটে হুশেশ নামে এক জাতের ধান সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছিল। তার একটি প্যাকেট আমি পাই। কে, পি, এস, বাবু কিভাবে চাষ করতে হবে তা বলে দেন। প্রথম ভেবেছিলাম সরকারী ধান, এ দিয়ে চাষ করলে ধান পাব তো? আমার ছেলে নাতির মানা করলো। কিন্তু মন আমার বলতে লাগল এই ধানেই ঘরে লক্ষী আসবে। আর ধান তো অন্ন, ভাবলাম দেখাই যাক না। এই ভেবে কারুর কথা না শুনে আমি ঐ বীজ বীজতলায় ফেলি। না স্তার, মিছা কথা বলব না। আমি দেবুবাবুর সব কথা শুনি। বীজতলায় যেভাবে পরিচর্যা করতে বলেছিলেন সেভাবে পরিচর্যা করতে পারিনি। এ বছর খরার দরুন ধান রোয়া করতে দেরীও হয়েছিল। জ্বাণ মাসের শেষে কোন রকমে ধান রোয়া করেছিলাম। রোয়ার পরও ধানের যেমন পরিচর্যার কথা কে, পি, এস, বাবু বলেছিলেন তা পুরো পালন করতে পারিনি। ভবুও মাঠে যে আমার ধান দেখত, সেই অবাক হয়ে যেত। তখন আর ছেলে বা নাতির মুখে কথা নেই। ধানের চড়ার কি গাঁথনি! ধান দেখে তখন মনে হল কে, পি, এস, বাবুর পুরো পরামর্শ অহুসরণ করলে মিনিকিটের ঐ ২ কেজি ধান থেকে আমি ২ মন ধান পেতাম। কিন্তু পেলাম মাত্র মন খানেক।

ধান কম পেলে কি হবে তখন দেবুবাবু

আমার কাছে ভগবান হয়ে গেছেন। তার উপদেশ মত ৪ বিঘা গরমের ধান বোরো চাষ করি। এবার আমতা ফার্ম থেকে আই-আর-৫০ ধান বোগাড় করি। এবং দেবুবাবুর উপদেশ বীজতলায় বীজ বুনি। হুব্বার বীজতলা শোধন করি। একবার বীজ বোনার ১০ দিন পর ৫০০ গ্রাম থাইমেট দানা বিধ দিই ও পরে আর একবার চারা তোলার ১০ দিন আগে ডিমেক্সন স্প্রে করে দিই। স্প্রে-মেশিন গ্রাম থেকে ভাড়া নিয়েছিলাম। এবার যত্ন করে ৪০ দিনের চারা ২ হাতে ৯টি করে গুছি দিয়ে এক বিঘা অন্তর লাইন করে রোয়া করি। জমিতে প্রয়োজনমত প্রোমোর ২৮/২৮/০, বিঘা প্রতি ১০ কেজি, ফসফেট (সুপার ফসফেট) ২০ কেজি ও পটাশ (মিউরেট অফ পটাশ) ১০ কেজি দিয়ে মাঘের ১০/১২ তারিখে রোয়া করি। শিব চতুর্দশী পর্যন্ত আমার জমিতে কোন পোকা দেখতে পাইনি। শিবচতুর্দশীর পর একবার ডিমেক্সন স্প্রে করি। জমিতে মাকরা পোকা দেখা দিয়েছিল। ২-১টি পোকা বসতে দেখেছি, কিন্তু স্প্রে করব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। কে, পি, এস, বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করি। তাঁর কথা মত বিষ ওষুধ দিই। হুব্বার ইউরিয়া চাপান দিয়েছি। একবার স্প্রে করার আগে আর একবার যখন কাঠি গোল হচ্ছিল তখন। প্রথমবার ১৫ কেজি ও পরের ব্যার এক বিঘা জমিতে ৭ কেজি ইউরিয়া দিয়েছিলাম। বৈশাখ মাসের প্রথমে আমি ধান কেটে ঘরে তুলে ফেলি। এত ধান হয়েছিল যে আঁটিই ধরা যাচ্ছিল না। ঝেড়ে মেড়ে দেখি যে ৪ বিঘা জমি থেকে প্রায় ৯০ মনের মত ধান পেয়েছি। আর চিন্তা কি? সমবৎসরের

খোরাকী হয়ে গেল।

এরপর দেবুবাবু বলেন, বিজয় দাছ এবার আমন চাষে সুরেশ চাষ করবেন নাকি? আমি দেবুবাবুকে বললাম দেখে যাবেন এবার যদি প্রকৃতি না মারে তো সুরেশ ধানের চাষ কিভাবে করতে হবে এবার আমি তা এই বুড়ো বরষা দেখিয়ে দেব। কি বলব বাবু মানুষ ভাবে এক, আর ভগবান করেন এক। আমি তো গরমের ধান নিলাম। আমার গ্রামের যারা জয়া ধানের চাষ করেছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের অতি রুষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গেল। মাঠের ধান মাঠেই পড়ে রইল। ঘরে আর ধান তুলতে হলো না। রুষ্টি কম হবার পর আমার ঘরের পাশে উচু জমিতে ১ বিঘা সুরেশ রোয়া করার জন্য ২৫ কেজি বীজ ফেলি। দেবুবাবু বীজ শোধন করতে বলেছিলেন। কিন্তু বীজ শোধন করার বিষয় না পাওয়াতে এমনিই বীজ ফেলে দিই। মাঠ থেকে জল না সরার দরুন এবারও ধান রোয়া করতে দেবী হয়ে যায়। জীবনের ২৮-২৯ তারিখ নাগাদ ঐ বেশী জলেই ধান রোয়া করি। ইউরিয়া চাপান হিসাবে মাত্র একবার দিয়েছিলাম—ঐ কাঠি গোল হবার সময়। তাইতেই এক বিঘা জমি থেকে ১৩ মনের মত ধান পেয়েছি।

যখন বিজয়বাবুর কথা শুনছিলাম পাশে চুপ করে বসেছিলেন নবীন কৃষক শ্রী উদয় চোংদার। বিজয়বাবুর কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন দাছর মত আমাকেও আপনাদের ভাষায় জানাচ্ছিল।

প্রগতিশীল কৃষক বলতে পারেন। জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই বলে উঠলেন আমিও মিনিকিটের ২ কেজি আই,ই,টি-৩৯৩ ধান পেয়েছিলাম, এ বছর আমন মরসুমে। অতি রুষ্টিতে মাঠ ডুবে থাকায় ধান রোয়া করতে দেবী হয়ে যায়। জীবনের শেষে ধান রোয়া করেন। যে যে পদ্ধতিতে দেবুদা বলে দিয়েছিলেন ঠিক সেই সেই পদ্ধতি অনুসরণ করি। যেমন, ছবার ইউরিয়া চাপান দিই। প্রথম বার ধান নিড়ান দেওয়ার সময় ও দ্বিতীয়বার কাঠি গোল হওয়ার সময়। বেশী জলের দরুন দাছ যেমন প্রথম চাপান দিতে পারেননি আমি কিন্তু প্রথম চাপান দিয়েছিলাম।

শ্রীচোংদারএর কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম বেশী জলে কিভাবে চাপান দিলেন?

শ্রীচোংদার বললেন যে দেবুদা বলেছিলেন ইঁহর মাটির সাথে ইউরিয়া জারিয়ে নিয়ে মাটির গুলি করে মাঠে ছড়াতে। আমি সেইভাবেই প্রথম চাপান দিয়েছিলাম। ফল ভালই পেয়েছি। ৪ কাঠা জমি রোয়া করেছিলাম। ধান পেয়েছি ২ মনের মত। এখন ঠিক করে ফেলেছি মাঠে জল বেশী থাকলে ইঁহর মাটির সাথে ইউরিয়া জারিয়ে নিয়েই ব্যবহার করব।

গ্রাম থেকে ফেরার পথে গ্রামের সবুজ ছবি যেমন চোখের সামনে ভাসছিল সেই সঙ্গে প্রবীণ নবীন কৃষকদের উজ্জল আবেগভরা মুখগুলি আগামী দিনের উজ্জল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত জানাচ্ছিল।

পাটের পোকা মাকড় ও তার দমন

পাটের পরিচর্যার জন্ত সময়মত নিড়েন যেমন দিতে হবে, আবার পোকামাকড়ের আক্রমণ হলে কিনা সে বিষয়েও সজাগ থাকতে হবে। পাটের প্রধান পোকামাকড় ও তাদের দমন সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করা হচ্ছে। পাট গাছে সাধারণতঃ কেড়ি, ঘোড়া বা তিড়িং ও বিছা পোকা এবং মাকড়ের উপদ্রবই বেশী দেখা যায়, তাই পাটের ক্ষেতে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার গিয়ে লক্ষ্য করুন এদের আক্রমণ দেখা যাচ্ছে কিনা। আক্রমণের প্রকোপ দেখেই পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

কেড়ি পোকা

পাটের চারা ৫—৭ সে. মি. (২—৩ ইঞ্চি) হলেই এর আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকার আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছের ডগাগুলি শুকিয়ে চলে পড়ে। ফলে আক্রান্ত গাছের শাখা বের হয়। এতে পাটের আঁশে গাঁট হয় ও পাটের দাম কমে যায়। এর কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে যায় এবং পাট কাটার সময় পর্যন্ত আক্রমণ হয়।

এর দমনের জন্ত শেষবার চারা পাতলা

করার সময় আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলুন। ফসল কাটার পর ক্ষেতে ডাঁটা বা বুনো পাট গাছ যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন।

ঘোড়া বা তিড়িং পোকা

এর কীড়া সবুজ রঙের, চলার সময় পিঠের কিছুটা অংশ উচু করে চলে। ডগার কচিপাতা থেকে শুরু করে ক্রমশঃ নীচের পাতা খায়। এরা পাটের প্রধান শত্রু।

বিছা পোকা

হলদে রঙের কীড়া, গায়ে শুঁয়া থাকে। উত্তরবঙ্গে এর আক্রমণ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বেশী হয়। ছোট অবস্থায় এরা একসঙ্গে থাকে, পাতার সবুজ অংশ খেয়ে সাদা করে দেয়। এই সময় আক্রান্ত পাতাগুলি তুলে নিয়ে কীড়াগুলি মেরে ফেললে আর কোন কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হয় না। অনেক সময় এরা সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছের সব পাতা খেয়ে ডাঁটাসার করে দেয়।

উপরোক্ত পোকাগুলির দমনের জন্ত পর-পৃষ্ঠায় দেওয়া যে কোন ওষুধ ব্যবহার করুন।

ওষুধের নাম	প্রতি লিটার জলে ওষুধের পরিমাণ
এণ্ডোসালফান ৩৫%	২ মিলি লিটার
কুইনালফস ২৫ ইন্সি	১৬ ”
মিথাইল প্যারাসিথিয়ন ৫০%	১ ”
ডাইক্লোরোভস ৭৬ ইন্সি	৬ ”
লিনডেন ২০%	২ ”
কার্ভারিল ৫০% জলে গোলা	২৬ গ্রাম

সাধারণতঃ একর প্রতি ৩০০ লিটার জল লাগে। গাছের বাড় অল্পায়ু জল কম বা বেশী লাগতে পারে। তখন ওষুধের পরিমাণও কম বা বেশী হবে। ওষুধ হাতে ঢালানো স্প্রেয়ারের সাহায্যে ভালভাবে স্প্রে করুন।

মাকড়

পাটের হলদে মাকড় খুব ছোট ছোট, খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। পাতার নীচের দিকে থাকে এবং রস চুষে খায়। ফলে পাতা কুঁকড়ে সাদাটে হয়ে যায়। খরা বা বৃষ্টিপাত কম হলে আক্রান্ত ফসলে ক্ষতি খুব বেশী হয়।

হলদে মাকড় মারার জন্ত ১ মি.লি, মনো-ক্রোটকস ৫০% বা ১৬ মি. লি, এণ্ডোসালফান ৩৫% এবং লাল মাকড় মারার জন্ত ২ মি.লি, ডাইক্লোরোভস ১৮.৫% প্রতি লিটার জলে এই হিসাবে আক্রান্ত গাছে ভালভাবে স্প্রে করুন যাতে পাতার নীচের দিকে ঠিকভাবে লাগে। ডগার পাতা থেকে শুরু করে ৮—১০ ইঞ্চি নীচে পর্যন্ত প্রতি পাতায় স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন হলে ১০ দিন পরে আর একবার স্প্রে করুন।

রোগ দমন

উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা করলে এবং

বেলে জমিতে জৈব সার দিলে রোগের প্রকোপ কম হয়। রোগের আক্রমণ কমাতে জমিতে পটাশ সার দিন। পাটের জমিতে ক্রমাগত আলু, বেগুন, টমেটো ইত্যাদির চাষ বন্ধ করুন।

ডাঁটা পচা

ডাঁটা পচা রোগ যাতে না ছড়িয়ে পড়ে সেজন্ত গাছের কাণ্ডে, পাতায় ও গোড়ায় প্রতি লিটার জলে ৫ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড বা ২৬ গ্রাম ম্যানকোজেব বা ১ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন গুলে ভালভাবে স্প্রে করুন। রোগের প্রকোপ অল্পায়ু ২০ থেকে ২৫ দিন অন্তর তিনবার ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার হতে পারে। রোদ ঝলমলে দিনে ওষুধ স্প্রে করবেন।

সময়ে পাট কাটুন

১২০—১৩৫ দিন বয়সের পাট কাটা সবচেয়ে ভাল, কারণ তাতে মিহি ও শক্ত আঁশ পাওয়া যাবে। তবে পাটের পরে ধান বা অন্য ফসলের চাষ করতে হলে ১০০ দিনেও কাটা চলে, তবে ফলন কিছুটা কম হয়।

পাট পচানো

কাটা পাট গাছ এমন ছোট ছোট আঁটিতে বাঁধুন যেন সেই আঁটির গোড়া হাতের মুঠোয় ধরা যায়। আঁটিগুলো মাঠেই ৩—৪ দিন ফেলে রাখুন যাতে এর পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়।

যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ভেজান। জাগ দেওয়ার আগে, পাটের আঁটিগুলির গোড়া ২—৪ দিন ৩০—৬০ সে, মি (১—২ ফুট) জলে ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ডগাগুলিকে একই দিকে রেখে আঁটিগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে ১০—১৫ সে, মি (৪—৬ ইঞ্চি)



পাটের ঘোড়া পোকা : (১) প্রজাপতি
(২) পুতুলি (৩) কীড়া



পাটের বিছা পোকা : (১) প্রজাপতি
(২) পুতুলি (৩) কীড়া

জলের তলায় ডুবিয়ে জাগ দিতে হবে। জাগের ওপরটা গাছের পাতা, কচুরিপানা, জলীয় গাছ ইত্যাদি দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিন। ইট, পাথর, তাল বা নারকেল বা পুরানো কাঠের গুঁড়ি দিয়ে জাগ চাপা দিন। কলা গাছ বা মাটির ঢেলা দিয়ে জাগ চাপা দেবেন না ওতে পাটের রং কালো হয়ে যায়। ফলে দাম কম পাওয়া যায়। মাটি দিয়ে জাগ দিতে হলে মোটা পলিখিন খেলের মধ্যে মাটি রেখে মুখ বেঁধে ব্যবহার করুন। জাগ যেন জলের তলায় মাটির সঙ্গে লেগে না থাকে।

আবণ-ভাদ্র মাসে জাগ দিলে পাট ৮—১০ দিনের মধ্যে আশ ছাড়ানোর জন্য তৈরি হয়ে যাবে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ঠাণ্ডা পড়ে গেলে পাট পচতে ২০—২৫ দিন সময় লাগে।

যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ধুয়ে ভাল করে শুকিয়ে নিন। শুকানোর সময়ে নোংরা না হয় সেদিকে নজর রাখবেন।

ভাল দাম পেতে গেলে ভালভাবে পাট পচানোর দিকে লক্ষ্য রাখুন এবং দেখবেন যাতে গোটা পাটের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় মিটার (৫ হাত) হয়।



[একটি প্রতিবেদন]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের উজ্জান শাখার ৫০বর্ষ পূর্তিতে বিগত ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী '৮৫ কোলকাতার বিড়লা টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের প্রেক্ষাগৃহে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি উজ্জান বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উদ্বোধন করেন রাজ্য কৃষি মন্ত্রী মাননীয় কমল গুহ। অমুঠানে কৃষি সচিব, কৃষি যুগ্ম সচিব, কৃষি অধিকর্তা, বিভিন্ন কৃষি আধিকারিক, কৃষি প্রযুক্তিবিদ, কৃষি বৈজ্ঞানিক ও গবেষক এবং উজ্জানবিদরা যোগ দেন।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীগুহ রাজ্যের কৃষি বিভাগের উজ্জান শাখার ঐতিহ্য, কর্মধারা এবং গবেষণার প্রশংসা করে বলেন, ১৯৩৪-এ যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, নানা ঘাত প্রতিঘাতে তা বর্তমানে প্রসার ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বিজ্ঞানের সার্থক অবদানের প্রশংসা করেও তিনি সাধারণ মানুষের জন্মে বিজ্ঞানের এগিয়ে যাওয়া উচিত বলে ইংগিত করেন। উৎপাদনের সঙ্গে বিপণনের সমন্বয় ঘটাতে না পারলে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা আসবে বলে তিনি বলেন।

চিদানন্দ গোস্বামী

উদ্যান শাখার
সুবর্ণজয়ন্তীঃ
আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধা : চৈত্র : ১৩৯১

প্রসঙ্গতঃ শ্রীগুহ বলেন, উত্তরবঙ্গের কমলালেবুর বাজার ভুটান অধিকার করে নিচ্ছে। উত্তরবঙ্গের কমলা বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে চালান করা হচ্ছে। এই দূর পথে কমলা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে বিরাট আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। শেখ মুজিবের সময়ে বাংলাদেশ ৫ কোটি টাকার তামাক কিনতে চেয়েছিল। সেই তামাক পাঠানো হোল হায়দ্রাবাদ থেকে, অথচ কোচবিহার থেকে তামাক পাঠানো হোল না। এগুলো বিকোভের কারণ। সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি ব্লকের তামাক চাষ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই অঞ্চলের তামাক চাষকে রক্ষা করতে শ্রীগুহ কৃষি অধিকর্তাকে তামাকচাষীদের পাশে দাঁড়াতে বলেন। উপসংহারে বলেন বিপণনের ব্যবস্থা না করে বিজ্ঞানীরা শুধু ল্যাবরেটরীতেই বসে থাকলে চলবে না।

এই অমুষ্ঠানের অগ্রতম আকর্ষণ ছিল রাজ্যের উদ্ভান বিষয়ে চারজন প্রতিভাধর ও গুণী বিজ্ঞানীকে সম্বোধিত করা। এঁরা হলেন ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়,

পবিত্র কুমার সেন এবং শচীন্দ্র মোহন সেন। কৃষি অধিকর্তা অভিনন্দন পাঠ করার পর কৃষি মন্ত্রী এঁদের হাতে অভিনন্দন পত্র তুলে দেন।

অমুষ্ঠানে ভারতীয় কৃষি অমুসজ্জান পরিষদের বিশ্বজিৎ চৌধুরী বলেন, কৃষি বিভাগের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি সুন্দর সমন্বয় তৈরি হওয়া উচিত। আমাদের মোট চাহিদা মেটানোর জগ্রে উদ্ভান শাখার সবজি ও ফলের সমৃদ্ধি ঘটানো উচিত। সম্বর্ধনার উদ্ভবের অধ্যাপক পবিত্র কুমার সেন, উদ্ভান শাখার জগ্রে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হওয়া উচিত বলে বলেন। এবং চুঃখের সঙ্গে বলেন, এই শাখায় একটি অপর অধিকর্তার পদও নেই।

রাজ্য উদ্ভানবিদ ডঃ হেমেন্দ্র নাথ সমাদ্দার বিভিন্ন প্লাইড সহযোগে উদ্ভান শাখার কার্যাবলী ও অবদান ব্যাখ্যা করেন। উদ্ভান শাখার গুরুত্বপূর্ণ অবদান প্রসঙ্গে তিনি কয়েকটি সূত্রো-ল্লেক্ষ করেন। সেগুলো হোল, ১) জমির প্রাতি এককে অধিকতর উৎপাদন, ২) ফল, ফুল, সবজি থেকে অধিকতর আয় সৃষ্টি, ৩) জমির এবং সেচ



উদ্ভানবিদ সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়কে কৃষিমন্ত্রী অভিনন্দন পত্র দিচ্ছেন। পাশে কৃষি অধিকর্তা।

দক্ষিণে : সম্বোধিত কৃষি বিজ্ঞানী শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিচ্ছেন।

ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, ৪) গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সঞ্চারণ এবং ৫) পুষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি। রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের ভূমিকায়ের সমস্তা দূর করতে যুক্তিকা সংরক্ষণের ব্যাপারে উত্থান শাখার অবদানের ভূমিকা নিয়েও ডঃ সমাদ্দার আলোচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ জানা যায় যে, অতীতে এ রাজ্যে সবজি ও ফলের চাষ হোত যথাক্রমে ১৫০০০০ হেক্টর ও ৯০০০০ হেক্টরে। বর্তমানে হয় সবজি ৩৬০০০০ হেক্টর এবং ফল ১০০০০০ হেক্টরে।

রাজ্য কৃষি অধিকর্তা তাঁর ভাষণে জানান, ফসল তোলায় পরবর্তী পর্বের কার্যাবলী, বিপণন এবং সংরক্ষণের উন্নতি না হলে উত্থান শাখার সমৃদ্ধি হতে পারে না। তিনি উল্লিখিত বিষয়গুলোর উন্নতি ঘটাবার ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে বলে জানান।

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডঃ এস. কে. মুখার্জী। এই অধিবেশনে ডঃ চাধা রাজ্যের উত্থান শাখাকে সম্ভাবনাময় বলে এর জন্তে একটি স্বতন্ত্র বিভাগের প্রয়োজন বলে বলেন। তিনি আরো জানান, বিশ্বের কমলা উৎপাদনকারী দেশগুলোর সঙ্গে ভারত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। ইতালী, জাপান ও স্পেন যেখানে উৎপাদন করছে যথাক্রমে ১৭, ২২ ও ৩০ মে: টন, সেখানে ভারত ১০ মে: টন উৎপাদন করছে। ভারত ক্রমেই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে পারবে বলে তিনি আশা করেন।

কেন্দ্রের আই.এ.আর.আই-এর ফল ও উত্থান প্রযুক্তি শাখার ডঃ পি.কে. মজুমদার সঙ্কর জাতের আম উৎপাদনের অভিনব প্রণালীকে কৃষ্ণনগরের উত্থান বিভাগীয় গবেষণা কেন্দ্রের অগ্রতম প্রকল্প

অবদান বলে উল্লেখ করেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থান বিভাগের অধ্যাপক টি কে. বহু মোহিতনগর ও ময়নাগুড়ি খামারে আনারসের ওপরে বিভিন্ন পর্ষায়ে সঞ্চারণমূলক পর্যবেক্ষণের কাজের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন হেক্টরে আনারসের চারার সংখ্যা ২৭৭৭৭ থেকে ৭২৯৪৫তে বাড়িয়ে আমরা হেক্টর প্রতি উৎপাদন ৫৯*৪ টন থেকে ১০২ টনে পৌঁছেছি। তাছাড়া ফলন বাড়াতে আনারসের ফুল আসার সময় মাটিতে ম্যাগনেসিয়া, আইরন, জিঙ্ক ও বোরোন দেবার সুফলের উল্লেখ করে তিনি বলেন সারা বছর আনারসের ফলন অব্যাহত রাখার ব্যাপারও আমরা চিন্তা করছি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিদ ও সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ হুনীত মুখোপাধ্যায় ফল সংরক্ষণের পদক্ষেপের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, পুষ্টিমূল্য অক্ষুণ্ণ রেখে আমাদের সংরক্ষণ শিল্প গড়ে তোলায় মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন ফল বা সবজিতে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ। আমরা মোট ফলনের মাত্র শতকরা ১ ভাগ সংরক্ষণ করি। এবং এই ১ ভাগের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ রপ্তানী হয়। ১৫ ভাগ মিলিটারী জন্ত সংরক্ষিত এবং বাকি ৫ ভাগ সাধারণত জেজু বিক্রী হয়। তাই সংরক্ষণের পরিমাণ আরো বাড়ানো উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এই অধিবেশনে রাজ্যের প্রাক্তন কৃষি অধিকর্তা এবং সিকিমের বর্তমান কৃষি উপদেষ্টা এ. টি. সাহালা, এবং এস. এস. চট্টোপাধ্যায়ও বক্তব্য রাখেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রথীন বহু, গুদামজাত



সভাগৃহের একাংশ। স্টেটস-
ম্যান, যুগান্তর, বহুধারা
পত্রিকার প্রতিনিধিদের দেখা
যাচ্ছে।

করার আগে বীজের যথোচিত ভাবে শুকানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। এ প্রসঙ্গে প্রাণবন্ত ও ভালো বীজের প্রয়োজনে ভালো সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বীজের ফিজিকাল কন্ট্রোল (টেম্পারেচার কন্ট্রোল), ফিজিও-কেমিকাল মেথড এবং অগ্নাশ্ম প্রথার উল্লেখ করেন। পেপ্তিসাইড ইণ্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল) জোনাল ম্যানেজার ডঃ দত্ত কীট পতঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকদের পরিচিত করানোর প্রয়োজনের কথা বলে বলেন, মোট ২৯ শ্রেণীর মধ্যে মাত্র ৮টি শ্রেণীর কীট পোকাই কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত। ডঃ বি. চৌধুরী বলেন ওষুধ ছিটানোতে কৃষকের ও পরিবেশের যে ক্ষতি হতে পারে, সে বিষয়ে সচেতন থাকা ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজনের কথা বলেন। তাছাড়া তিনি ফসলে সুষম সার দেয়া প্রয়োজন বলে জানান। তার ব্যতিক্রমে ফল সুন্দর বা বৃহদায়তনের হলেও রোগ পোকার আক্রমণ বাড়তে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ফল

বা সবজির ক্ষেত্রে গমের মতোই একটি বিশেষ সার মাত্রার সুপারিশ করা দরকার বলে ডঃ চৌধুরী মনে করেন। তিনি কৃষকদের জমির ভাল বীজ সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত বলে বলেন। চতুর্থ অধিবেশনে ডি. পি. যাদব জানান, অল ইণ্ডিয়া ফ্লোরি কালচারাল ইমপ্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট অনুসারে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ১৯৭৬-এ নেয়া কার্যসূচীটি ৭৭-এ বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। সেখানে ছেক্টরে ৮৩০০০ গোলাপ চারা লাগানো হচ্ছে। এটিকে একটি অবিস্মৃতি কৃতিত্ব বলে তিনি উল্লেখ করেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি প্লাইড সহযোগে কোলাঘাটের ২০০০ একর জমিতে বিচিত্র ফুল চাষের আলোচনা করেন। ফুল তোলার পর যথাযথ সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন।

সভার শেষে কৃষি বিভাগের উদ্যান শাখা কতগুলো উন্নয়নমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

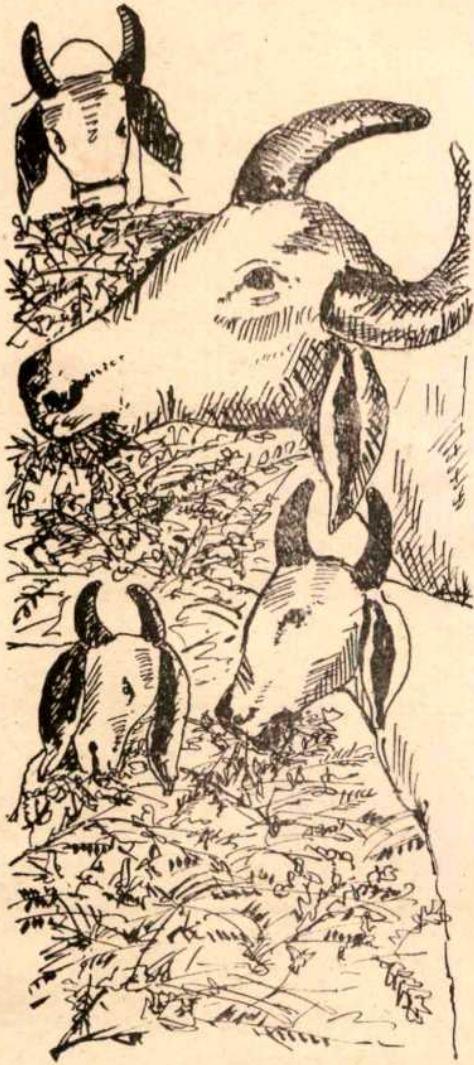
॥ আবেদন ॥

বিষয়—“বসুন্ধরা” পত্রিকার জ্ঞান কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ, রচনা, আহ্বান করা হচ্ছে।

কৃষি উন্নয়নের কাজ এরা জ্যে এগিয়ে চলেছে। আগামী দিনেও এই কৃষি উন্নয়ন প্রচেষ্টা আমাদের বাড়িয়ে যেতে হবে। নতুন নতুন কৃষি চিন্তা ভাবনা, গবেষণালব্ধ তথ্য ইত্যাদি যা কৃষকের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করবে তা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবে এই “বসুন্ধরা”। একান্ত আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বসুন্ধরায় প্রকাশের জ্ঞান কৃষি বিষয়ক নানা তথ্য, কৃষকের কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ, গবেষণা লব্ধ তথ্য, সাক্ষাৎকার, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ, কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠানোর জ্ঞান অস্বীকার করা হচ্ছে। এইসব তথ্য আকর্ষণীয় হবে যদি তার সঙ্গে ফটো থাকে। কৃষি প্রাসঙ্গিক বা গ্রামোন্নয়নভিত্তিক লেখা শুধু কৃষিকর্মীদের কাছ থেকেই নয়, যারা নিজেদের হাতে শস্য উৎপাদন করছেন সেই কৃষকভাইদের কাছ থেকেও। আপনাদের সকলের সহযোগিতা বসুন্ধরাকে সার্থক করে তুলতে সক্ষম হবে।

সম্পাদিকা

পশুখাদ্য প্রসঙ্গ



পশুখাদ্যের মান ও স্বাদ বাড়াতে ইউরিয়া প্রয়োগ

পশুখাদ্যের মান ও স্বাদ বাড়াতে তা যদি এ্যামোনিয়া সলিউশন দিয়ে শোধন করে নেওয়া যায় তবে খাদ্যের মান ও স্বাদ তো বাড়বেই তাছাড়া অস্বাস্থ্য রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে শোধন করার থেকে অনেক সস্তাও পড়ে। এ্যামোনিয়া দ্বারা শোধিত পশুখাদ্য শুকানোর পর বেশ অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে এ্যামোনিয়ার মাধ্যমে খড় প্রভৃতি ইউরিয়া দ্বারা শোধিত করা সব থেকে ভালো।

মাটির গর্তে খড় প্রভৃতি শোধনের উপায়

খামার-এর কাছাকাছি উঁচু জায়গায় গর্ত খুঁড়ে (গর্তের মাপ ৪ এম X ৩ এম X ১'৫ এম) খড় প্রভৃতি শোধন করে নিতে হবে। গর্তের চারপাশ মাটি ও গোবর দিয়ে লেপে নিতে হবে। সাইলোপিটের চারপাশ কলাপাতা দিয়ে ঢেকে নিলে ভালো হয়। কলাপাতা ছাড়া অত্র পাতা দিয়েও গর্তের চারপাশ ঢেকে দেওয়া যায়। শুকনো জোয়ারের খড়, ভুট্টার খড়, ধান ও গমের খড় ছাড়াও অস্বাস্থ্য ফসলের শুকনো খড় প্রভৃতি গর্তের মাঝে ফেলে পশু-খাদ্যের উপযোগী করে তোলা যায়।

খড় কুটি কুটি করে কেটে (৪ এম X ৩ এম X ১'৫ এম) গভীর গর্তে সেগুলি ফেলে দিতে হবে। এর পর ১০০ লিটার জলে ৪ কেজি ইউরিয়া গুলে কাটা খড়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এক কুইন্টাল খড়ের জন্ত এই পরিমাণ ইউরিয়া মিশ্রণ যথেষ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত গর্তটি না ভরে ততক্ষণ অবধি খড় ও ইউরিয়া মিশ্রণ দিয়ে গর্তটি ভরে তুলতে হবে। গর্তটি খড় দিয়ে ভর্তি হলে গোবর ও মাটি দিয়ে ভালো করে এর খ বন্ধ করে দিতে হবে। এমনভাবে গর্তটির খ বন্ধ করতে হবে যাতে তার ভেতর একটুও হাওয়া ঢুকতে না পারে। হাওয়া ঢুকলে গর্তের সমস্ত পশুখাত্তই নষ্ট হয়ে যাবে। বৃষ্টিপাত থেকে সাইলোপিটগুলি বাঁচাবার জন্ত তার ওপর পলিথিনের চাদর ঢাকা দিতে হবে এবং গর্তের চারপাশ কাদা ও বালি দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে দিতে হবে। এইভাবে শোধন করলে তিন সপ্তাহ পরে পশুখাত্ত তৈরী হয়ে যাবে।

পলিথিন শিট ঢাকা দিয়ে পশুখাত্ত তৈরীর উপায়

এ ছাড়া পাকা মেকের ওপর ভালো করে কাটা খড়কুটি শোধন করার জন্ত ১০০ লিটার জলে ৪ কেজি ইউরিয়া গুলে খড় গাদা ভালো

করে ভিজিয়ে দিতে হবে। এবং পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দেখতে হবে চারদিকের ফাঁক দিয়ে যাতে হাওয়া ঢুকতে না পারে। হাওয়া ঢুকে খাত্ত যাতে নষ্ট না হয় তারজন্ত চারপাশ বালি ও কাদা দিয়ে ভালো করে সীল করে দিতে হবে। এর তিন সপ্তাহ পরে দেখা যাবে পশুখাত্ত তৈরী হয়ে গেছে।

বাঁশের বুড়িতে পশুখাত্ত তৈরী

গর্ত এবং পলিথিন চাদর ঢেকে পশুখাত্ত তৈরী করা ছাড়াও বাঁশের বুড়িতে করেও পশুখাত্ত তৈরী করা যায়। একটি এমন বাঁশের বুড়ি নিতে হবে যার ভেতর ১০০ কেজি খড় প্রভৃতি কাটা ধরে। বুড়িতে পশুখাত্ত রেখে কাদা ও মাটি দিয়ে (৭০ : ৩০ অনুপাতে) বুড়ির চারপাশ লেপে কলাপাতা দিয়ে বুড়ির চারপাশ ঢেকে দিতে হবে। তারপর বুড়ির ওপর বাঁশের ঢাকা দিয়ে দিতে হবে এবং সেটিও গোবর ও সার দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এর ভেতরে পশুখাত্ত ভরার আগে সেগুলি ১০০ লিটার জল ও ৪ কেজি ইউরিয়া দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। ২১ দিন পরে খাত্ত তৈরী হবে। খাত্ত হাওয়ায় ২৪ ঘণ্টা শুকিয়ে পশুদের খাওয়াতে হবে।

(এফ. আই. ইউ)



বৈশাখ মাসে কৃষকের করণীয়

বৈশাখের প্রধান চাষ হলো পাট ও আউশ ধান।

বোনা আউশ

পলিমাটি অঞ্চলে জমির অবস্থান অনুযায়ী উপযুক্ত বীজ বুনুন। এই অঞ্চলের উপযোগী অধিক ফলনশীল জাত পলমন ৫৭৯, সি-এন-এম ২৫, সি-আর ১২৬-৪২-১, আই-ই-টি ২২৩৩ ও আই-আর ৩৬। বোনার আগে সব বীজই শোধন করে বুনবেন।

জমি তৈরির সময় ৮—১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার এবং শেষ চাষের সময় ১০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ দিন।

পাট

বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত তেতো পাট সবুজ সোনা ও শ্যামলী বুনুন। নির্দিষ্ট সময়ের

আগে পাট বুনবেন না। এর ফলে অসময়ে ফুল এসে ফলন কমে যাবে। জমি তৈরির সময় সবটুকু ফসফেট ও পটাশ দিন। অধিক নাইট্রোজেন চারা বার হওয়ার পরে দিন।

মুগ

যারা ফাল্গুন—চৈত্র মাসে মুগ বুনছেন তাদের এখন ক্ষেতে পরিচর্যা ও রোগ-পোকাদমনের জ্ঞান যত্ন নিতে হবে।

অগ্ন্যাগ্নি ফসল

ফলের বাগানে এই সময় সেচ দিন ও অগ্না পরিচর্যা করুন। পেঁপের চারা লাগাবার গড় করে জৈব সার ও মাটি মিশিয়ে রাখুন।

জমির মাটি পরীক্ষা করে স্ত্রবম সাব দিন খরচ কমান ও ফলন বাড়ান।

বসুন্ধরার লেখকদের বর্ণানুক্রমিক সূচী : ১৩৯১

অ

অর্চন কুমার চ্যাটার্জী আট বিধা জমি ও দশজনের সংসার	(চৈত্র)
অজিত কুমার মজুমদার মূলী নামে পল্লীবালা (কবিতা)	(ভাদ্র)
অনিল সরকার বরপাড়ার কাহিনী	(অশ্বিন)
অমলেন্দু সরকার কৃষি ছড়া	(ফাল্গুন)
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (যুগ্ম) গমবীজ বোনার আগে জলে কিংবা জ্বলে ভিজিয়ে শুকনো করে বৃহন	(অশ্বিন)

ক

কনক কমল চট্টোপাধ্যায় জলে স্থলে সিরাজের চাষ	(ভাদ্র)
ডঃ কল্যাণব্রত সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের তৈলচিত্র	(কার্তিক)

গ

ডঃ গোপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় জ্যৈষ্ঠের ব্রতপার্বণ ও কৃষি কেন্দ্রিক সংস্কৃতি	(জ্যৈষ্ঠ)
--	-------------

চ

চিত্ত সুরাল প্রবাসী (কবিতা)	
চিদানন্দ গোস্বামী অমৃতের কাছাকাছি	(আষাঢ়)
চিদানন্দ গোস্বামী অমৃত বাংলা (কবিতা)	(আষাঢ়)
চিদানন্দ গোস্বামী দার্জিলিংয়ে গ্রাডিওলাস (সাক্ষাৎকার)	(আশ্বিন)
চিদানন্দ গোস্বামী এই তো পৌষ (কবিতা)	(পৌষ)
চিদানন্দ গোস্বামী উত্তান শাখার সুবর্ণজয়ন্তী : আলোচনা সভা	(চৈত্র)

জ

জাগরণ সোম শেওড়াফুলিতে কৃষক দিবস : প্রস্নোত্তর	(চৈত্র)
ডঃ জ্যোতিরঞ্জন লাহিড়ী সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টির জন্য পশ্চিমবঙ্গে ফসলের ক্ষতি ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা	(শ্রাবণ)

দ

ডঃ দিলীপ কুমার নাথ তৈলবীজের পোকা ও তার দমন	(কার্তিক)
দিলীপ কুমার সাহা ওরা ডাকে ইশারায় (কবিতা)	(মাঘ)
দেবব্রত চ্যাটার্জী অতি বৃষ্টির পরিস্থিতিতে আমন ধানে শস্তরক্ষা	(শ্রাবণ)

প

পরেশ চন্দ্র মুখার্জী বারুইপুরে করমচা চাষ ও তার সম্ভাবনা	(ভাদ্র)
ডঃ পূণ্যব্রত চট্টোপাধ্যায় থাইল্যান্ডে ধান চাষ—একটি সাক্ষাৎকার	(ফাল্গুন)

বহুধরা : চৈত্র : ১৩৯১

প্রবাল গুপ্ত পাঁশকুড়ায় বাদাম চাষ	(জ্যৈষ্ঠ)
প্রবাল গুপ্ত পশ্চিমবাংলায় সরষের চাষ	(আশ্বিন)
ব	
বংশী মান্না পশ্চিমবাংলায় সমাজ ভিত্তিক বন সৃষ্ণনের অগ্রগতি	(জ্যৈষ্ঠ)
বহু ভূষণ দাস একটি বোরো বাঁধের কাহিনী	(বৈশাখ)
বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী (যুগ্ম) তৈলবীজের উন্নত জাত ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য	(কার্তিক)
ডঃ বিভাষ মজুমদার শীতের ফল আমলকী	(পৌষ)
বিমলেন্দু বিকাশ পাহাড়ী আমন ধানের কর্মসূচী (কবিতা)	(আশ্বিন)
ডঃ বিমান মাইতি ঝাড়গ্রামে অর্থকরী ফসল কাজু চাষের প্রসার	(চৈত্র)
বিষ্ণুপদ মণ্ডল বোরো ধান চাষে রাসায়নিক সারের ভূমিকা	(মাঘ)
বীরেন্দ্রনাথ বাগচী তৈলবীজের রোগ ও তার দমন	(কার্তিক)
বৈজ্ঞান্য সেন সুগার বীটের চাষ	(মাঘ)
ম	
মনোরঞ্জন রায় আমন ধানে সার	(আশ্বিন)
র	
রমা ভট্টাচার্য মুগের চাষ	(ফাল্গুন)
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি দার্জিলিঙের কমলালেবুর হাল হকিকৎ	(আষাঢ়)
ডঃ রাধাগোবিন্দ মাইতি দার্জিলিঙের কমলালেবুর হাল হকিকৎ	(ভাদ্র)
রাধিকারঞ্জন দেবভূতি আদিবাসী সমাজে যৌথ কৃষি খামারে নতুন পদক্ষেপ	(চৈত্র)
শ	
ডঃ শক্তিপদ সরকার সাইপ্রাসে কৃষি	(আশ্বিন)
শুভেন্দুদেব চ্যাটার্জী (যুগ্ম) তৈলবীজের উন্নত জাত ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য	(কার্তিক)
স	
সন্তোষ কুমার দত্ত মটরের একটি উন্নত জাত	(আশ্বিন)
সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ জবাফুলের চাষ	(আশ্বিন)
সমরেন্দ্র নাথ ঘোষ বেলফুলের চাষ	(জ্যৈষ্ঠ)
সমীররঞ্জন পাল তৈলবীজের উন্নত চাষ পদ্ধতি	(কার্তিক)
সুজিত কুমার রায় (যুগ্ম) গমবীজ বোনার আগে জলে কিংবা জবানে ভিজিয়ে শুকনো করে বুন	(অশ্বাণ)
সুধীরচন্দ্র পাল পান চাষ	(আশ্বিন)
সুধীরচন্দ্র পাল পান চাষ	(অশ্বাণ)

ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় রোগ দমনে সংবাহী রাসায়নিক ওষুধের ব্যবহার	(আবেগ)
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার	(অজ্ঞান)
ডঃ সুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার	(পৌষ)
সুপ্রভাত মজুমদার সর্গযোগ	(আবেগ)
সুভাষ রায়চৌধুরী হিসাবী চাষী	(জ্যৈষ্ঠ)
সুমিতা ভট্টাচার্য প্রাক প্রসিক মরসুমে মূগের চাষ	(বৈশাখ)
সুমিতা ভট্টাচার্য প্রাক প্রসিক মরসুমে মূগের চাষ	(পৌষ)
হ	
হারাদন ঘোষ অ্যাংজোলা (কবিতা)	(জ্যৈষ্ঠ)
ডঃ হেমেন্দ্রনাথ সমাদার পশ্চিমবঙ্গে ফল এবং সবজি চাষের উন্নয়ন	(আষাঢ়)
অগ্ন্যাত্ম রচনা :	
আউশে কৃষকের করণীয়	(ফাল্গুন)
আবেদন	(পৌষ)
আবেদন	(মাঘ)
আমন ধানের চাষ	(জ্যৈষ্ঠ)
আম্র উদ্ভান প্রতিযোগিতা	(মাঘ)
আরো বেশী ভালো কম্পোষ্ট	(ভাদ্র)
আলুর রোগ ও তার প্রতিকার	(পৌষ)
আশ্বিনে কৃষকের করণীয়	(ভাদ্র)
আষাঢ়ে কৃষকের করণীয়	(জ্যৈষ্ঠ)
উত্তর কলম	(আষাঢ়)
উন্নত প্রথায় আউশ ধানের চাষ	(বৈশাখ)
উন্নত প্রথায় আউশ ধানের চাষ	(চৈত্র)
উন্নত প্রথায় পাটের চাষ করুন	(ফাল্গুন)
১৯৮৪-৮৫ সালের রবি গ্রীষ্ম চাষের কার্যসূচী ও লক্ষ্য	(আশ্বিন)
কাতিকে কৃষকের করণীয়	(আশ্বিন)
কৃষি উৎপাদনে কে. পি. এস.	(আশ্বিন)
কৃষি সংবাদ	(অজ্ঞান)
কৃষি সংবাদ	(মাঘ)
কৃষি সংবাদ	(পৌষ)
গম চাষে যত্ন ও পরিচর্যা	(পৌষ)

বহুদায় : চৈত্র : ১৩৯১

চতুর্থ জাতীয় কৃষি মেলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্থান	(বৈশাখ)
চতুর্থ জাতীয় কৃষি মেলা : নাগপুর (চিত্র বিচিত্রা)	(বৈশাখ)
চিত্র বিচিত্রা	(জ্যৈষ্ঠ)
চীনাবাদামের চাষ	(ফাল্গুন)
চৈত্র মাসে কৃষকের করণীয়	(ফাল্গুন)
জ্যৈষ্ঠ কৃষকের করণীয়	(বৈশাখ)
ভিম সংরক্ষণ	(অশ্বাঢ়)
তরমুজের চাষ	(মাঘ)
তৈলবীজের অভাব পূরণে তিলের চাষ করুন	(মাঘ)
নতুন চন্দ্রমল্লিকা	(পৌষ)
নিবিড় রবিশস্তা উৎপাদন কার্যক্রম : একটি আলোচনা সভা	(অশ্বাঢ়)
পশুখাত্ত প্রসঙ্গ	(চৈত্র)
পশ্চিমবঙ্গে খরা প্রবণ এলাকার উন্নত চাষ পদ্ধতি	(বৈশাখ)
পাটের পোকা মাকড় ও তার দমন	(চৈত্র)
পৌষে কৃষকের করণীয়	(অশ্বাঢ়)
ফাল্গুন মাসের করণীয়	(মাঘ)
বিশ্বখাত্ত দিবস ও খাত্তোৎপাদনে মহিলাদের স্থান	(আশ্বিন)
বীজের জন্ম পাট চাষের প্রথা	(ভাদ্র)
বোরো ধানের চাষ	(পৌষ)
বৈশাখে কৃষকের করণীয়	(চৈত্র)
ভুট্টার চাষ	(ফাল্গুন)
মাঘে কৃষকের করণীয়	(পৌষ)
রাজ্য গ্রীষ্মকালীন ফল প্রদর্শনী	(আষাঢ়)
রাজ্য শীতকালীন ফল ও সবজি প্রদর্শনী	(ফাল্গুন)
সংবাদ	(বৈশাখ)
সংবাদ	(জ্যৈষ্ঠ)
সংবাদ	(আষাঢ়)
সংবাদ	(ভাদ্র)
সংবাদ	(আশ্বিন)
সংবাদ	(পৌষ)
সংবাদ	(মাঘ)

৩২

প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ

কায় প্রকাশিতব্য বিষয়বস্তু : কৃষি বিষয়ক পরিকল্পনার তথ্য, গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি, প্রবন্ধ, ঔগুণ, নাটিকা, সাচ্ছাৎকার, নক্সা, কবিতা, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ, প্রয়োজন, কৃষি সম্পর্কীয় সরকারী প্রকল্প-পরিচিতি ও কাজের অগ্রগতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ও বিদ্যুতের ব্যবহারগত সমস্যা ও সুপারিশ, শস্য ও ফসল চণ, সমবায় ও কৃষিঋণ, কৃষি বিপন্নন, বিভিন্ন জেলার কৃষকদের অভিজ্ঞতার সংবাদ ও রচনা, কৃষকদের স্থানীয় এবং ঔগুণ জ্ঞান-অসুবিধার কথা, পত্রপত্রী পালন, যৎস্যাচায, বনসম্পদ সংরক্ষণ, তৃমি সংরক্ষণ ও সন্ধ্যাবহার, তৃমিসংস্কার- রচনা ও সংবাদ, গাছ-ছাযিভিত্তি, সমাজ শিক্ষা ও উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক কৃষ্টির ও ক্ষুপ্রশিষ, গ্রামীণ অর্থনীতি ও কর্ম- বালের সমস্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রেখাচিত্র, আলোকচিত্র, চিত্রকলা ইত্যাদি।

কার জ্ঞান সম্প্রদায় : কেবল নিম্নবর্ণিত ধরণের মৌলিক রচনার জন্য (প্রকাশিত হবার পর) নিম্নলিখিত হারে সম্প্রদায় দেওয়া হবে। (ক) উচ্চমানের কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৭৫ টাকা, (খ) সাধারণ কৃষি প্রযুক্তিগত (টেকনিক্যাল) প্রবন্ধ : ৫০ টাকা, (গ) সাধারণ কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ/কৃষি বিষয়ক নাটিকা : ৪০ টাকা, (ঘ) সাধারণ প্রবন্ধ ছাটগুণ : ৪০ টাকা, (ঙ) কবিতা (প্রকৃতি ও গ্রাম প্রাসঙ্গিক) : ২৫ টাকা।

এবং ফুলফেল কাগজের এক পৃষ্ঠায় (মোট ১৫০০ শব্দের অনধিক) কালি দিয়ে স্পষ্ট বাংলা অক্ষরে লিখে সম্পাদিকার কানায় (সম্পাদিকা, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৪০) পাঠাতে হবে। রচনার দুইকপি পাঠান বান্ধনীয়। যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠান হবে না।

হক হবার নিয়ম : যে কোন মাসে বসুন্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত বছরের কম সময়ের জন্য গ্রাহক করা হয় না। মাসিক সংখ্যার প্রতি কপির মূল্য ২৫ পয়সা। অগ্রিম গ্রামীণ প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ৩০০ টাকা। চাঁদার টাকা “কৃষি অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ”-এর নামে লেখা থাকিত (ক্রেসড) পোষ্টাল অর্ডার অথবা রেখাঙ্কিত চেক-এর মাধ্যমে সম্পাদিক, বসুন্ধরা, অফসেট প্রেস, ৪২ গ্রাহামস্ রোড, কলিকাতা-৭০০০৪০-এ পাঠাতে হবে।

জ্ঞাপনের হার : (প্রথম প্রচ্ছদের জন্য এবং অর্ধ পৃষ্ঠার কম কোন বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না) : প্রচ্ছদ (৪র্থ কড়ার) : ১০ টাকা, প্রচ্ছদ (২য়/৩য় কড়ার) : ৪০০ টাকা, সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা : ৩০০ টাকা, সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা : ২০০ টাকা। বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের অগ্রিম প্রদেয় মোট মূল্যের উপর ২০ শতাংশ হারে এবং ‘আই-ই-এন্-এস্’ দ্বারা স্বীকৃত এজেন্সীকে বিজ্ঞাপনের মোট মূল্যের উপর ১৫ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়।

একটি কৃষি-সম্পর্কিত ব্যবসায় এবং গ্রামীণ সমস্যা ও উন্নয়নমূলক যে কোন বিজ্ঞাপন (সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়) রের কার্যকরী ও উপযুক্ত মাধ্যম। সরকারী, বিধিবদ্ধ/অন্যংশাসিত সংস্থা অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সমবায় ঠান ইত্যাদি সকলেই এই প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

মিশন এজেন্ট : কলিকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় একাধিক বিক্রয়কারী এজেন্সী তালিকাভুক্ত করা হয়। ১০০ কপি র ম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্সীগুলিকে ২০ শতাংশ হারে কমিশন দেওয়া হয়। এজেন্সীকে অর্ডার দেওয়া পর মোট মূল্যের টাকা (২০% কমিশন বাদে) অগ্রিম আদায় দিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির জন্য চাই কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন যা শুধু কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কৃষি শিল্প নিগমের যন্ত্র ও সার ব্যবহার করে চাষী ভাইয়েরা কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে তুলুন।

এই কৃষি শিল্প নিগমে আধুনিক প্রণয় চাষ এবং কম খরচে বেশী ফলনের জন্য পাবেন।

- | | |
|---|---|
| ১। উন্নত মানের বীজ | ১। জেটর/ইন্টারন্যাশনাল/কোর্ড ট্রাক্টর |
| ২। রাসায়নিক সার | ২। কুবোটা/মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলার |
| ৩। জৈব সার | ৩। “সুজলা” ডিজেল-চালিত ৫ ঘোড়ার পাম্পসেট |
| ৪। রোগ ও কীটনাশক ঔষধ | ৪। যন্ত্র ও হস্তচালিত “বেনাগ্রো” স্প্রেয়ার |
| ৫। মাটি সংশোধক | ৫। “বেনাগ্রো” পাওয়ার/পেডাল থ্রে শার |
| ৬। বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির বীজ, তৈলবীজ ও দানাশস্য | ৬। হস্তচালিত ছইলছো/সীড্ উইডার/সীড্ ড্রীল/লোহার লাঙ্গল ইত্যাদি |
| | ৭। বিদ্যুৎ ও ডিজেল ব্যতিরেকে-চালিত সরল পাম্প |

তত্পরি,

(ক) কৃষিবিহারের দিনহাটায় কর্পোরেশন একটি সিগার ও চুরুট তৈরীর কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় উৎপন্ন তামাক পাতা থেকে উৎকৃষ্ট মানের সিগার ও চুরুট তৈরী হচ্ছে।

(খ) কর্পোরেশন কলকাতার কাছে বানতলায় একটি কারখানা স্থাপন করেছে, যেখানে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিদিন শহরের অব্যবহার্য আবর্জনা থেকে মূল্যবান জৈব সার উৎপন্ন হচ্ছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ওয়েষ্ট বেঙ্গল গ্র্যাণ্ডো-ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল), কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিগ্রাম : এগ্রিনপুট

টেলিফোন : ২২-২৩১

২৩-৩১